চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম

চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম

সম্পাদনা: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রথম প্রকাশ
মে ২০২১

প্রকাশক
সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
কার্যালয় (অস্থায়ী):
এসই— ১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১।
ফোন: ০১৯৫৩ ৩২৩০৩০
ইমেইল: contact@cscsbd.com
ওয়েবসাইট: cscsbd.com

স্বত্ব
সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

নির্ধারিত মূল্য
৩৫০ টাকা মাত্র

CHINTAR SHADHINOTA O ISLAM (Freedom of Thought and Islam), Edited by Mohammad Mozammel Hoque, Published by CSCS Publications, South Campus, Chittagong University. First published: May 2021, Copyright © CSCS Publications. BDT 350 only.

ভূমিকা

চিন্তা আছে বলেই ‘মানুষ’ আজকের এই সভ্য মানুষ হতে পেরেছে। চিন্তাশীলতার কারণে মানুষ হয়েছে অনন্য মাত্রায় সৃষ্টিশীল ও সভ্য। চিন্তার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত ফিতরাত ও অধিকার। এই অর্থে চিন্তার স্বাধীনতা হলো সবচেয়ে বড় মৌলিক মানবিক অধিকার। তাই, দুনিয়ার কোনো কিছুই মানুষকে এই সহজাত বৈশিষ্ট্য থেকে মাহরুম করতে পারে না। এবং কেউ যদি তা করে, সেটি অগ্রহণযোগ্য।

নিজেকে সৃষ্টির সেরা মনে করা হলো চিন্তার স্বচ্ছতা ও স্বাধীনতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর বিপরীতে নিজের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করা বা করতে চাওয়া হলো চিন্তার বৈকল্য। মানুষেরই আছে নৈতিক চেতনা। চিন্তা ও কর্মের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ব্যতিরেকে নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্ভবপর হতে পারে না। মানুষেরই আছে পরিণত ভাষা। ভাষাগত এই উন্নতি মানুষ লাভ করতে পারতো না, যদি না তার থাকতো স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রকৃতিগত ক্ষমতা। বলাবাহুল্য, মানুষ ভাষাকে চিন্তার বিনিময় ও বাহন হিসেবে ব্যবহার করে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ধর্মের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় ক্যাটাগরির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ মনে করে, ধর্মের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা নাই। তাদের দৃষ্টিতে, ধর্মের পুরো ব্যাপারটাই হলো আচার-অনুষ্ঠান ও মেনে চলার ব্যাপার। এটি সব ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যি কিনা জানি না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি, ‘ইসলাম ধর্মে’র ক্ষেত্রে এই ধারণা ভুল।

‘ইসলাম ধর্ম’ কথাটাকে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখার মানে হলো— আমি মনে করি না, ইসলাম একটি ধর্ম। যদিও ধর্মের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ ইসলামের মধ্যে

আছে। ধর্মের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে সাথে মানবজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাপর সকল ক্ষেত্রসমূহেরও অপরিহার্য ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা ইসলামের মধ্যে দেখতে পাই।

ইসলাম নিজেকে দ্বীন হিসেবে পরিচয় দেয়। দ্বীন মানে ধর্মও হতে পারে, লাইফস্টাইলও হতে পারে, স্বতন্ত্র কোনো দর্শনও হতে পারে, হতে পারে তত্ত্ব বা মতাদর্শ। ইসলাম বলতে সাধারণত ধর্ম মনে করা হয়। আমার দৃষ্টিতে এটি ভুল। ইসলাম একটি দ্বীন। এই দ্বীনের অর্থ জীবনবিধান করাটাও ভুল। কেননা, জীবনবিধান মানে যদি শরিয়ত হয়, তাহলে 'ইসলাম অর্থ জীবনবিধান' কথাটা শুদ্ধ হয় না। শরিয়ত হলো ঈমানের অনুগামী। ঈমান আগে, এরপর ইসলাম। ঈমান হলো ইসলামের এক নম্বর বুনিয়াদ। এরপর শরিয়তের চারটি মূল বিষয়।

সে যাই হোক, কথাটা এসেছে চিন্তার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে।

ইসলাম মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দেয়, এই কথাটাও আমার দৃষ্টিতে মিসলিডিং। কেননা, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বা সহজাত যে চিন্তন শক্তি ও বৈশিষ্ট্য, ইসলাম হলো এর একটা আউটপুট। যার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানের চিন্তা কাজ করে না, তার মধ্যে ঈমান ও ইসলাম থাকবে না।

নবী মুহাম্মদের (সা.) উপর যখন ওহী নাযিল হচ্ছিল তখন সমাজে দাসপ্রথা ছিল। স্বাধীন মানুষকে জোরপূর্বক ধরে এনে দাস হিসেবে বিক্রয় করা কিংবা ব্যক্তি নিজেই নিজেকে অভাবের কারণে দাস হিসেবে বিক্রয় করার প্রচলন ছিল। ইসলাম এসে সেসব নিষিদ্ধ করে। শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি বহাল থাকে। তাও সেটা একটা অপশন মাত্র। যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনো শুভেচ্ছা হিসেবে মুক্তি দেয়া হয়েছে, কখনো বন্দী বিনিময় করা হয়েছে, কখনো তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। সে যাই হোক, কোনো দাস বা দাসী নিজের মুক্তির জন্য অর্থচুক্তি করতে চাইলে তার মালিক তার সাথে চুক্তি করতে বাধ্য, এমন নিয়ম করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়তে দাসমুক্তিকে গণ্য করা হয় অতীব পুণ্যের কাজ।

এসব কিছুর কারণ হলো, ইসলাম চায়, মানুষ মাত্রই স্বাধীন হোক। স্বাধীন জীবন যাপন করুক। চিন্তার স্বাধীনতা হলো সকল প্রকারের স্বাধীনতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেউ শ্রমদাস হতে পারে, কিন্তু কেউ চিন্তার দিক থেকে কারো দাসবৃত্তি করবে, এটি ইসলামের দৃষ্টিতে কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে কি করবে না, সেটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এমনকি, একজন দাস বা দাসীরও সেই স্বাধীনতা আছে। ইসলাম চায়, জীবন ও জগত সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করুক, নিজের সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক।

চিন্তাকে টুল বা উপায় হিসেবে, বাহন হিসেবে ব্যবহার করে আমরা জীবন ও জগত সম্পর্কে আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (grand paradigm) গড়ে তুলি। চিন্তা স্বয়ং আমাদেরকে সত্য এনে দেয় না। কিন্তু চিন্তাকে ব্যবহার করেই আমরা সত্যকে পেতে পারি। চিন্তাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে নানা কথা বলা যেতে পারে। ওই যে বললাম, চিন্তা করাটা মানুষের অন্যতম মৌলিক সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাই, ঐকান্তিকতা থাকলে যে কারো পক্ষে সঠিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে সঠিকভাবে চিন্তা করা যাবে না, এমন ধারণা ভুল। মানুষের মধ্যে বরং জ্ঞানের মূল আকর (core of knowledge) দেয়া আছে। মানুষে মানুষে চিন্তার ভিন্নতা হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, তাদের সাবজেক্টিভিটির পার্থক্য, নিয়ত তথা intention'র পার্থক্য, সহজ-সরলভাবে চিন্তা করতে পারার সক্ষমতা বা অক্ষমতার পার্থক্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শেষ পর্যন্ত যাচাই করতে পারার সদিচ্ছা থাকা বা না থাকার পার্থক্য।

'চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম' গ্রন্থটিতে ১২ জন লেখকের ২৫টি নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। কিছু কিছু লেখা ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে পাঠকদের মন্তব্য ও সেগুলোর উত্তরে দেয়া প্রতিমন্তব্যের মধ্যে যেগুলোকে বিষয়ের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে সেগুলোকে মূল লেখার সাথে সংযোজন করা হয়েছে। পুরো বইটিকে চারটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে, ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতা, ইসলামের সাথে যুক্তি ও দর্শনের সম্পর্ক, ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তার স্বাধীনতার সামাজিক প্রেক্ষিত এবং জিহাদ, হুদুদ ও মুরতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে।

শেষের দিকে 'চাই বিশ্বাস চর্চার অধিকার, চাই বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা' শিরোনামে একটি বিশেষ নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এটি লিখেছেন প্রগতিশীল ধ্যানধারণার কবি হোসাইন কবির। তিনি আমার অগ্রজ ও শ্রদ্ধেয়। ছাত্রজীবনে আমরা একই হলে থাকতাম। 'চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম' শিরোনামে 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র'র উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে একটি সাড়া জাগানো সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল। খ্যাতিমান আলেম প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দীন তালুকদার ভাই ছিলেন প্রবন্ধ উপস্থাপক। 'আমার' সেমিনারে অংশগ্রহণ করলে

'উনার' লোকজন নাকি অনর্থক ভুল বুঝতে পারে এই আশঙ্কায়, উক্ত সেমিনারে হোসাইন কবির ভাই আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করলেও শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানে যোগদানে অপরাগতা ও দুঃখ প্রকাশ করেন। এতদসত্ত্বেও উনার নিবন্ধটি আমাদের এই সংকলনে প্রকাশের জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে অনুমতি দিয়েছেন, সেজন্য উনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম বিষয়ে এমন ধরনের গ্রন্থ আমার নজরে পড়েনি। এই দিক থেকে আশা করি এটি একটি মাস্টারপিস হিসেবে পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। বুদ্ধিবিকল ধর্মান্ধ ও ধর্মবিদ্বেষী, উভয় মহলের কাছে এটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হবে, এটিও অনুমান করি। সিএসসিএস-এর সব বইয়ের মতো এটিরও সফট কপি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে।

বইটির সম্পাদনা সম্পর্কিত সব কাজে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সিএসসিএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মাসউদুল আলমকে।

২৭ এপ্রিল ২০২১
এস.ই. ১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস, চবি

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
mozammelhq.com

যুক্তির বাইরে কিছু নাই। হতে পারে না কাণ্ডজ্ঞানের বিপরীত কোনো সত্য। নীতির প্রশ্নে আমরা অবিচল। ন্যায়ের প্রশ্নে অদম্য। বুদ্ধির অনুকূলে আমরা সর্বদা। আমরা মানুষ। এরচেয়ে নাই বড় কোনো পরিচয়। আমরা অনুগত স্রষ্টার। নই আত্মবিস্মৃত উদ্ধত। আমরা শ্রেষ্ঠ, নই দায়িত্বজ্ঞানহীন উদভ্রান্ত। জ্ঞানের আলোতে আমরা খুঁজে পাই নিজেদের। প্রজ্ঞার বাহনে চড়ে চষে বেড়াই বিশ্ব চরাচর, পৃথিবীর সকল প্রান্ত।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১
ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতা

১। ইসলামী শরীয়াহর উদ্দেশ্য ও মূলনীতি ১৭
মোহাম্মদ অলী উল্ল্যাহ

২। ইসলামী শরীয়াহর ধারাবাহিকতা, মদীনা সনদ ও উম্মাহর ধারণা ২৭
আ. ক. ম. আব্দুল কাদের

৩। ইসলামী চিন্তার সংস্কার: কোথায়, কেন ও কীভাবে? ৪৯
মোঃ আব্দুল মান্নান

৪। ইসলামে ধর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা ৬১
ইউসুফ আল-কারযাভী

৫। চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম ৬৯
মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার

৬। ট্র্যাডিশনাল ইসলাম, মডার্নিস্ট ইসলাম এবং মধ্যবর্তী অবস্থান ৮৩
আসিফ সিবগাত ভূঞা

অধ্যায় ২
ইসলামের সাথে যুক্তি ও দর্শনের সম্পর্ক

৭। যুক্তি পছন্দ নয়? কী করবেন, যুক্তি থেকে তো মুক্তি নাই... ৮৯
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

৮। যুক্তিবুদ্ধির ব্যবহার নিয়ে ইসলামপন্থীদের স্ববিরোধিতা ৯৭
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

৯। যুক্তিবুদ্ধির পক্ষে আল্লাহ তায়ালা ১০১
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

১০। দর্শন কী? প্রসঙ্গ: দর্শন ও ইসলাম ১১৫
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

১১। ইসলাম ও দর্শন: প্রচলিত ভুল ধারণার সংশোধন ১২১
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

১২। ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর ১৩১
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

অধ্যায় ৩
ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তার স্বাধীনতার সামাজিক প্রেক্ষিত

১৩। অন্যান্য মতাদর্শের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে ইসলামের ইতিবাচক অনন্যতা ১৪৭
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

১৪। ইসলাম, সুবিচার ও রাজনীতি ১৫১
আহমদ বিন সাদ হামদান আল-গামিদী

১৫। পাপ ও অপরাধ নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৭
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

১৬। অন্যান্য কমিউনিটির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ১৮১
জামাল বাদাবী

১৭। ইমাম শাফেয়ী এবং ভিন্নমতের স্পেইস তৈরি ২০৩
আসিফ সিবগাত ভূঞা

১৮। ধর্মীয় চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি ২০৯
মো. জাকির হোসেন

অধ্যায় ৪
জিহাদ, হুদুদ ও মুরতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে

১৯। শুরা ব্যবস্থা, উলিল আমর, নাগরিকত্বের ধারণা ও 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রসঙ্গে ২১৯
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

২০। জিহাদ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি ২২৯
ইউসুফ আল-কারযাভী

২১। ইসলামী আইন হিসেবে হুদুদের প্রয়োগযোগ্যতা ২৩৫
জামাল বাদাবী

২২। মৃত্যুদণ্ডই কি মুরতাদের একমাত্র শাস্তি? ২৪৭
তারিক রমাদান

২৩। ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মত্যাগ কি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ? ২৫১
জামাল বাদাবী

২৪। সমকালীন বাংলাদেশে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির কারণ ২৭১
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

বিশেষ নিবন্ধ

২৫। চাই বিশ্বাস চর্চার অধিকার, চাই বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা ২৭৭
হোসাইন কবির

লেখক পরিচিতি ২৮১

অধ্যায় ১

ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতা

ইসলামী শরীয়াহর উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

মুহাম্মদ আলী উল্যাহ

শরীয়াহর কোনো ‘নস’-এর সঠিক অর্থ বুঝতে হলে বা তার থেকে কোনো বিধান উদঘাটন করতে হলে শরীয়াহর মূল লক্ষ্য অনুধাবন করা জরুরি। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সাধারণ অর্থ জানাই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া শরীয়াহর কোনো মৌলিক বিধান নিয়ে গবেষণা করতে হলে মাকাসিদুস শরীয়াহ বা শরীয়াহর মূল লক্ষ্য জানা আবশ্যক। যেহেতু আমাদের গবেষণার বিষয় হলো ইসলামী শরীয়াহর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান তথা ‘আযীমত’ ও ‘রুখসত’, সেহেতু সঙ্গত কারণেই মাকাসিদুস শরীয়াহ সমন্ধে কিছু মৌলিক ধারণা দেয়া জরুরি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব ও উবূদিয়্যাত বা দাসত্ব করার জন্য এ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। মানুষ যাতে এ মহান দায়িত্ব পালনে সক্ষম ও সচেষ্ট হয় সেজন্য সৃষ্টির প্রথম থেকেই তিনি তাদেরকে ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টিকুল থেকে আলাদাভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আর তা হলো:

১. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও ভালো মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন।

২. যেহেতু মানুষের দেহ প্রথমত মাটি এবং পরে রক্ত-মাংসের সমন্বয় গঠিত তাই তার মধ্যে জৈব ও পাশবিক চাহিদা বিদ্যমান। এ কারণে তার মধ্যে

‘ইসলামী শরীয়াতে আযীমাত ও রুখসত’ শিরোনামে ড. মুহাম্মদ আলী উল্যাহ কর্তৃক রচিত একটি গবেষণাধর্মী বই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধটি উক্ত বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের অংশবিশেষ।

> ঝগড়া-বিবাদ, হত্যা-রাহাজানি, লোভ-লালসা ইত্যাদি খারাপ প্রবৃত্তি বিদ্যমান।

মানুষকে এ দুটি বিপরীতমুখী বিশেষণে বিশেষিত করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনের পথ প্রদর্শন করছেন। সাথে সাথে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— তিনি জীবন ও মৃত্যুকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারা সফলকাম হবে; পক্ষান্তরে যারা অকৃতকার্য হবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ হিসেবে তিনি পৃথিবীর প্রথম মানুষ বা মানব পিতা আদমকে (আ.) বেহেশতের মধ্যে নির্দিষ্ট গাছের কাছে যেতে নিষেধ করে পরীক্ষা করেছেন। শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে ভুলবশত তাঁর পদস্থলন ঘটল। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁকে বেহেশতের বাইরে অবস্থান করতে হয়। এখান থেকেই আদম (আ.) ও শয়তানের মধ্যকার শত্রুতা এবং তা পরবর্তীতে আদমসন্তান ও ইবলিসের বংশধরের মধ্যে স্থায়ী রূপ লাভ করে। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মানুষ যাতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে এবং তাদের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হয় সে জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে শরীয়াহ প্রবর্তন করেছেন। এ শরীয়াহ প্রবর্তনের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে শেষ নবী মুহাম্মদের (সা.) মাধ্যমে।

ইসলামী শরীয়াহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এতে সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাদের সাধ্যাতীত কোনো কাজের নির্দেশ দেন না এবং দ্বীন বা শরীয়াহ পালনকে তাদের জন্য কষ্টসাধ্য করতে চান না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

> "আল্লাহ কারো উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত।"
>
> [সূরা বাকারা: ২৮৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

> "আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"
>
> [সূরা মায়েদা: ৬]

শরীয়াহর বিভিন্ন বিধান গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মঙ্গল ও কল্যাণার্থেই শরীয়াহ প্রবর্তন করেছেন। তবে এ

মঙ্গল বা কল্যাণ নির্ধারিত হবে আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, বান্দার ইচ্ছার আলোকে নয়। কারণ, বান্দা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে সাময়িক বিবেচনায় কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করে থাকে; পরবর্তী জীবনের কথা চিন্তা করে না। আর আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মানুষের স্রষ্টা, তাই তিনিই তাদের অস্থায়ী ও স্থায়ী কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল। যেমন কোনো শিল্পকর্মের ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা সংশ্লিষ্ট শিল্পীই ভালোভাবে অবগত, অন্য কেউ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুদভিত্তিক ব্যবসা, মানুষের খাদ্যদ্রব্য কুক্ষিগত করা, ঘুষ গ্রহণ করা ইত্যাদি উপায়ে সহজে অর্থ উপার্জন করে সম্পদশালী হওয়া যায়। যা সাময়িকভাবে খুবই ফলদায়ক ও কল্যাণকর মনে হয়। অথচ পরকালীন জীবনে এর যে ভয়াবহ পরিণাম ও করুণ পরিণতি হবে তা চিন্তা করলে কেউই এটাকে মঙ্গলজনক ভাবতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের মাকাসিদুস শরীয়াহ বা শরীয়াহর মূল লক্ষ্য জানা উচিত, যাতে সে নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

বান্দাদের যে সকল মঙ্গল ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শরীয়াহ প্রবর্তন করা হয়েছে তা দুভাবে অর্জিত হওয়া সম্ভব: একটি হলো মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর বিষয়গুলোকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা, আর অন্যটি হলো তা টিকিয়ে রাখা বা সংরক্ষণের চেষ্টা করা। বাস্তবতার নিরিখে এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আর তা হলো:

১. মৌলিক অত্যাবশ্যকীয়,
২. সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় ও
৩. শোভা বা সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়।

এদের প্রত্যেকটির আবার রয়েছে কতিপয় পরিপূরক বা সম্পূরক বিষয়। তাছাড়া গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রত্যেকটির মর্যাদাও এক রকম নয়। একটির সাথে অন্যটি সাংঘর্ষিক বা দ্বান্দ্বিক হলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো।

১. মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়

মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বলতে ঐ সকল বিষয়কে বুঝায় যার উপর মানুষের জীবন, সমাজের স্থিতি-স্থায়িত্ব, দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গল বা কল্যাণ নিহিত। এর একটি বিনষ্ট হয়ে গেলে বা কোনো ব্যত্যয় ঘটলে জীবন বিপন্ন হবে ও সমাজব্যবস্থা ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হবে। এ মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় মোট পাঁচটি: ধর্ম,

জীবন, জ্ঞান, বংশ ও সম্পদ। মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়কে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা ও তা যথাযথ সংরক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামী শরীয়ায় এবং এ লক্ষ্যে শরীয়ায় বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ায়ও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

ক) ধর্ম: দ্বীন বা ধর্ম মানবসভ্যতার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। তাই দ্বীনের অস্তিত্ব বিনির্মাণের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া এবং এর আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি যেমন: ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস, রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস, পরকাল, পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাসের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী বাহ্যিক আমল তথা সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্বসহ অন্যান্য ইবাদত প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সবের মাধ্যমে দ্বীন সুরক্ষিত হবে, মানুষের অবস্থার সার্বিক উন্নতি হবে এবং সমাজ একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এ দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য যথাক্রমে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও তাদের সাথে লড়াই করার বিধান দেয়া হয়েছে। উপরন্তু যারা ধর্মদ্রোহী, প্রকাশ্যে পাপাচারী, মানুষের আকীদা-বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টিকারী ও আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খ) জীবন: মানুষের জীবনের অস্তিত্ব দানের জন্য বিবাহের প্রচলন করা হয়েছে। আর তা সুরক্ষার জন্য সুষম খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে জীবন ধ্বংসকারী কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ও অন্যের জীবননাশ করা থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমনিভাবে রাষ্ট্রের উপর জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের বাধ্যবাধকতা, আত্মরক্ষার জন্য জিহাদের বিধান ও সামগ্রিকভাবে জীবন রক্ষার জন্য হত্যার পরিবর্তে হত্যা বা কিসাসের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

গ) জ্ঞান: মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার 'আকল' বা জ্ঞান। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য প্রাণী থেকে তাকে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন। মানুষের জ্ঞান ও 'আকল' যাতে সমৃদ্ধ হয় সেজন্য তাকে চিন্তার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে ও জ্ঞানের অনুশীলন করতে বলা হয়েছে। তাছাড়া সুষম খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে দৈহিক শক্তি অর্জন ও মেধা বিকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ জন্যই কাজী বা

বিচারককে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করতে নিষেধ করা হয়েছে ও নামাযের সময় খাদ্য উপস্থিত হলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামায আদায় না করে আগে খাদ্য গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। জ্ঞান ও 'আকল' সমৃদ্ধ হওয়ার কারণেই মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তিনি জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে নিদর্শন ও চিন্তার খোরাক রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

> "এও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না যে আমি এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করতে থাকে? অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন।"
>
> [সূরা ত্বহা: ১২৮]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

> "তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদের্শন।"
>
> [সূরা নাহল: ১২]

এছাড়া যারা জ্ঞান সঞ্চালন করে না এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না তাদেরকে তিনি নিকৃষ্ট জীব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

> "আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বুঝে না।"
>
> [সূরা আনফাল: ২২]

মানব জীবনের এই মহা মূল্যবান সম্পদ তথা জ্ঞান যাতে কোনোভাবেই বিকৃত বা বিনষ্ট না হয় সেজন্য ইসলামী শরীয়ায় নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করাকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হারাম করা হয়েছে। সাথে সাথে এ বিধান অমান্যকারীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

> "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং, তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা

সফলকাম হতে পারো।”

[সূরা মায়েদা: ৯০]

ঘ) বংশ: মানুষের বংশ রক্ষা করার জন্য শরীয়ায় বৈধ বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে প্রত্যেকটি সন্তান তার পিতামাতার পরিচয় জানতে পারে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বংশানুক্রমিক ধারা অব্যাহত থাকে। এ বিধানের মাধ্যমে পারিবারিক শৃঙ্খলাও অটুট থাকে। বৈধ বিবাহের ব্যবস্থা না থাকলে মানুষের পিতৃপরিচয় থাকতো না এবং মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো মৌলিক ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যেত না। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান পিতৃ ও মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠে। ফলে সে একটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল সমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

আর বংশানুক্রমিক ধারা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য অবৈধ যৌনমিলন বা ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে এবং তার জন্য সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের বিধান পর্যন্ত রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী কেউ যাতে অপবাদের শিকার না হয়, সেজন্য অপবাদকে হারাম করা হয়েছে ও তার শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এমনিভাবে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে গর্ভপাত ও বন্ধ্যাত্বকরণকেও হারাম করা হয়েছে।

ঙ) সম্পদ: আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সম্পদ মানুষের জন্য একটি বড় নেয়ামত। আল্লাহ তায়ালাই এর প্রকৃত মালিক। বান্দার কাছে তা আমানত হিসেবে শর্তাধীন মালিকানায় দেয়া হয়েছে মাত্র। মানুষ যাতে বৈধ সম্পদের মালিক হতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ইত্যাদি। এছাড়া সম্পদ উপার্জনের জন্য তাদেরকে উৎসাহও দেয়া হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের কাজ পাওয়ার অধিকার প্রদান, সকল নাগরিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও বেকারত্ব দূরীকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা প্রদান, ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ ও প্রয়োজনমাফিক শ্রমিকের মূল্য নির্ধারণের বিধান দেয়া হয়েছে। আর এ সম্পদ যাতে সুরক্ষিত থাকে সেজন্য চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠনসহ অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ হরণ বা বিনষ্ট করা ও যে কোনো ধরনের আত্মসাৎ হারাম করা হয়েছে এবং তার জন্য শাস্তি ও জরিমানার বিধান দেয়া হয়েছে। এছাড়া সম্পদ পবিত্র করার জন্য যাকাতের বিধান দেয়া হয়েছে। এবং সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তা নির্বোধ ও পাগলের কাছে গচ্ছিত রাখতে বারণ করা হয়েছে।

২. সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয়

সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয় বলতে ঐ সকল বিষয়কে বুঝায় যা অর্জিত হলে মানুষ ইবাদত, মুয়ামালাতসহ (পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন) যাবতীয় কাজ স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে আঞ্জাম দিতে পারে, কোনো কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয় না। তবে বিভিন্ন অসুবিধা ও সংকীর্ণতার মুখোমুখি হতে হয়। আর এই কষ্ট বা অসুবিধা সব সময় সামগ্রিক হয় না; বরং কখনো কখনো তা আপেক্ষিক হয়। সেক্ষেত্রে শরীয়াহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য আলাদা বিধানের ব্যবস্থা রেখেছে। মানুষ যাতে শরীয়ার নির্দেশানুযায়ী ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে অনায়াসে পথ চলতে পারে সেজন্য শরীয়াহ বিভিন্ন সুবিধাজনক বিধান চালু করেছে। যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য শরীয়ায় রুখসতের বিধান দেয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থতা ও ভ্রমণজনিত কারণে রমযানের রোযা রমযান মাসে না রেখে সুবিধাজনক অন্য যে কোনো সময়ে রাখার সুযোগ, ভ্রমণজনিত কারণে চার রাকাত নামায কসর করে দু'রাকাত আদায়, দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করে এক ওয়াক্তে আদায়, অসুস্থতার কারণে বসে বসে নামায আদায়, পানির অবর্তমানে তায়াম্মুমের বিধান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুরূপভাবে মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে বাইয়ে সালাম বা আগে টাকা নিয়ে পরে মাল দেয়ার বিধান, অগ্রিম শ্রম বা শিল্প বিক্রয়, ইজারা প্রথা, কম দামে ক্রয় করে বেশি দামে বিক্রয়, পরিমাণ জানা নেই এমন বস্তু বিক্রয়, জমি বর্গা দেয়া, ফল ভাগাভাগির বিনিময়ে গাছ পরিচর্যা করতে দেয়া, যে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার জীবন পরিচালনা করা কষ্টকর তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তালাক প্রথা ইত্যাদি বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া আদাত বা মানুষের স্বভাবিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশস্ততার বিধান রয়েছে। যেমন: পশুপাখি শিকার, উন্নতমানের হালাল পানাহার, গাড়ি ও বাড়ি ইত্যাদি উপভোগ করার বৈধতা আছে। এমনিভাবে অপরাধের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে ভুলক্রমে হত্যার জন্য দিয়াতের বিধান, নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের সাথে সমঝোতার বিধান ও সংশয়ের বশীভূত হদ কার্যকর না করার বিধান ইত্যাদি উল্ল্যেখযোগ্য।

সুন্দর ও সাবলীলভাবে পথ চলার বিধান ছাড়াও 'সাধারণ আবশ্যক বিষয়' দ্বারা পূর্বোক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে সুরক্ষার জন্য উহার আনুষঙ্গিক বিধানাবলীকেও বুঝায়। যেমন: মদের ব্যবসা, পরনারীদের দিকে কুদৃষ্টি দান, লুণ্ঠিত ভূমিতে সালাত আদায়, খাদ্যদ্রব্য কুক্ষিগত করাসহ ইত্যাকার বিষয়গুলো হারাম হওয়া এরই

অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই সাধারণ প্রয়োজন মিটানোসহ জীবন চলার পথ সহজীকরণের ব্যাপারে শরীয়াহর উদারতা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

> “তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।”
>
> [সূরা হজ্ব: ৭৮]

তিনি আরো বলেন,

> “আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না।”
>
> [সূরা বাকারা: ১৮৫]

৩. শোভা বা সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়

শোভাবর্ধক বিষয় বলতে ঐ বিষয়কে বলা হয় যা অর্জিত হলে মানুষের উত্তম আদর্শ, চারিত্রিক মূল্যবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। এর কোনো একটির ব্যত্যয় ঘটলে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে না বা জীবন চলার পথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না; তবে শিষ্টাচার ও সৌজন্য বিঘ্নিত হবে।

এর উদাহরণ হিসেবে ইবাদতের ক্ষেত্রে নাজাসাত বা নাপাকী দূরীকরণসহ সকল প্রকার পবিত্রতা, সতর আবৃত করা, মসজিদে গমনের উত্তম পোশাক পরিধান করা, নফল নামায ও রোযা পালন, যাকাতের পরে অতিরিক্ত দান-খয়রাত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে নাপাক বস্তু বিক্রয় ও একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ; ফাসিক ব্যক্তিকে সাক্ষ্য ও নেতৃত্বের অযোগ্য ঘোষণা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদাত বা অভ্যাসগত বিষয়ের মধ্যে পানাহারের শিষ্টাচার বা নিয়ম কানুন মেনে চলা, যেমন: ডান হাতে পানাহার করা, নিজের সন্নিকট থেকে খাওয়া, অপবিত্র বস্তু আহার করা থেকে বিরত থাকা, পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা ও অপচয় না করা এবং উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়ার নির্দেশনা। অনুরূপভাবে অপরাধের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে কিসাসের কারণে বা যুদ্ধের ময়দানে লাশ বিকৃত না করা; যুদ্ধের ময়দানে নারী, শিশু ও ধর্মযাজকদের হত্যা না করার বিধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক বিষয়গুলোর সম্পূরক বিষয়সমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে, উপরোক্ত তিন প্রকারের মাসালেহ বা মঙ্গলজনক বিষয়সমূহের রয়েছে কতিপয় সম্পূরক বা পরিপূরক বিষয়, যা ঐগুলোকে সুন্দর ও উত্তম উপায়ে

সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে।

মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের সম্পূরকের উদাহরণ হিসেবে নামাযের পরিপূর্ণতার জন্য আযান ও জামায়াতবদ্ধভাবে নামাযের বিধান প্রবর্তন; বৈবাহিক জীবনকে সুখময় করে তোলার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমতার বিধান ও প্রস্তাবিত স্ত্রীকে দেখার বৈধতা; ব্যভিচার থেকে পরিপূর্ণভাবে হেফাজতের জন্য কোনো নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত না হওয়া, যৌনবাসনা নিয়ে তার দিকে না তাকানো, একাকী কোনো নারীর সফরে বের না হওয়ার বিধান; আকল সংরক্ষণের জন্য মদ হারামের বিধানের পরিপূর্ণতার জন্য নেশাজাতীয় দ্রব্য কম পরিমাণ হলেও তা সেবনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং সম্পদ সংরক্ষণের বিধানের পরিপূর্ণতার জন্য প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় ও অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রয় না করার বিধান উল্লেখ করা যায়।

সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয়ের সম্পূরকের উদাহরণ হিসেবে বেচাকেনার মধ্যে বৈধ শর্তারোপের বিধান, ভুলক্রমে হত্যাকারীর ক্ষেত্রে সহজীকরণের জন্য যে দিয়াতের বিধান দেয়া হয়েছে তার পরিপূর্ণতার জন্য ঐ দিয়াত পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করার বিধান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শোভাবর্ধক বিষয়ের সম্পূরক হিসেবে নফল সদাকার বিধানের পরিপূর্ণতার জন্য উত্তম মাল থেকে সদাকা প্রদানের বিধান; নফল ইবাদত তথা নামায-রোযা শুরু করলে তা সমাপ্ত করার বাধ্যবাধকতার বিধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গুরুত্ব বিচারে মাসালেহ বা মঙ্গলজনক বিষয়সমূহের স্তর

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় বলা যায়, পূর্বোক্ত তিনটি বিষয় ও সেগুলোর সম্পূরকসমূহ গুরুত্ব বিচারে এক ও সমপর্যায়ের নয়। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিচারে প্রথমে মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, তারপর সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয়, তারপর শোভাবর্ধক বিষয়, তারপর এগুলোর সম্পূরক বিষয়সমূহের অবস্থান। আর এ হিসেবে মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের ক্ষতিসাধন করে এমন সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয়ের সংরক্ষণ করা যাবে না। তদ্রূপ সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয়ের ক্ষতিসাধন করে এমন শোভাবর্ধক বিষয়ের সংরক্ষণ করা যাবে না এবং মৌলিক বিষয়ের ক্ষতিসাধন করে এমন সম্পূরকের সংরক্ষণ করা যাবে না। এছাড়া কোনো এক স্তরের সাথে অন্য স্তরের দ্বন্দ্ব হলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অনুরূপভাবে একই স্তরের দুটি বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে অধিকতর প্রয়োজনীয়টি প্রাধান্য পাবে।

প্রথমটির উদাহরণ হিসেবে চিকিৎসার স্বার্থে কারো সতর অনাবৃত করার বৈধতা উল্লেখ করা যায়। কারণ সতর আবৃত করা সৌন্দর্যবর্ধক আর আত্মরক্ষার স্বার্থে অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা মৌলিক অত্যাবশ্যকীয়। এমনিভাবে জীবন বাঁচানোর স্বার্থে অপবিত্র বস্তু বা মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণের বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। কারণ, অপবিত্র বস্তু খাওয়া থেকে বিরত থাকা সৌন্দর্যবর্ধক আর জীবন বাঁচানোর স্বার্থে তা খাওয়া মৌলিক অত্যাবশ্যকীয়। একইভাবে শরীয়াহর যাবতীয় বিধান পালন কষ্টসাধ্য হলেও দ্বীন রক্ষার স্বার্থে তা পালন করা আবশ্যক। কারণ, দ্বীন রক্ষা মৌলিক অত্যাবশ্যকীয়; আর কষ্ট লাঘব করা সাধারণ আবশ্যকীয়।

আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসেবে দ্বীন ও দারুল ইসলাম রক্ষার স্বার্থে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জিহাদে যাওয়ার আবশ্যকতা উল্লেখ করা যায়। কারণ, জিহাদে গেলে জীবন বিপন্ন হওয়ার শংকা থাকলেও তারচেয়ে দ্বীন ও দারুল ইসলাম রক্ষা অধিকতর জরুরি; যদিও দ্বীন রক্ষা ও জীবন বাঁচানো দুটিই মৌলিক অত্যাবশ্যকীয়। অনুরূপভাবে মদ্যপান ব্যতিরেকে জীবন রক্ষার আর কোনো উপায় না থাকা অবস্থায় মদ্যপানের বৈধতা প্রদান করা এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকল বা জ্ঞান রক্ষার জন্য মদ্যপান হারাম হয়েছে; কিন্তু প্রাণ রক্ষা করা জ্ঞান রক্ষার চেয়েও অধিক জরুরি। তাই জীবন রক্ষার স্বার্থে মদ্যপান করার বৈধতা দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া সম্পূরক বিষয়কে রক্ষা করতে গিয়ে যদি মূল বিষয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে তা বিবেচনায় আনা যাবে না। যেমন: রাষ্ট্রপ্রধান ও নামাযের ইমাম দুজনের ক্ষেত্রেই আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা সম্পূরক বিশেষণ; কিন্তু জালিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি জিহাদের ডাক দেয় ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি নামাযে ইমামতি করে সেক্ষেত্রে প্রথমটিতে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে ও দ্বিতীয়টিতে জামায়াতের সুন্নাত আদায়ের স্বার্থে শরীক হওয়া আবশ্যক। এখানে আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা বিচার করতে গেলে মূল কাজ ব্যাহত হবে।

ইসলামী শরীয়াহর ধারাবাহিকতা, মদীনা সনদ ও উম্মাহর ধারণা

আ. ক. ম. আব্দুল কাদের

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: *রাসূল (সা.) মক্কায় যে নবুয়তী কার্যক্রম শুরু করলেন এবং ওহীর নির্দেশ ও নির্দেশনার ভিত্তিতে যে রিফর্ম শুরু করলেন এবং মদীনায় গিয়ে তা সম্পন্ন করলেন, এ বিষয়ে প্রচলিত ধারণার চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের কিছু আইডিয়া আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। বিষয়টি আমার পর্যবেক্ষণেও ছিলো, বাট ইউ কনফার্মড ইট প্রিসাইসলি। তারমধ্যে একটি হলো— শরীয়াহর কন্টিনিউশনটা একেবারে অভিনব কিছু নয়। এর অধিকাংশই মক্কায় প্রচলিত ছিলো। কিন্তু সেগুলোর কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার তিনি করেছেন। এগুলো নতুন করে আনেন নাই। যেমন— সেখানে হজ্ব ছিলো, যাকাতের একটি ফরম্যাট চালু ছিলো, নামাযেরও একটি ফরম্যাট চালু ছিলো, রোযাও এক ধরনের ছিলো। মানে, ইসলাম একেবারে নতুন কোনো কথা বলে নাই। সমাজের মধ্যে যে ভালো দিকগুলো ছিলো, সেগুলোই আসলে সুন্দরভাবে, সিস্টেমেটিক্যালি ইসলামী শরীয়াহর মাধ্যমে এসেছে।*

২০১৮ সালের ২২ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাহাড়িকা আবাসিকে অবস্থিত ড. আ. ক. ম. আব্দুল কাদেরের বাসায় এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়। তারপর ট্রান্সক্রিপ্টেড কপিতে তিনি কিছু যোজন-বিয়োজন করেন। সেই উপলক্ষ্যে ১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে আরেক দফা তাঁর সাথে কথা হয়। সর্বশেষ কথোপকথনের আলোকে এই স্ক্রিপ্টটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্রের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

প্রচলিত ধারণা হলো— ইসলাম একেবারে নতুন। 'জাহেলী যুগের' সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই। এবং থাকলে তা ইসলামের জন্য ডিসক্রেডিট। অর্থাৎ, 'জাহেলিয়াত' থেকে টার্ম নিয়েছে, 'জাহেলিয়াত' থেকে রিচুয়াল নিয়েছে, 'জাহেলী যুগের এক ধরনের কন্টিনিউশন— এমন ধারণা ইসলামের জন্য ডিসক্রেডিট বলে মনে করা হয়।

আ. ক. ম. আব্দুল কাদের:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো।"

[সূরা বাকারা: **১৮৩**]

কন্টিনিউশন তো এই আয়াত দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে।

– তখন উনারা বলবেন, এই কন্টিনিউশন তো ইবরাহীমের (আ.) সাথে সম্পর্কিত। মক্কার লোকদের সাথে তো নয়।

– ঠিক আছে। মক্কার লোকদের সাথে রিলেটেড হলেও, মক্কার লোকেরা আসলে কারা?

– মক্কার লোকদেরকে তো প্যাগান বলা হচ্ছে, মূর্তিপূজক বলা হচ্ছে। এরা এক সময় ইবরাহীমের (আ.) অনুসারী ছিলো বটে, কিন্তু...।

– ঠিক আছে। ইসমাঈলের (আ.) অবস্থান এবং সামগ্রিক কার্যক্রম মক্কাকেন্দ্রিক ছিলো।

– তিনি তো ইন্তেকালও করেছেন সেখানে।

– মক্কাকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে সবকিছু যে একেবারে মুছে গেছে, তা নয়। কিছু জিনিস বিকৃত হয়েছে। একটা উদাহরণ দেই। আমরা যে বিচার-আচারে তৃতীয় পক্ষ নিয়ে আসি, সালিস মানি, আরবীতে একে বলে 'সালেস' অর্থাৎ, তৃতীয় পক্ষ। মানে, বাদী (মুদ্দা আলাইহি) ও বিবাদী (মুদ্দায়ী) পক্ষের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যিনি থাকেন, তিনি হলেন 'সালেস'। এই পদ্ধতিটিকে কোরআন বলছে 'হাকাম'। মানে, যে চূড়ান্ত ফয়সালা দেবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে, এর ফয়সালা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে— দুই পক্ষ থেকে দুইজন লোক আনবে, যারা তাদের হয়ে

কথা বলবে। সূরা নিসার ৩৫ নং আয়াতে আছে— حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে)। তাহলে 'হাকাম' শব্দটি তো তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো, যা কোরআনে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

– কোরআনের এই আয়াতে 'হাকাম' শব্দটি যে ইসলামপূর্ব আরব থেকে নেয়া হয়েছে, এর প্রমাণ কী?

– এর প্রমাণ হলো, এই পদ্ধতিটি তাদের মাঝে প্রচলিত ছিলো। 'হাকাম' পদ্ধতি তখনকার সমাজব্যবস্থার অংশ ছিলো।

– মানে, সেখানকার ইতিহাস পড়লে আমরা সেটি জানতে পারি?

– হ্যাঁ, তখন আমরা জানতে পারি যে এই সিস্টেমটা ওখানে ছিলো।

– আরবিট্রেশনের ধারণাটা তো সব সমাজের মধ্যেই কমবেশি থাকার কথা...।

– ঠিক আছে। কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলো মানবসমাজের জন্য প্রযোজ্য। ইহুদী, খ্রিষ্টান থেকে শুরু করে সকল সমাজেরই কিছু মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

– যেমন, পারিবারিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কিছু বিষয়...।

– যেমন, ইহুদীদের মধ্যে যে ব্যক্তি জায়গা-জমি লগ্নি করে, উৎপাদিত ফসল বা শস্যের ক্ষেত্রে বর্গাভাগ (যেমন: আল্লাহর রাসূল (সা.) খায়বার যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন ইত্যাদি), সেটার নাম হলো 'মুখাবারা' (জায়গা-জমি বর্গা দেয়া)। শব্দটির রুট হলো 'খাইবার'। মানে খাইবারের সাথে মুখাবারার সম্পর্ক। খাইবারের জমিতে যে নীতি ছিলো সেটাই হলো মুখাবারা। ইসলামও সেটি বহাল রেখেছে।

– খাইবারের ইহুদীরা পরস্পরের সাথে এটা করতো?

– হ্যাঁ। ইসলাম এটাকে বাতিল করেনি। যেমন: পুত্র সন্তানদের খৎনা। এটি ইবরাহীমের (আ.) সময় থেকে চলে আসছে। আরবদের মধ্যেও এটি প্রচলিত ছিলো। ওদের মধ্যে অনেক জাহেলিয়াত থাকার পরেও কিন্তু খৎনা সিস্টেম তারা বাতিল করেনি। সেই খৎনার বিধান ইসলামও গ্রহণ করেছে।

যেমন, কুরবানী আদমের (আ.) সন্তানদের সময় থেকে প্রচলিত। আল-কোরআনে এর বিবরণ আছে। পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে ইবরাহীমের (আ.) সময় থেকে।

এসবের অর্থ হলো, যদি বলা হয়— ইসলাম হঠাৎ করে আসা একটি ধর্ম, তাহলে

যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ধারাবাহিকতাকে কাট-আপ করে ফেলতে হবে। অথচ প্রত্যেকে নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছে। শরীয়ত তো নতুন নয়, এটি আল্লাহ প্রদত্ত। যুগের পরিবর্তন, কালের পরিবর্তনের কারণে বিধানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ধরনের সংযোজন...।

– কিছু বেশকম হয়েছে। সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে।

– হয়েছে। কিন্তু...

– মূল কাঠামো ঠিক ছিলো।

– অবশ্যই ঠিক ছিলো। কারণ, তাওহীদের কাঠামোর তো পরিবর্তন হয়নি।

– রোযার কথা আল্লাহ নিজেই বলেছেন। এছাড়া যাকাত, নামায, হজ্ব তো জাহেলী যুগেই ছিলো। নাকি?

– যাকাতের বিষয়ে কোরআনে অনেকগুলো আয়াত আছে। যেগুলোতে প্রত্যেক নবী-রাসূলকে যাকাত দিতে বলা হয়েছে।

– তাহলে 'বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন' শীর্ষক উমর ইবনুল খাত্তাবের (রা.) যে বিখ্যাত হাদীস বা হাদীসে জিবরীলের মধ্যেও যেটা আছে— ইসলাম কী বলুন...।

– ইসলাম কী? ঈমান কী? ইত্যাদি...

– জ্বি। তো, এখন এই পঞ্চস্তম্ভ, বলা যায়, এটি...

– ইসলাম তো মুহাম্মদের (সা.) সময় থেকে চালু হয়েছে, এমন নয়। 'হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমীন' আয়াতটি তো আগে থেকেই চলে আসছে।

– ইবরাহীমের (আ.) সময় থেকে?

– হুম।

– আচ্ছা, আমরা যদি ইবরাহীমের (আ.) পূর্ববর্তী যুগের কথা বলি, তাহলে সেখানকার ব্যাপারে কী হবে?

– সে ব্যাপারে কথা হলো, সর্বপ্রথম কিতাব নাযিল হয়েছে বা শরীয়ত এসেছে নুহের (আ.) উপর। তার আগ পর্যন্ত শুধু তাওহীদী কনসেপ্ট ছিলো। মানে তাওহীদ মানতে হবে, রাসূল মানতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপকভিত্তিতে শরীয়ত এসেছে নুহের (আ.) সময় থেকে।

– নিজেদের মতো করে জীবনযাপনের জন্য যা কিছু করণীয় ছিলো...

– এই যে 'মারুফ' বা 'মুনকার' বলা হয়, এগুলো প্রত্যেক যুগে ছিলো। মারুফ মানে কী? এর শাব্দিক অর্থ হলো পরিচিত। অর্থাৎ সমাজে যে কাজগুলো ভালো হিসেবে পরিচিত।

– কিন্তু পরিভাষাগত অর্থ কী হবে?

– পরিভাষাগত অর্থে মারুফ তো মারুফই। মারুফ মানে যেটি 'উরুফ'। মারুফের সাথে উরুফের সম্পর্ক। উরুফ মানে হলো কাস্টমস বা usage।

– ও, আচ্ছা, উরুফ? উরুফ শব্দটি আমি প্রথম শুনেছি (প্রফেসর ড. আনোয়ারুল হক) খতিবী স্যারের কাছ থেকে, শহীদ মিনারে ফুল দেয়া প্রসঙ্গে। আর্টস ফ্যাকাল্টির লাউঞ্জে এসে অজু করে এক কোনার সোফায় তিনি সাধারণত বসতেন। তারপর শহরের গাড়ি ধরার জন্য চলে যেতেন। এই ফাঁকে আমি উনার সাথে কথা বলতাম। একদিন বললাম, 'স্যার, এই যে এরা শহীদ মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেয়, এটা তো হারাম।' এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি আমার দিকে এমন করে তাকালেন, যেন আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। বললেন, 'তোমাকে কে বলেছে এটা হারাম?' আমি বললাম, 'স্যার, এটা তো আমার কাছে হারামই মনে হয়।'

তিনি বললেন, 'না, হারাম হওয়ার জন্য 'নস' থাকা শর্ত। সেটা এখানে নাই।' তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে এটি কী?' তিনি বললেন, 'এটা একটা উরুফ বা সামাজিক প্রথা। তবে এটা একটা বাজে বা খারাপ সামাজিক প্রথা। এটা থেকে বেঁচে থাকাই ভালো। কিন্তু হারাম বলার জন্য তো অকাট্য দলীল লাগবে।'

তো, নস এবং উরুফ শব্দ দুটি আমি উনার কাছ থেকেই প্রথম শুনেছি।

– উরুফের সাথে মারুফের সম্পর্ক।

– উরুফ তো নাকি শরীয়াহর উৎসগুলোর একটি?

– উরুফ দুই রকম। উরুফে আম এবং উরুফে খাস। শরীয়তের বিধানগুলো মানার ক্ষেত্রে যে প্রমাণগুলো আমরা গ্রহণ করি — কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ — সেখানে কিন্তু উরুফও অন্তর্ভুক্ত। 'আল-উরফু ওয়াল-আদালাতু ওয়াত-তাকালীদ'— বর্তমান স্কলারগণ এই তিনটা শব্দ এনেছেন।

শরীয়তের গ্রহণযোগ্যতার জন্য এই তিনটা শব্দ স্কলারগণ বের করেছেন। তাহলে উরুফ মানে কী? উরুফ মানে হলো, ওই যে, যেটা পছন্দ, ভালো জিনিস হিসাবে।

এই উরুফ থেকেই কিন্তু মারুফ।

– আমরা যে লোকাচার একটা শব্দ বলি...।

– এগুলোই আরকি। বাবাকে ‘আপনি’ বলতে হবে। ‘তুমি’ সম্বোধন করলে বেয়াদবি হবে। এসব তো কোনো কিতাবে নাই। তুমি খুঁজে পাবে না। আরবীতে তো ‘তুমি’ সর্বনামটাই নাই। আছে ‘আনতা’। তো, এই লোকাচারগুলোই উরুফ।

– তাহলে এটারও কি শরয়ী মর্যাদা আছে?

– হ্যাঁ, আছে। ওয়াহহাব আয-যুহাইলী, শাইখ আবু যাহরাহ, আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফসহ সকল ইসলামিক স্কলার উরুফকে ইসলামী শরীয়তের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মদীনা সনদেও অনেকবার উরুফ তথা প্রথার স্বীকৃতি বিষয়ক প্রসঙ্গ দেখা যায়।

উরুফের শরয়ী মর্যাদা না থাকলে আরবদের প্রচলিত যেসব ধারণা শরীয়তে এসেছে, সেগুলো তো টিকবে না। যেমন: হজ্ব আরবরাও করতো। তবে তারা উলঙ্গ হয়ে করতো। ইসলাম এসে হজ্বের নির্দিষ্ট কাপড় ঠিক করে দিয়েছে। পরিবর্তনগুলো এভাবে হয়েছে। তারপর, ওরা সালাত আদায় করতো হয়তো দেবদেবীর জন্য, সূর্যোদয়ের সময় সূর্যকে পূজা করার জন্য। কিন্তু ইসলামে সালাত হলো আল্লাহর জন্য। এবং যাকাতের বিধানের ব্যাপারে তো বললাম, এটি বিভিন্ন যুগে ছিলো। আমি কয়েকদিন আগে রিবা নিয়ে পড়েছি। রিবার উপর পড়তে গিয়ে দেখলাম, প্লেটো-এরিস্টটলরাও রিবা নিয়ে কথা বলেছেন। অর্থাৎ, তৎকালীন সমাজে রিবার ব্যাপক প্রচলন ছিলো, এগুলো যে শোষণের হাতিয়ার, তা দেখে তাঁরা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

– তখনকার জ্ঞানীগুণী, চিন্তাবিদগণ এগুলো নিয়ে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া বা...।

– প্রতিক্রিয়া মানে, তাঁরা এর বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন যে এগুলো সোশ্যাল ইনজাস্টিস। এর অর্থ হলো, এই রিবার ক্ষেত্রেও...।

– তাহলে তো স্যার, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হওয়ার মতো অবস্থা! মানুষের ভেতরের যে অন্তর্গত একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য, সেটা তো তাহলে দেখা যাচ্ছে সবসময়ই...।

– এটাই হলো মূলধর্ম বা স্বভাবধর্ম। কীভাবে? সেটি তোমাকে বলি। মূর্তি ভাঙ্গার পরে ইবরাহীম (আ.) তো লুকিয়ে ছিলেন। আট বছর বয়সে। সেখান থেকে তিনি

বের হলেন। বেরিয়ে প্রথম কী দেখলেন? তারকা। তিনি সন্ধ্যার পশ্চিমাকাশে জ্বলজ্বলে তারকা দেখতে পেলেন। এবং বললেন— 'হাযা রাব্বী' (এটাই আমার রব)। এর উপর তিনি অটল আছেন। কিছুক্ষণ পর গভীর রাতে যখন আকাশে বড় চাঁদ উঠলো, তখন তিনি বলে উঠলেন, তাহলে ওইটা তো রব নয়, ওইটা ছোট, 'হাযা রাব্বী' (এটাই আমার রব)। এরপর চাঁদও যখন ডুবে গেলো, রাত পোহালো, দিন হলো। এরপর যখন সকালবেলা প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে সূর্য উঠলো, তখন তিনি বলে ওঠলেন— 'হাযা রাব্বী, হাযা আকবর'।

তাহলে তুমি যেটা বললা, এই যে মানুষের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা বা ইনকুইজেটিভনেস, এটি তো সবসময় ছিলো।

– তাহলে স্যার, মাঝখানে একটা কথা যদি বলে ফেলি। ইবরাহীম (আ.) কি অন্তত একদিনের জন্য হলেও শিরক করেছিলেন?

– না, তিনি শরীক করেন নাই। তিনি তখন তাওহীদ অন্বেষণ করছিলেন। তুমি এটাকে শিরক বলতে পারো না। যেমন: বাংলাদেশের লোকেরা কী সন্তুষ্টচিত্তে ব্রিটিশদের শাসন মেনে নিয়েছিলো?

– না, এটি একটি প্রসেসে আসছে আরকি...।

– প্রসেসে মেনে নেয়নি। বরং তারা পথ খুঁজছিলো কীভাবে এই গোলামি হতে বের হওয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে, এটা হয়েছে, সেটা হয়েছে। তারপর তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা হয়েছে। তাহলে বুঝা গেলো, এরা মেনে নেয়নি। বরং...।

– না, কোনো একটা অবস্থায় তো অন্য আরেকটা অবস্থা পেরিয়ে আসতে হয়। মানে, লাফ দিয়ে তো কোনো কিছু ঘটে না।

– তাহলে 'তিনি শিরক করেছেন' নয়, বরং বলতে হবে তাওহীদের জার্নিতে ছিলেন, জার্নির পথে প্রথম যেটা পেয়েছেন সেটাকে...। এবং এই জার্নিতে থাকার কারণে ওই সময় যদি তাঁর মৃত্যুও ঘটতো, তাহলেও উনাকে মুশরিক বলার সুযোগ ছিলো না। কারণ, তিনি তো একক সত্তাকে তালাশ করছিলেন।

– এই প্রসঙ্গে তাহলে এ কথাটাও চলে আসে। দূরের কোনো এলাকায়, যেখানে কোনো সত্যের বাণী পৌঁছেনি এবং কারো কুফুরী করার সুযোগও হয় নাই। তারা প্রাকৃতিক জীবনযাপন করে...

– "রাজুলুন মা'তা 'আলা শাহিকিল জাবালি" কথাটি কিতাবেই আছে।

– কোন কিতাবে?

– প্রায় কিতাবেই আছে। আগের কিতাবগুলোতে আছে। আমি যেভাবে বলেছি, সেভাবেই আছে। ইমাম আবু হানীফার (রহ.) ‘ফিকহুল আকবর’ কিতাবটির ব্যাখ্যা গ্রন্থে মোল্লা আলী কারীসহ অনেক প্রাচীন স্কলার এ বিষয়ে মত দিয়েছেন।

এ কথার মানে হলো— কোনো লোক যদি পাহাড়ের চূড়ায় মারা যায়, যেখানে রাসূল পৌঁছেনি, কিতাব পৌঁছেনি, রিমোট অঞ্চল, তুমি যেমনটা বললা, এমতাবস্থায় হাশরের ময়দানে তাকে রেসালাত বা নামায সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন করা হবে না। তাকে কেবল এই প্রশ্নটি করা হবে, ‘তুমি এত নেয়ামত ভোগ করেছো। তোমার মাথায় কি একবারও আসেনি, এগুলো কে তৈরি করলো?’ এই প্রশ্নের ইতিবাচক ও সঠিক উত্তর দিতে পারলে সে নাজাত পেয়ে যাবে।

– মানে তাওহীদকেন্দ্রিক যে কোর কনসেপ্ট, ওইটা...

– এর কারণ হলো, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ইনটুইশন দিয়েছেন, আক্কল দিয়েছেন। “ওয়াল ‘আক্কলু হুনাকা বিমাজাতিল ওয়াহী”— এখানে আক্কলকে ওহীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

– এটা কীসের কথা?

– এটি হলো আমরা আকাইদের যেসব কিতাব পড়েছি, সেখানকার কথা।

– এই কথাগুলোর ভিত্তি কি কোরআন-হাদীসের মধ্যে আছে?

– না, কোরআন-হাদীসে (সরাসরি) নেই। মানে, এমন হতে পারে...

– মানে, তাঁরা স্টাডি করে এমনটা চিন্তা করেছেন...

– মানে, এমনটা হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি আছে না? এখনও তো বহু জায়গায় এমনটা আছে। সেক্ষেত্রে তাহলে তাদেরকে পরকালে কী প্রশ্ন করা হবে? তখন স্কলারগণ সমাধান বের করলেন যে সেখানে যেহেতু মানুষ আক্কল দিয়ে...। ইবরাহীম (আ.) তো আক্কল দিয়েই কাজ করেছেন। কোরআনে তো আক্কলকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘লা’য়াল্লাকুম তা’কিলূন’ (যাতে তারা আক্কলকে কাজে লাগাতে পারে)। এ ধরনের অনেক আয়াত পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান। আমরা এও জানি, ইবাদত কার্যকর হওয়া ও সম্পন্ন করার জন্যও আক্কল বা সুস্থ বিবেকবুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান থাকা শর্ত।

– সমকালীন ইসলামী দর্শন পড়াতে গিয়ে আমি এক সময় শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী হতে কিছু অংশ পড়াতাম। JN Jalbani'র 'Teachings of Shah Waliullah of Delhi' বইটা হতে। তখন দেখেছি তিনি বলেছেন, জাহান্নামে চিরদিন থাকার যে কথা কোরআনে বলা হয়েছে, সেটা শুধু কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য, যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তিনি বলেছেন, এমনকি যাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়া হয় নাই, যাদেরকে ইগনোর করা হয়েছে, যারা দাওয়াত দানকারীদের দ্বারা মিসলিড হয়েছে, তাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিবেন।

– "ফামাই ইয়া'মাল মিসকা'লা যাররাতিন খাইরাইয়ারাহ" (সামান্য ভালো কাজ করলেও এর প্রতিদান সে পাবে) — এটা তো কোরআনেরই কথা। এখানে এই সেন্সের কথাই বলা হচ্ছে।

– কিন্তু আবার আরেকটা হাদীসে আছে না হাতেম তাঈ সম্পর্কে? উনার ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলো— আমার বাবা তো এ রকম অনেক ভালো কাজ করেছে। এগুলোর কী হবে? তাকে জবাব দেয়া হয়েছে— সে দুনিয়াতেই যা পাওয়ার পেয়ে গেছে। আখেরাতে কিছু পাবে না।

– এর কারণ হলো, সে তো তখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য খরচ করেনি। তার খরচটা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতো...। তার মধ্যে তো সোশ্যাল স্বীকৃতি পাওয়ার ইয়ে ছিলো। এই ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে (সা.) যখন জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন— তার কাজের মাধ্যমে মনে হচ্ছে সে মুসলিম ছিলো, কিন্তু আকীদায় ঈমান তো ছিলো না। সে সামাজিকভাবে...। যেমন: হাদীসে তিনজন লোকের ব্যাপারে বলা হয়েছে, একজন শহীদ, একজন আলেম ও একজন দানশীল ব্যক্তি, যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তের পরিবর্তে মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য নিজেদের অর্জনকে ব্যবহার করে। ওইটার সাথে এর কিছুটা সম্পর্ক আছে।

তোমাকে একটা নতুন তথ্য দেই। আমি ছাত্রজীবনে কাদিয়ানীদের কিছু বই পড়তাম। ওই যে আমাদের চবি শাহজালাল হলে কিছু কাদিয়ানী ছিলো, ২/৩ জন। এদের একজনের নাম ছিল মসীহ। তো, ওরা একসময় আমার সাথে ডিবেটে আসলো। ডিবেটে তারা হেরে যায়। এরপর তারা তাদের ঊর্ধ্বতনদের কাছে রিপোর্ট করেছে। তারপর থেকে তারা আমার নামে (ডাকযোগে) তাদের বহু 'রিসালাহ' পাঠিয়েছে। রিসালাহ হলো কাদিয়ানীদের (আহমদিয়া) পত্রিকা। হয়তো এখনো আসছে। আমি ঠিক জানি না। কারণ, আমি তো এখন আর ওখানে থাকি না।

যা হোক, তাদের রিসালাহর মধ্যে আমি দেখলাম, ওদের মতে, কাফেররাও আজীবন জাহান্নামে থাকবে না। এটা ওদের আকীদা। কেন থাকবে না? আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'ফা'আম্মা মান খাফফাত মাওয়াজিনুহু ফা উম্মুহু হাওয়িয়াহ' — যে ব্যক্তির নেকির পাল্লা হালকা হবে তার 'উম্' হবে 'হাবিয়া'। 'উম্' কী? উম্ম মানে মা। মানুষ উম্ম বা মায়ের পেটে থাকে নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহ তায়ালা 'উম' শব্দ ব্যবহার করে বুঝাচ্ছেন, একটা সন্তান মায়ের পেটে 'আবাদান আবাদ' (চিরদিন) থাকে না। এটা কাদিয়ানীদের দলীল। কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেলো এই কথাটা। যদিও এ ব্যাপারে ইসলামের মত হলো স্বতন্ত্র।

– আরেকটা বিষয়। আপনার কাছ থেকেই এটি প্রথম জানতে পারি। এছাড়া 'রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ' বইটাসহ মদীনা সনদ নিয়ে নানা ধরনের পড়াশোনা করে যা জানতে পেরেছি, সেটা আমাদের পপুলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে ভিন্ন রকম। সেটি হলো, মুহাম্মদ (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আরব, হালিফ ও মাওয়ালীসহ সবমিলিয়ে মদীনার জনসংখ্যা ছিলো হাজার দশেক। তারমধ্যে হিজরতের প্রথম দিকে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ৭/৮ শত বা সর্বোচ্চ হাজারখানেক, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ। এর মানে হলো মদীনায় মুসলমানরা তখন ছিলো সংখ্যালঘু।

কিন্তু লোকেরা তো মনে করে, ইসলামী রাষ্ট্র মানে হলো মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্র। যেখানে প্রায় সবাই থাকবে মুসলমান। অথচ দেখা যাচ্ছে, তৎকালীন মদীনায় মুসলমানরা ছিলো মোট জনসংখ্যার দশভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ, অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু।

কিছুদিন আগেও আমাকে একজন কলিগ জিজ্ঞেস করেছেন, দশভাগের বাকি নয় ভাগ সংখ্যাগুরু অমুসলিমরা কেন মুহাম্মদকে (সা.) শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নিয়েছিলো? তারা যদি তাঁকে নবী হিসেবে মেনে থাকে, তাহলে তো they were expected to be counted as Muslims. কিন্তু তারা তো মুসলিম ছিলো না। তাহলে তারা কেন তাঁকে মানলো? আর তারা যদি তাঁকে ধর্মীয় নেতা হিসেবে না মেনে জনপদের নেতা হিসেবে, অর্থাৎ আমরা পলিটিক্যাল লিডার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলতে যা বুঝাই সে হিসেবে তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে তো এটা এক ধরনের সেক্যুলার ফরম্যাটই হলো। যেমন, উনার ধর্মীয় বিধানগুলো উনার অনুসারীরাই শুধু মানবে। কিন্তু দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি বা সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু তিনি বলবেন, সেগুলো উনার অনুসারী কিংবা অনুসারী নয় এমন সবাই মানবে। তাহলে আমরা সেক্যুলার

ফরম্যাট বলতে এখন যা বুঝি, এটি তো তেমন ধরনেরই একটা ব্যাপার হলো। তাই নয় কি?

– চমৎকার একটি পয়েন্ট তুমি বলেছো। এটি নিয়ে আমি লিখেছি, যদিও এই পয়েন্টটিকে তেমন হাইলাইট করি নাই। আমার একটি পেপার সীরাত বিশ্বকোষে প্রকাশিত হয়েছে। বনু কাইনুকা গোত্র নিয়ে লিখতে গিয়ে সম্ভবত এই কথাটা আমি হাইলাইট করেছি। চবি ল জার্নালে প্রকাশিত আমার একটা গবেষণা প্রবন্ধেও মদীনা সনদ নিয়ে কিছু আলোচনা এনেছি।

– ওদেরকে যেহেতু বহিস্কার করা হয়েছে, তাই সনদের প্রসঙ্গ তো আসবেই। ওদেরকে বহিস্কার করা হয়েছে না?

– আমি যে বিষয়টা বলতে চেয়েছি সেটি হলো, আল্লাহর রাসূল (সা.) কোন প্রেক্ষাপটে মদীনায় আসলেন? আরো কোথায় কোথায় যেন লিখেছি, এখন ঠিক মনে নাই।

– আকাবার শপথে নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি যে, তাঁকে নিরাপত্তা দেয়া হবে, নেতা হিসেবে মানা হবে? Actually, he became leader before he migrated.

– কিন্তু সেটা কেন হয়েছে, সে কথাটাও আমি লিখেছি। এখন মুশকিল হলো, লেখা তো অনেকগুলো হয়েছে...।

– আমার ধারণা হলো, মদীনার ইহুদীরা বলতো— আমাদের নবী আসার সময় হয়েছে, তিনি এলে তখন আমরাই নেতৃত্ব দেবো। তখন পর্যন্ত তো তারা আউস-খাযরাজের আশ্রিত গোত্র ছিলো। তারপর মদীনার লোকেরা মক্কায় হজ্ব করতে গিয়ে যখন শুনলো, একজন নবুয়তের দাবি করছে; তখন তারা যাচাই করে দাবিকে সঠিক পেয়ে আগেভাবেই নবীর...।

– প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজস্ব স্বার্থ চিন্তা করেছে।

– এমনকি আব্বাস (রা.) নিজে মুসলমান হওয়ার আগেই তো কোনো একটি আকাবার শপথের রাতে অংশগ্রহণ করে বলেছিলেন— আমার ভাতিজাকে যে তোমরা নিতে চাচ্ছো, পুরো আরব কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তোমরা তাকে নিরাপত্তা দিতে পারবা কিনা।

– হ্যাঁ, তিনি এটা বলেছিলেন।

– তারমানে আমরা যেভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখি, ব্যাপারটা সে রকম ছিলো না।

– হ্যাঁ, সে রকম ছিলো না।

– কারণ, সেক্ষেত্রে আব্বাস কেন তাহলে মধ্যস্থতা করতে যাবেন?

– শুধু তাই নয়, উনার যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা (political sagacity) ছিলো সেটি হলো— এই যে আরবদের অর্থাৎ, মক্কার লোকদের শতভাগ আয়ের উৎস ছিলো ব্যবসাকেন্দ্রিক, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট। কী এক্সপোর্ট করতো? ওই যে পশু পালন, পশুর চামড়া, এটা, ওটা। আর ইমপোর্ট করতো কী? মক্কায় খেজুর গাছ খুব কম ছিলো। এখনো কম হয়। কিছু গম-টম হতো। বাইরে থেকে খাবার, গার্মেন্টস জাতীয় পণ্য, সমরাস্ত্র এগুলো তারা নিয়ে আসতো। এগুলো হলো তাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের পণ্য সামগ্রী।

যা হোক, ব্যবসার প্রতি তাদের এই শতভাগ নির্ভরতার কারণে পলিটিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে হিজরতের জন্য মদীনাকেই উপযুক্ত স্থান বলে তাঁর মনে হলো। তিনি চিন্তা করলেন, মদীনা ইচ্ছা করলে মক্কাকে কলাপ্স করে দিতে পারে। তৎকালীন সময়ে ‘রিহলাতাশ শিতা-ই ওয়াস সাইফ’ (শীত ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্য সফর) ছিলো ইয়েমেন, তায়েফ ও সিরিয়া তথা শামকেন্দ্রিক। আল্লাহর রাসূল (সা.) দুইবার শাম দেশে গিয়েছিলেন। আর শামে যাওয়ার বড় পথ হলো মদীনার পার্শ্বস্থ পথ। মদীনার এই পথ দিয়ে শামে যেতে হয়।

– হ্যাঁ, তিনি তো খাদীজা (রা.) কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা হিসেবে গিয়েছিলেন। সে হিসেবে ওই রুটগুলোর তাৎপর্য তাঁর জানা ছিলো।

– নিছক একজন ধর্মীয় হুজুর বা মাওলানা সাহেবকে দাওয়াত দিয়েছে, আর তিনি মদীনায় চলে গেছেন— ব্যাপারটা সে রকম ছিলো না।

– কিংবা, এখান থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন...।

– না, না, এ রকম ছিলো না। এটা একটা বিশাল প্ল্যান ছিলো। আর ইহুদীদের একটা মতলব ছিলো। মদীনায় তিনটা গ্রুপ ছিলো। একটা গ্রুপ তো মুসলমান হলো। আরেকটা গ্রুপ ছিলো, যারা ধর্মকর্ম মানতো না। ওই যে জাপানী বা অন্যদের মতো। এ রকম একটা গ্রুপ ছিলো। আরেকটা গ্রুপ ছিলো হানীফ ধর্মের অনুসারী। দ্বীনে হানীফের অনুসারী। এদের মধ্য থেকেই বিশাল একটা সংখ্যা মুসলমান হয়ে গেলো। আর কিছু ইহুদী ছিলো। ইহুদীদের দুই/তিনটা মতলব ছিলো।

একটা হলো: নবী এবং রাসূল যে আসছেন, তাঁকে যদি আমরা আগে থেকেই ক্যাপচার করতে পারি, তাহলে তা আমাদের জন্য লাভজনক হবে।

দুই নম্বর লাভ হলো: নবী যেখানে যায়, সেখানে একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তাতে আমাদের ব্যবসায়িক প্রফিট হবে। এরা তো ব্যবসায়ী জাতি।

– মানে, নবী আমাদের হলে আমরাই সবকিছু হবো?

– আমাদের দেশে গ্রামে একটা মাহফিলেও আমরা সেটা দেখি তো। যেখানে মাহফিল হয়, সেখানে বুটওয়ালা, বাদামওয়ালা এসে হাজির। যেখানে মানুষ যাবে, সেখানে ব্যবসা জমবে। অতএব, নবীকে কেন্দ্র করে একটি নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠবে, এতে করে তাদের বিজনেস বাড়বে।

তিন নম্বর ব্যাপার হলো: আউস-খাযরাজের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে তারা চিন্তা করলো, দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য তিনি শান্তির বাণী নিয়ে আসছেন, এই শান্তি আমাদের দরকার, যুদ্ধ করতে আমরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি। এই তিনটা টার্গেট ছিলো তাদের।

– আউস–খাযরাজের মধ্যে কি ফরমাল কোনো যুদ্ধ চলছিলো?

– যথেষ্ট, দীর্ঘদিন। এবং এটা থামানোর জন্যও কোনো মধ্যস্ততা...।

– ওরাই তো নেটিভ ছিলো। আচ্ছা, ওরা...।

– এবং এদেরকে আবার তাল দিতো ইহুদীরা।

– আচ্ছা, ইহুদীদের তো তিনটি গোত্র: বনু কাইনুকা, বনু নজীর এবং...?

– বনু কোরাইযা। এই তিনটা হলো বড় গোত্র।

– তারমানে, আরো ছোট গোত্র ছিলো?

– ছোট গোত্রের নাম তুমি ইয়ের মধ্যে দেখতে পাবা। মদীনা সনদে তো ১০/১২টা গোত্রের নাম আছে।

– আচ্ছা, সেখানে তাহলে নাম উল্লেখ করা আছে?

– সবগুলো আছে। কিন্তু মদীনা সনদে বনু কাইনুকা, বনু কোরাইযা ও বনু নজীরের নাম কিন্তু নাই। এটা খুবই সিগনিফিকেন্ট। অথচ এই তিন গোত্র ছিলো সবচেয়ে বড় গোত্র।

– কিন্তু এর কারণ তো বোধহয় এটাই যে এই তিনটা গোত্র আউস ও খাযরাজের আশ্রিত ছিলো।

– মানে হালিফ। হালিফ মানে হলো ওদের সাথে এটাচড।

– হ্যাঁ, নিরাপত্তা চুক্তি। চুক্তিতে বলা আছে, এরা হলো একটি পক্ষ এবং এদের অধীনে যারা আছে, তারাও এদের মধ্যে ইনক্লুডেড হবে।

– সে কথাই বলছি। এত বড় গোত্র হওয়া সত্ত্বেও ওদের নাম কিন্তু ওখানে নেই। কেন নাই? যেহেতু তারা ছিলো হালিফ। হালিফ মানে হলো হেল্প করার চুক্তিতে...।

– মানে মিত্রচুক্তির অধীনে...।

– ইংরেজি help শব্দটি কিন্তু আরবী হালিফ শব্দ থেকে এসেছে। হেল্প মানে কী? আমি তোমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।

– আচ্ছা, এখানে আরেকটা ব্যাপার খুব সিগনিফিকেন্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে যে আউস-খাযরাজের লোকেরা রাজা বানানোর জন্য প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছিলো, মুকুট বানিয়েছিলো, বা এ রকম কিছু একটার বর্ণনা আমরা পাই। প্রথমে এটি অথেন্টিক কিনা, সেটি বলবেন। যদি অথেন্টিক হয়ে থাকে, একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তো আপনার পড়াশোনা আছে, সমগ্র আরবের কোথাও তো কিংশিপ ছিলো না। রোমান বা পারস্য সাম্রাজ্যের মতো আরব অঞ্চলে তো কোনো রাজা-বাদশা ছিলো না। আরবে ছিলো গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

– শেখ ছিলো আরকি। গোত্রের শেখ বা গোত্রপ্রধান।

– গোত্রের আইডেন্টিটিই হচ্ছে সেখানকার হাইয়েস্ট পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি। এটা থেকে তারা আরেকটা ফেজে যেতে চাইলে তো তা কিংশিপে যাওয়ার কথা। এবং রাসূল (সা.) সেখানে গিয়ে এই কিংশিপ বাদ দিয়ে একটা উম্মাহ সিস্টেম স্টাবলিশ করলেন। কিংশিপও কিন্তু গোত্রপ্রথা নয়, উম্মাহও গোত্রপ্রথা নয়।

– উম্মাহর তো অনেকগুলো অর্থ আছে।

– হ্যাঁ, মদীনা সনদের মধ্যে প্রথমদিকে উম্মাহ যেভাবে আছে, তাতে এটি একটি...।

– বহুজাতিক রাষ্ট্রের মতো।

– বহুজাতিক রাষ্ট্র। আর মুসলিম উম্মাহ বা ধর্মীয় উম্মাহ বলতে আমরা যেটি বুঝি, সেটি তো আলাদা জিনিস। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এই ঘটনাটা কি সঠিক?

– ইবনে হিশাম তো এভাবেই লিখেছেন।

– *এটা আবার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা হয়েছে কিনা? সীরাতে তো অনেক কিছু এক্সাজারেটেড হয়েছে।*

– ইবনে হিশাম লিখেছেন, তাকে রাজা করে মুকুট বানানো...। রাজত্ব সিস্টেমের পরিবর্তে বরং তিনটা গোত্রের সমন্বিত লিডার হিসেবে আমরা এটাকে মূল্যায়ন করতে পারি। রাজতন্ত্রের ধারণা আলাদা ব্যাপার।

– *তিনটা মানে কী? দুইটা না?*

– আউস এবং খাযরাজ। এর সাথে ইহুদীরা যুক্ত হয়েছে।

– *কিন্তু ইহুদীদের কোনো গোত্র তো আউসের সাথে, কোনোটা খাযরাজের সাথে– এভাবে ভাগাভাগি করে ছিলো।*

– কারণ হলো, ইহুদীরা এখানকার আদি অধিবাসী নয়। বাইরে থেকে আসার কারণে এই লোকগুলো আরবের নিয়ম অনুযায়ী কারো না কারো সাথে এটাচড থাকতে হবে। এদেরকে দুইভাবে এটাচড করা হয়েছে। কাউকে মাওয়ালী, কাউকে হালিফ। মাওয়ালীরা নন-আরব। বাইরে থেকে এসে কারো সাথে এটাচড হয়েছে। মাওয়ালী শব্দটা কোরআনে আছে।

– *তাহলে মাওয়ালীর রুট হচ্ছে মাওলা।*

– হ্যাঁ। মাওলা শব্দের অনেকগুলো অর্থ। এর মধ্যে একটা অর্থ হলো আশ্রিত।

– *মাওলার অর্থ আশ্রিত, নাকি আশ্রয়দাতা?*

– আশ্রয়দাতা, চাচাতো ভাই, মুনিব, লিডার। মাওলার অনেকগুলো অর্থ। আমাদের দেশে মৌলভী, মাওলানা শব্দগুলোও মাওলা শব্দের সাথে রিলেটেড।

– *তাহলে মাওয়ালীর অর্থ কী হবে?*

– মাওয়ালীর অর্থ এখানে আশ্রিত। মাওলা শব্দের ১২টি অর্থ আছে। এমনকি চাচাতো ভাইও এর একটি অর্থ। আরবীতে আছে, ‘সারাহা মিম মাওলায়ী আফালা আসতাসিরুহা’, এই কথাটা আমার চাচাতো ভাই থেকে এসেছে। এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। এটি আউফ ইবনুল আহওয়াসের কবিতা থেকে উদ্ধৃত।

– *তাহলে মদীনার আর্লি পিরিয়ডটা আমার কাছে মনে হয় খুব বেশি সিগনিফিকেন্ট।*

– তুমি আকরাম জিয়া আল উমরীর লেখা ‘রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ’ পড়োনি?

– হ্যাঁ, পড়েছি।

– এটা কিন্তু বেশ ভালো বই। দুই খণ্ডে লেখা।

– আমি বলতে চাচ্ছিলাম, রাসূল (সা.) গিয়ে যে ওখানে...।

– আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা বই দেই। খুঁজে দেখি পাই কিনা। ‘রাসূলের যুগে মদীনার সমাজ’ নামে আরেকটা বই লিখেছেন আ. ফ. ম. খালেদ হোসেন। বইটির ভূমিকা লিখেছি আমি।

– আচ্ছা, আমার আলাপটা শেষ করে নিই। কারণ, আমার কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। বিশেষ করে আমরা যারা ইসলামী আন্দোলন করি, সিস্টেমেটিক ও সাসটেইনেবল ওয়েতে সমাজে ইসলাম কায়েম করতে চাই, মহানবী (সা.) কীভাবে এই কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন সেই স্টাডিটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাধারণত মনে করি, মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়েই তিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে ফেলেছিলেন। কুবা পল্লীতে দু’তিন দিন থেকে সেখান হতে শুক্রবার মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথিমধ্যে, বর্তমানে ‘মসজিদে জুমা’ হিসেবে পরিচিত স্থানে প্রথমবারের মতো যোহরের পরিবর্তে জুমার নামায আদায় করেছিলেন। কিন্তু...

– ইসলামী রাষ্ট্র তখনো ছিলো না। বরং ইসলাম ডমিনেটেড একটা রাষ্ট্র ছিলো। এর মানে হলো, সবকিছু রাসূল (সা.) ফয়সালা করবেন, যুদ্ধ লাগলে এটা করতে হবে, মদীনাকে রক্ষা করতে হবে, তাঁর সিদ্ধান্তকে অন্যদের মেনে নিতে হবে। এইসব ব্যাপারে তাঁর ডমিন্যান্সি ছিলো। কিন্তু এটা তো তখনকার সময়েও অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরী সনে যখন মদীনা সনদ হয়। এই সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে যে কাজগুলো আল্লাহর রাসূল (সা.) করেছেন, এর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আমি লিখেছি, আমার লেখায় তুমি দেখেছো। এবং হযরত আনাসের (সা.) বাড়িতে এই চুক্তিটা হয়েছিলো। এবং এই চুক্তিটা সবাই মেনে নিয়েছিলো। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, তখনকার সময়ে ইহুদী, আরব, বনু নজীর, বনু কাইনুকাসহ যারা আছে, সবগুলোকে এই চুক্তির আওতায় নিয়ে এসে মদীনাকে বহুজাতিক একটি রাষ্ট্রের ধারণা দেয়া হয়েছে। এটাকে একেবারে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে না।

– তাহলে আরেকটা জিনিস একটু ইয়ে হচ্ছে না? মদীনা সনদ তো এক সিটিংয়ে

বসে কমপ্লিটলি লেখা হয় নাই। এটা কাইন্ড অব কম্পাইলেশন না?

– কিছু কিছু জিনিস এ রকম হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তৎকালীন সময়ে ছিলো লেখক ও লেখার উপকরণের স্বল্পতা। এগুলোসহ নানা কারণে সবগুলো একসাথে লিখিতভাবে পাওয়া যায় না।

– কাব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পর নতুন করে তাদের সাথে আবার একটি চুক্তি হলো। সেটিও মদীনা সনদে অন্তর্ভুক্ত হলো। অথচ এই চুক্তিটি হয়েছে পরে। তারপর আকাবা শপথের এগ্রিমেন্টগুলোর কিছু কিছুও তো মদীনা সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

– যে কোনো সনদ যদি পড়তে যাও, সনদ মানে Memorandum of Understanding (MOU)। সেইসব সমঝোতা চুক্তি বা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের একটা ধারাবাহিকতা থাকতে হয়। হঠাৎ করে...। কারণ, তুমি যে এখানে বসবা, অ্যাডমিশন নিয়েছো ঠিক আছে, তার জন্য ফরম পূরণ করতে হয়েছে, এক কথায় একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াটাও কিন্তু একটা অংশ।

– তাহলে আপনি যে বললেন, আনাস ইবনে মালিকের (রা.) ঘরে চুক্তিটা হয়। তিনি তো মুহাজির ছিলেন।

– না, তিনি মুহাজির নন। তিনি তো আল্লাহর রাসূলের (সা.) খাদেম ছিলেন।

– তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাননি?

– না, তিনি আনসার।

– আচ্ছা। যা হোক, রাসূল (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর জুমার নামায চালু করলেন। আমরা যে ইসলামী রাষ্ট্রের একটা চিন্তা করি, যেখানে ঈদ আছে, জুমা আছে, নামায আছে, রোযা আছে, মানে যা যা ইত্যাদি আছে। তো, এই আর্লি পিরিয়ডে, আবার মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে, আমরা যদি দশ বছরকে তিন ভাগে ভাগ করি, তাহলে তিন ভাগের চেহারা তো তিন রকম।

– তিন ভাগ নয়, প্রতি বছরকে তুমি একটা ভাগ ধরতে পারো। একসাথে তিনটা পিরিয়ডে সব হয়ে গেছে, তা নয়। ওই যে তুমি বলেছিলে কন্টিনিউশন, এটা হলো কন্টিনিউশন। তুমি যদি আজকেও ইসলামী রাষ্ট্র করতে চাও, সেক্ষেত্রে ওই যে সুন্নাহ অব গ্র্যাজুয়ালিটির কথা বলেছি, ওই পন্থায় যেতে হবে। এক দিনে সব পারবা না।

– তাহলে গ্র্যাজুয়ালিটির কথাটা একটু বলে ফেলি। এ প্রসঙ্গে আপনি তো মুহাম্মদ আল গাযালির একটি বই ‘কাইফা নাতা’য়ামালু মায়াল কোরআন ওয়া কাইফা নাতা’য়ামালু মায়াসসুন্নাহ’ শিরোনামে একটা বইয়ের কথা বলেন। এখন কথা হলো, গ্র্যাজুয়ালিটির এই কনসেপ্টটা তো খুব চমৎকার। কিন্তু যখন এর ইমপ্লিকেশনের প্রশ্ন আসে, তখন আমরা খুব হ্যাসিটেন্ট হয়ে পড়ি। আমি আপনাকে বাস্তবতাটা বলি। বাস্তবতা হলো আমরা এমন একটা সমাজে বসবাস করি, যেখানে ইসলাম যতটুকু প্রতিষ্ঠিত আছে, তারচেয়ে এটার প্রতি এক ধরনের হাইপ তথা প্রবল ভালোবাসা, এক ধরনের উন্মাদনা বা এক ধরনের অতি আবেগ, অথবা এ ধরনের ইউটোপিয়া আমাদের মধ্যে কাজ করে। কিন্তু যখনই আমরা ‘তাদাররুজ’ তথা ক্রমধারার কথা বলবো, তখন দেখা যাবে যে ইসলামিক্যালি...।

– তখনই তোমাকে ইন্টালেকচুয়ালিটির দিকে যেতে হবে। হাইপের কথা যে বলেছো, এর মধ্যে আর থাকা যাবে না।

– কিন্তু এটা তো আবার পাবলিক পারসেপশনের সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে।

– না, কন্ট্রাডিক্ট করে না। সেটা এই জন্য ...

– পাবলিক মনে করে, কোরআন-হাদীস, অর্থাৎ যা কিছু নাযিল হওয়ার তা তো হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের উপর সম্পূর্ণ ফরয হয়ে গেছে। সুতরাং, আমরা এখানে কোনো তাদাররুজ করতে পারবো না।

– না, ঠিকই আছে। আমাদের উপর সম্পূর্ণ ফরয হয়েছে ঠিকই। কোরআন যদি সম্পূর্ণ ফরয হয়ে যায়, তাহলে এই মুহূর্তে একটা লোক ইসলাম কবুল করলে তার উপর সালাত ফরয হয়ে যাবে। সালাত ফরয হয়ে গেলে সালাতের জন্য কেরাত পড়া, রুকু করা, সেজদা করা, আত্তা হিয়্যাতু পড়া— সবগুলো ফরয, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হয়ে যায়। লোকটি কি এগুলো শিখে তারপর ইসলাম কবুল করবে? কেউ কি একেবারে সবকিছু শিখে তারপর ইসলাম কবুল করবে?

– না, এটা তো কমনসেন্স থেকেই বুঝা যায়। এটা উচিতও নয়। বরং কনসেপ্টটাকে নিয়েই সে ইসলাম গ্রহণ করবে। ঈমান নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে। তারপর ধীরে ধীরে বাকি জিনিসগুলো জানবে।

– তাহলে তোমাকে তাদাররুজে যেতেই হবে।

– এটা তো একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু একটা সমাজের ক্ষেত্রে আপনি...।

– সমাজের ক্ষেত্রেও সেইম ব্যাপার হবে। ধরো, আজকে হঠাৎ আমেরিকা নিজেদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দিলো। তো, এই ইসলামী রাষ্ট্রে আমাদের একজন আল্লাহর বান্দা গেলেন, যাওয়ার পর তার কোনো সুযোগ আসলো, ফলে তিনি আমেরিকাকে মদীনা সনদের আলোকে করে ফেললেন। তাহলে অ্যাট অ্যা টাইম কি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব? কারণ সমাজ চলে তাদাররুজের পন্থায়। হঠাৎ করে সমাজের র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ হয় না।

– তাছাড়া সোশ্যাল সাইকোলজিরও ব্যাপার আছে। রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তো হলো বাইরের দিক। আমরা যাকে বলি হেড অব দ্যা আইসবার্গ। ভেতরে হলো এর কনসেপ্টটা। তো, সমাজের যে প্রচলিত ধ্যানধারণা, সেগুলোর পরিবর্তন না করে শুধু আইনকানুন পরিবর্তন করাটা তো টেকসই হবে না।

– সাসটেইনেবল হবে না। অতএব, তোমাকে ওই তাদাররুজে যেতে হবে। এই যে ইসলামী ব্যাংক, তারা এখনো ইসলামী ব্যাংক করতে পারে নাই। আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, অন্যান্য ব্যাংকসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে প্রতিদিন যে লেনদেন হয়, সেখান থেকে যে সুদ আসে, সেগুলো তোমরা কী করো? তারা বললো, আমরা এগুলোকে সন্দেহজনক হিসাবে আলাদা করে রাখি। সেগুলো আমরা ব্যাংকের ফাউন্ডেশনে দিয়ে দেই জনস্বার্থে। এগুলো আমরা মূলধনে আনি না। কারণ, তাতে এগুলো সুদ হয়ে যাবে।

যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো, সমাজ পরিবর্তন করতে হলে সমাজ পরিবর্তনের যে অনুষঙ্গগুলো, সেগুলোকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে হবে। এ বিষয়ে ইবনে খালদুনসহ অন্যরাও বিস্তারিত বলেছেন। রাতারাতি তো টেকসই সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। মদ ও সুদ নিষিদ্ধকরণের ধারাবাহিকতা হতেও এটি আমরা বুঝতে পারি।

ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়নে ক্রমধারা অবলম্বনের অন্যতম শক্তিশালী দলীল ও এর পদ্ধতি নিয়ে মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ:

> হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুয়াজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেনে (শাসক নিযুক্ত করে) প্রেরণের সময়ে বললেন, তুমি অবিলম্বে আহলে কিতাবদের মধ্যে যাবে। যখন তুমি তাদের মধ্যে পৌঁছবে তখন তাদেরকে ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল’— এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহ্বান

করবে। তারা এটি মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে অবগত করবে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা ধনীদের নিকট হতে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। যদি তারা এটাও মেনে নেয়, তবে তাদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। আর মজলুমের অভিশাপকে ভয় করবে। তার অভিশাপ ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নাই।

[আবু মূসা আশয়ারী (রা.) ও মুয়াজ ইবনে জাবালকে (রা.) ইয়েমেনে প্রেরণ, কিতাবুল মানাবিক, সহীহ বুখারী]

– একদিনে সম্ভব নয় বুঝলাম, শরীয়াহ বাস্তবায়নে ক্রমধারা অবলম্বন অপরিহার্য, এটি অনস্বীকার্য। কিন্তু, ধারাবাহিকতার টাইমফ্রেম কী হবে? এক একটা পর্যায় কি হতে পারে তিন মাস, তিন বছর, অথবা তিরিশ বছর? কিংবা এরচেয়েও বেশি? এটা তো একটা...।

– এটা হলো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কোনোটাই তুমি একদিনে বা নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করে দিয়ে পারবা না। তাওহীদ বিশ্বাসকে অবিলম্বে ও অখণ্ডভাবে গ্রহণ করতে হয়। ইবাদতের বিষয়গুলোকে মানতে হয় যথাশীঘ্র। কিন্তু মুয়ামালাতের বিষয়গুলো বাস্তবায়নের বিষয়টি ভিন্নতর। মোট কথা হলো, একজন মুসলমান সবকিছু করবে তাওহীদকে কেন্দ্রে রেখে। যেমন, এই মুহূর্ত থেকে আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে, তওহীদবিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না।

– এটা তো শুধু মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা যখন সমাজের কথা বলবো, সমাজের সবাই তো তাওহীদপন্থী নয়।

– তোমার উপর নামায ওয়াজিব। তোমাকে এখন থেকে একেবারে তারতীব সহকারে রেগুলার নামায পড়তে হবে— এমনটির জন্য সময় দিতে হবে। কোরআন তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে। এটার জন্য তোমাকে, কথার কথা, ছয় মাস সময় দিতে হবে। অর্থাৎ, যেটা যতদিন লাগে ততদিন দিতে হবে।

– আমরা যেমন দুই-চার-পাঁচ বছর বা সাত থেকে দশ বছর চিন্তা করি, তখন মনে হয় যেন এটা খুবই প্লজিবল বা সম্ভবপর। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থাপনাগুলো এমন, ওই যে জামায়াতে ইসলামীর তিন মাসের দাওয়াতী টার্গেটের মতো। এ রকম পাঁচ বছর বা দশ বছরে কি সমাজ পরিবর্তন সম্ভব? বর্তমান যে সমাজব্যবস্থা...।

– এটা তো কন্টিনিউশন। এটি একদিনেও সম্ভব নয়, দশদিনেও সম্ভব নয়। এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো আজীবনেও সম্ভব নয়। এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো চলতেই থাকবে। কারণ...।

– সেক্ষেত্রে আলেম-ওলামা বা ইয়ংদের মধ্যে যারা কোরআন-হাদীস কিছুটা পড়ে এক ধরনের ফ্যাসিনেশনের মধ্যে আছে, তারা তো বলবে— না, এটি তো পুরাটাই নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সবই ফরয করেছেন।

তাহলে মদীনায় যিনি আজকেই মুসলমান হয়েছেন, তার জন্য গ্র্যাজুয়ালিটি কী? তাকে তো আজকে মুসলমান হওয়ার পর...। প্রত্যেককেই তো সমাজে যা কিছু আছে তার সবকিছুই করতে হয়...।

– গ্র্যাজুয়ালিটি হলো— যেমন, ইসলাম নামায ফরয করেছে। তাহলে নামাযের জন্য কেরাতও ফরয। কেরাত কী সে শিখেছে? না। তাহলে তার জন্য গ্র্যাজুয়ালিটি হলো সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে নামাযের বিধানগুলো শিখে নেয়া। বুঝাতে পেরেছি? যদি একদিনেই ফরয হতো, সেক্ষেত্রে একটা দলীলই তোমার জন্য যথেষ্ট— রাসূলের (সা.) উপর যে বছর হজ্ব ফরয হয়েছে, সে বছর কি তিনি তা করেছেন?

– তিনি তো জীবনে একবারই হজ্ব করেছেন, সেটা দশম হিজরীতে।

– তিনি কি সেই বছরই হজ্ব করেছেন?

– মক্কা বিজয় হয়েছিলো অষ্টম হিজরীতে।

– হজ্ব ফরয হয় নবম হিজরীতে। সে বছর কি তিনি হজ্ব করেছেন? করেননি। অথচ, তাঁর উপর যত বিধান নাযিল হয়েছে, হজ্ব ব্যতীত অন্য সব বিধান তিনি সর্বাগ্রে তামিল বা আমল করেছেন। তাহলে ফরয হলেই যে করতে হবে, ব্যাপারটা এমন নয়। কেন করেননি? আমার গবেষণায় যেটা ধরা পড়েছে, এটা কিতাবী কথা নয়, সেটি হলো— সে বছর যদি আল্লাহর রাসূল (সা.) হজ্ব করতেন, তাহলে আজ পর্যন্ত অমুসলিমদেরকে মক্কা থেকে হঠানো কঠিন হয়ে যেতো। এটা একটা সুন্নাহ হয়ে যেতো যে আল্লাহর রাসূল (সা.) এলাউ করেছেন যে হজ্বের সময় অমুসলিমরা ন্যাংটা হয়ে তাওয়াফ করবে, আর মুসলমানরা এভাবে করবে।

– মিক্সড হজ্ব?

– হ্যাঁ, মিক্সড হজ। এবং আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) এই জন্য এক বছর অপেক্ষা করেছেন। তারপর কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। তারপর

তিনি সে বছরের আমীরে হজ্ব আবু বকরের (রা.) কাছে নতুন ওহীর খবর পৌঁছানোর জন্য হযরত আলীকে (রা.) পাঠালেন। আবু বকর (রা.) তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন— তুমি যে এসেছো, এখন আমি কি তোমার আনুগত্য করবো, নাকি তুমি আমার আনুগত্য করবে? তুমি কি আমীর হিসেবে এসেছো, নাকি ফলোয়ার হিসেবে এসেছো?

– তিনি তো ফলোয়ার হিসেবেই গিয়েছিলেন।

– না, অত লম্বা ইতিহাস এখানে বলছি না। তিনি যে ওহীর খবর নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে একটা আয়াত ছিলো— "ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন"... (মুশরিকরা তো অপবিত্র, এই বছরের পর তারা যেন আর না আসে)। তারা এটি মানতে বাধ্য ছিলো। কারণ, মক্কা মুসলমানদের অধীন হলেও সেখানে তখনো অনেক মুশরিক ছিলো। মক্কা বিজয় অলরেডি হয়ে গেছে আগের বছর। আগের বছর বিজয় হওয়া সত্ত্বেও পরের বছর এদেরকে আসতে নিষেধ করা হয় নাই, বারণ করা হয় নাই। ইচ্ছা করলে সেইবারই বলে দিতে পারতো— কেউ আসতে পারবে না, যাও। কিন্তু করেন নাই। ওই যে গ্র্যাজুয়ালি করেছেন, সে জন্য। কারণ, তখন বাধা দিলে কাবার চত্বরে একটা হাঙ্গামা হয়ে যেতো, একটা মারামারি হয়ে যেতো।

– কারণ, তখন পর্যন্ত আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার ছিলো না। এখন হাওয়া-বাতাস কোনদিকে, কাদের এখন নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, এটি আগে প্রতিষ্ঠিত হোক।

– এরপরে যখন রাসূল (সা.) গেলেন, যাওয়ার পর হজ্ব কমপ্লিট হলো, তারপর কোরআনের আয়াত সবাইকে পড়ে শোনালেন— হে মানুষেরা! তোমরা হজ্ব করেছো, যারা যেখান থেকে এসেছো তোমাদের নিয়ম অনুযায়ী...

– এমনিতে হজ্বে আরাফাতের যে ভাষণ, এটিই তো হজ্বের ফরম্যাট। তাহলে হযরত আলী (রা.) কি এ ধরনের ইনবিল্টইন কোনো ধরনের একটা জমায়েত করে... তিনি যে বলেছেন...।

– তিনি বলেননি। তিনি এই ম্যাসেজটা হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। লিডারের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এবং লিডার সবার মধ্যে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

ইসলামী চিন্তার সংস্কারঃ কোথায়, কেন ও কীভাবে?

মোঃ আব্দুল মান্নান

ইসলামের ব্যাপারে যখন ‘সংস্কার’ শব্দটি উচ্চারিত হয়, তখন নিষ্ঠাবান মুসলমানরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এর কারণ তিনটি: (১] ইসলামের সংস্কার বলতে ইসলামের আমূল পরিবর্তন বলে মনে করা; (২] মনে হতে পারে যে সংস্কারপন্থীরা আসলে পশ্চিমা চিন্তা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন (অনৈসলামী) উপাদান ইসলামের মধ্যে সংযোজন করতে চান; (৩] আল্লাহ প্রদত্ত সার্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ জীবনবিধান ইসলামের ব্যাপারে ‘সংস্কার’ কথাটি স্ববিরোধী। এই ধরনের উদ্বেগের ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে দৃশ্যত সংস্কারবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

সংস্কার কোথায় ও কেন?

সংস্কারবাদীরা যেসব বিষয়ে কথা বলছেন সেসবের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায়, উপর্যুক্ত উদ্বেগগুলোর কোনোটিই সংস্কারের কুফল নয়। বরং কথিত সংস্কারবাদীগণ এমন কিছু জায়গায় সংস্কারের কথা বলছেন যা উপর্যুক্ত ঈমানী চেতনার সাথে শুধু সংগতিপূর্ণই নয়, বরং অনুরূপ সংস্কারকার্য এহেন চেতনার জন্য অপরিহার্য দাবি।

অধ্যাপক তারিক রমাদানের বিখ্যাত বই ‘Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation’-এর ভূমিকার উপর ২০১৩ সালের ২৮ নভেম্বর সিএসসিএস-এর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়স্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান এই প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন।

এ ক্ষেত্রে 'বৃষ্টি ও ছাতা'র উদাহরণটি বিবেচ্য। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মাথার উপর ছাতা ধরা হয়। কোনো সময় বৃষ্টির পানি যদি খাড়াভাবে না পড়ে তীর্যকভাবে পড়ে, আর তখনও যদি ছাতাটি বৃষ্টির অবস্থা বুঝে হেলিয়ে না ধরে মাথার উপর খাড়াভাবেই ধরে রাখা হয়, তাহলে ছাতা ব্যবহারের উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হবে। বৃষ্টির অবস্থা বুঝে ছাতার এই দিক পরিবর্তনের সাথে ছাতার নিজস্ব গঠন-প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন হয় না।

ইসলামের নয়, ইসলাম ও জগৎ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মুসলিম মানসের পরিবর্তন

সংস্কার প্রস্তাবনামাত্রই ইসলামের চিরন্তন কাঠামোর সংস্কার নয়; বরং ইসলামের প্রকৃত রূপ অনুধাবন করে মানবজীবনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামের অধিকতর উপযোগিতা প্রমাণ করার জন্য মুসলিম মানসের পরিবর্তন। মুসলমানদের চিন্তার মধ্যে এক পদ্ধতিগত পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয় এই সংস্কারের মাধ্যমে। কোরআন-সুন্নাহর চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধানে কোনো প্রকার কুসংস্কার (prejudice) ও স্থবিরতা (stagnancy) যেন ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার পথে বাধার কারণ হতে না পারে। যে নদীর স্রোত সতত প্রবহমান, সে স্রোত যেন থেমে না যায়।

ইসলাম হলো জীবন সমস্যার সমাধান। জীবন এগিয়ে চলছে। জীবনের সমস্যাগুলোও ক্রমে রূপান্তরিত হচ্ছে। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামকে জাগতিক যোগ্যতা ও প্রশ্নাতীত সক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। চিরন্তন ইসলামের যুগোপযোগী প্রয়োগ উপস্থাপন করার দায়িত্ব এর অনুসারীদের উপরই বর্তায়।

খেলাফতের দায়িত্ব কেবল বিধিবদ্ধ ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের নানা দিক ও বিভাগ খোদা অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। তাই আল্লাহর পছন্দের এক মানব সভ্যতা গড়ে তোলাও খেলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মার্থ এ দায়িত্বের কথাই বলে। যেমন: জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়া, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এটাও মনে রাখতে হবে, কাউকে গোমরাহ বলে দূরে সরিয়ে দিলে, কেবল নিজের লোক ও পরিবেশের মাঝে বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখলে, যে কারো চিন্তা সংকুচিত হয়ে আসবে। এর বিপরীতে যখন মনে করা হয়, ইসলাম নিয়ে ঐ 'গোমরাহ' লোকদের কাছেও যেতে হবে, কেবল তখনই সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এক প্রাণান্তকর চেষ্টা চালু হবে— কীভাবে

সেই বিভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছা যায়। ফলে তাকে বুঝার জন্য, তার জগতে প্রবেশ করার জন্য, তাকে জয় করার জন্য দাওয়াত দানকারী ও সংশোধন প্রচেষ্টায় নিয়োজিতদের চিন্তায় নমনীয়তা ও বিকল্প চিন্তা আসতে থাকবে। এটি হলো innovative thought।

ইসলাম ও ইসলামী চিন্তা যখন কতক আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং জীবনের বৃহত্তর অংশে যখন ইসলামের বলার কিছু নাই মনে করা হয়, তখন সহজেই বুঝা যায় যে মুসলিম মানসের কোথায় সংস্কার প্রয়োজন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের আলো ফেলার ক্ষেত্রে যে মন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার সংস্কার জরুরি। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী বলেন, 'প্রবাহমান স্রোতস্বিনী নিস্তব্ধ উপত্যকায় হঠাৎ গতিরুদ্ধ হয়ে যেন ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হয়ে গেলো।' এই অচলায়তন ও স্থবিরতাকে প্রগতির স্রোতে পরিণত করাই ইসলাম প্রসঙ্গে চলমান ও সম্ভাব্য সংস্কারের লক্ষ্য।

স্পষ্টতই এ ধরনের সংস্কারকে ইসলামের সংস্কার না বলে মুসলিম চিন্তা ও মননের সংস্কার বলাই শ্রেয়। কারণ, ইসলাম বা যে কোনো মতাদর্শের অনুসারীদের চিন্তা ও চরিত্রের মধ্যে বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। যেমন একজন মার্ক্সবাদীর চিন্তা কার্ল মার্ক্স থেকে ভিন্ন (চিন্তার পরবর্তী বিবর্তনের কারণে) হওয়া সত্ত্বেও তার চিন্তাকে মার্ক্সবাদী চিন্তাই বলা হয়। তেমনিভাবে ইসলাম হলো তাই যা এর অনুসারী তথা মুসলমানরা তুলে ধরে (portrait)। কাগজের পৃষ্ঠার কালো অক্ষরগুলো তো আর কথা বলে না, কথা বলে মানুষ। বস্তু থেকে বস্তুর রং যৌক্তিকভাবে আলাদা করে চিন্তা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে আলাদা করা যায় না। তেমনই সম্পর্ক ইসলাম ও মুসলিমচিন্তার মধ্যে।

মনে করুন, কোনো ঈমানদারকে বর্তমান সময়ে ইসলামসম্মত জীবনের রূপ কেমন হবে মর্মে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বুঝালেন, এটি হবে P1। আরেকজন ঈমানদারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, P2 হবে। আমরা ধরে নিচ্ছি, এ দুজনই কোরআন-সুন্নাহর টেক্সট থেকে জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের জবাব একই লাইনের অর্থাৎ P কাঠামোর মধ্যকার হলেও এতদুভয়ের গুণগত পার্থক্য লক্ষণীয়। এ পার্থক্য কোরআন-সুন্নাহর পার্থক্য নয়। বরং পাঠকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারণেই একই উৎস অনুসরণ করা সত্ত্বেও জবাব ভিন্ন হয়েছে। একই কোরআন-হাদীস পড়ে কোনো কোনো আলেম বলেছিলেন, রাজনীতি হারাম। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছিলেন, এটি ফরয। এক সময় ওলামাগণ মনে করতেন, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ। আবার শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তার

প্রভাবে এখনকার ওলামাগণ মনে করেন, ইজতিহাদের দরজা খোলা। এভাবে সুফীবাদ ও সুফীবাদবিরোধী কথাও আমরা এই প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে পারি।

জবাব নয়, প্রশ্নই প্রথমত জরুরি

যা হোক, কোরআন ও সুন্নাহর মতো প্রত্যাদিষ্ট (revealed) টেক্সটসমূহ সীমিত অক্ষরের মাঝে সীমাহীন ভাব, জ্ঞানের বহুমাত্রা এবং চেতনার অসীম শক্তি ধারণ করে থাকে। পাঠক তার সামর্থ্য ও জীবনবোধ অনুসারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশিকা ঐ পাঠ্য থেকে গ্রহণ করে থাকে। মানুষের জীবনবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোরআন-সুন্নাহ থেকে আহরিত জ্ঞানও ভিন্ন রকম হয়। জীবন সম্বন্ধে সব মানুষের জিজ্ঞাস্য বিষয় এক রকম নয়। তাই জীবন সম্বন্ধে সঠিক প্রশ্ন উপলব্ধি করাটাই সবচেয়ে বড় জ্ঞান। হাজারো পরিবর্তনের মাঝে কোনটি সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু তা অনুধাবন করতে আমাদের গবেষণা যেন কোনো কিছুর দ্বারাই সীমাবদ্ধ হয়ে না যায়।

এ প্রসঙ্গে ড. তারিক রমাদান বলেন, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে 'আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যথার্থ জিজ্ঞাস্য বিষয় কোনটি'। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন প্রশ্নটি আগে চিন্তা করতে হবে তা অনুধাবন করাটা কেবল নিরলস বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। এভাবে সমস্যার কেন্দ্র চিহ্নিত করতে না পারলে এর সমাধানও ফলপ্রসূ হবে না। ব্যক্তি যে ধরনের প্রশ্ন নিয়ে অগ্রসর হবে, কোরআন তাঁকে সে প্রশ্নেরই জবাব সরবরাহ করবে।

গানের সুরের যেমন শেষ নাই, তেমনি জীবনের সমস্যারও অন্ত নাই। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, *'লাকাদ খালাকনাল ইনছানা ফি কাবাদ',* অর্থাৎ, আমরা মানুষকে সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছি সমস্যার মধ্যে। জীবন সমস্যার যেমন শেষ নাই, কোরআনের সমাধান প্রদানের ক্ষমতারও তেমন শেষ নাই। তাই সেখানেই সংস্কার দরকার যেখানে মুসলিম-মানস থেমে যেতে চায়। নিয়ত যতই সহীহ হোক না কেন, চলমান জীবনকে থামিয়ে দেয়াটা সৎকাজ হতে পারে না। বরং একদৃষ্টিতে তা একটি অপরাধ। কোরআন শরীফে আছে, *'ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়াক্বাদ খা-বা মান দাচ্ছাহা',* অর্থাৎ, যে প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করলো সে সফল হলো, আর যে কলুষিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

কোরআন পাঠের পদ্ধতি

অতএব, একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে কোরআনের স্থায়িত্ব প্রশ্নাতীত হলেও তাঁর

এবং অপরাপর মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানে স্থবিরতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই দিকনির্দেশনা দানকারী সঠিক চেতনা নিয়ে কোরআন না পড়লে উল্টো 'গোমরাহ' হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কিন্তু কে বলবে কার পাঠ সঠিক চেতনাভিত্তিক? এখন তো নবী নাই, সাহাবী নাই, তাই এ ব্যাপারে কেউই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ নয়। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম চিন্তাবিদগণকে ক্রিটিক্যাল ডায়ালগের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। 'ডায়ালগ' একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ। যার কথা দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন এবং বর্তমান জামানায় দার্শনিক রিচার্ড রর্টি বলছেন। 'ডায়ালগ' বা 'কনভার্সেশন'-এর যৌক্তিক ভিত্তি হলো, কোনো মানুষই জ্ঞানের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ নয়; এমনকি একই বিষয়ে দুজন মানুষের জ্ঞান এক রকম হয় না। আবার একই বিষয়ের উপর বহু দৃষ্টিভঙ্গি বহুভাবে দেখলেও খোদার সৃষ্টির রহস্য শেষ হবার নয়। এমতাবস্থায় মুসলিম চিন্তাবিদগণ ডায়ালগের মাধ্যমে অগ্রসর হলে উভয় পক্ষই প্রান্তিকতা থেকে বেঁচে যাবে। এভাবে মুসলিম মানসের যে বিকাশ হবে তাকে তারিক রমাদানের ভাষায় 'more soul' বলা হয়। ডায়ালগের তাগিদ হাদীসেও আছে। যেমন: 'জ্ঞান হলো জ্ঞানী লোকের হারানো ধন, যেখানেই তা পাওয়া যাবে সে তার অধিকারী হবে।'

সংস্কার কীভাবে?

এ ধরনের সংস্কার মুসলিমচিন্তার কোথায় ও কীভাবে সম্ভব হবে– এ ব্যাপারে এখন আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে চাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক ব্যক্তি একটি ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে চায় বা একটি প্রশ্ন করতে চায়। আমরা যদি কোনো প্রকার সংস্কারের ধারণা গ্রহণ না করি, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আমরা কোনো এক মাদ্রাসার কম্পাউন্ডে যাবো এবং জেনে নেবো এই মাদ্রাসার মুফতি কে। তখন তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবো। অপরপক্ষে, আমাদের যদি সংস্কারের ধারণা পরিস্কার থাকে তাহলে আমাদের ফতোয়া সম্বন্ধে প্রথম বিবেচ্য হবে, এই সমস্যাটি জীবনের কোন দিক বা বিভাগের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এটা কি ইবাদত সম্বন্ধে, না মুয়ামালাত বা সামাজিক আচরণের কোনো দিক সম্বন্ধে। যদি ইবাদতের মধ্যে পড়ে, ধরুন ইসতিস্কার নামাযের নিয়ম সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন হয়, তবে আমরা ঐ মুফতির কাছে যাবো যিনি ইবাদতের নিয়ম কানুন (rituals) সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টি যদি হয় ব্যাংকিংয়ের কোনো জটিলতা সম্বন্ধে, তাহলে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে যাবো যিনি মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশগুলো যেমন জানেন ও মানেন, তেমনি ব্যাংকিংয়ের বিষয়েও তিনি বিশেষজ্ঞ। ব্যাংকিংয়ের জ্ঞান তাকে

সমস্যার সঠিক বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে এবং কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান তাকে ঐ সমস্যার এমন সমাধান বের করতে সাহায্য করবে ।

Knowledge of text এবং Knowledge of context

তারিক রমাদানের ভাষায়, এ দুই প্রকার জ্ঞান হলো Knowledge of text (কোরআন ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহ) এবং Knowledge of context (জীবন ও জগতের বাস্তব অবস্থার জ্ঞান)। যেমন, কমার্স ও ব্যাংকিং, সমাজ ও সমাজবিজ্ঞান, মানুষ ও মানববিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি। Knowledge of text যদি ঔষুধ হয়, তাহলে Knowledge of context হলো রোগের বিশ্লেষণ। রোগের বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো ঔষুধই প্রয়োগ করা যায় না। কমার্স ও ব্যাংকিং, সমাজ ও সমাজবিজ্ঞান, মানুষ ও মানববিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি হলো জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যার জায়গা। অতএব, উক্ত ফতোয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকিংয়ের জ্ঞান সমস্যার সঠিক বিশ্লেষণে সাহায্য করবে এবং কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান সমস্যার সর্বোত্তম সমাধানে উপনীত হতে সাহায্য করবে।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। অর্থনীতি বা সংস্কৃতির জ্ঞান গতিশীল বা পরিবর্তনশীল। কারণ, সমস্যার প্রকৃতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। তবে সমস্যার প্রকৃতি পরিবর্তনশীল হলেও নতুন রূপে আগত সমস্যার সমাধানও কোরআনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে তারিক রমাদান বলেন, সমস্যার প্রকৃতির পুনঃপুন বদলের সাথে কোরআনের পুনঃপুন পাঠোদ্ধারই (repeated reading) যুগের প্রয়োজন মেটাবে। প্রতিটি পরিবর্তনের সময় পরিবর্তিত অবস্থাকে মনের মধ্যে নিয়ে কোরআনের পাতায় নজর দিলে, পাঠক অনুধাবন করবে যে কোরআন তার সমস্যারই সমাধান উপস্থাপন করেছে। যা কিনা অবস্থা পরিবর্তনের আগে ও বর্তমান পাঠের পূর্বে তার কাছে অনুধাবনযোগ্য ছিল না। এটাই আল-কোরআনের অন্যতম চিরন্তন মুজিজা। সংশ্লিষ্ট যে কোনো সমস্যা সমাধানে কোরআনের এরূপ বহুমুখী যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই অবগত নয়। এই অজ্ঞতার এমন প্রতিক্রিয়া হয়েছে যে পাশ্চাত্যে নতুন কোনো জ্ঞান আবিষ্কৃত হলে মুসলমানদের একটা অংশ বলে বসে— কোরআনে বহু আগেই এসব বলা হয়েছে! তাহলে সদা-সর্বদা কোরআন তেলাওয়াতকারী মুসলমানেরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেই আবিষ্কার আগেভাগেই কেন করতে পারলো না? হরহামেশাই দাবি করা হয়, অমুক অমুক বা সব বিশেষায়িত জ্ঞান ইতোমধ্যেই কোরআনে আছে। যদিও মুসলমানেরা সেটি বুঝে ওঠতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ব্যাখা-বিশ্লেষণের পরেই!

স্পষ্টতই মুসলমানেরা কোরআনকে সেইভাবে পড়ে না, যেভাবে পড়লে তারা ঐ জ্ঞানের সন্ধান আগেভাগেই পেতো। তারিক রমাদান তাই বলেন, টেক্সট ও কনটেক্সটের একটিকে অপরটির সমমূল্যায়ন করে অগ্রসর হলে তারা মৌলিক ও নব নব জ্ঞানের সন্ধান পাবে। অন্যভাবে বলা যায়— আধ্যাত্মিকতা, অর্থনীতি, প্রকৃতিবিজ্ঞান, কিংবা মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য যে কোনো শাখায় যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি যদি কোরআনের মূল পাঠ ও প্রেক্ষিতবিবেচনার জ্ঞানে সমৃদ্ধ হোন, তাহলে তিনিই হবেন ঐ বিষয়ের ইসলামী সমাধান প্রদানের প্রকৃত কর্তৃপক্ষ।

অতএব, Knowledge of context-এর ক্ষেত্রে যদি কেউ innovative expertise-এর সাথে সাথে Knowledge of revealed text-এর ক্ষেত্রেও প্রজ্ঞাবান হয়, তাহলেই কেবল মুসলমানরা 'কোরআনের আলোকে' নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিয়ে বিশ্বের মাঝে জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হবে। গড়ে উঠবে শক্তিশালী ইসলামী সভ্যতা, যার কথা কোরআনে বলা হয়েছে: "তিনিই সেই সত্তা যিনি নবীকে পাঠিয়েছেন বাস্তবসম্মত দ্বীন ও পথ-নির্দেশসহ যাতে সেটি অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হয়।"

উসূলে ফিকাহর সংস্কার

এ ধরনের সংস্কারের ব্যাপারে খোদ সনাতনী ফিকাহর কিতাবগুলো তাগিদ দিয়ে থাকে। ইসলাহ ও তাজদীদ শব্দ দুটি নতুন নয়। প্রথমটি ইসলাম অনুসারে জীবন ও সমাজকে সংশোধন করার কথা বলে। দ্বিতীয়টি খোদ ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তার সংশোধনকে বুঝায়। যেমন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) ইজতিহাদের বন্ধ দরজা খুলে দেয়ার মাধ্যমে চিন্তার সংশোধনের কথা বলেছেন।

ইবাদতের পদ্ধতি জানার জন্য কেবল Knowledge of the text-ই যথেষ্ট, কিন্তু ইবাদতের তাৎপর্য (হাকিকত) ও উদ্দেশ্য (মাকাসিদে শরীয়াহ) জানার জন্য Knowledge of the context-ও দরকার। যেমন, যার কোরআন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই জ্ঞান আছে তিনি হজ্বের তাৎপর্য ভালোভাবে বুঝবেন ঐ ব্যক্তির চেয়ে, যার জ্ঞান কেবল কোরআনের আক্ষরিক ও ফিকহী পাঠেই সীমাবদ্ধ। তেমনিভাবে যাকাতের সাথে অর্থনীতির, নামাযের সাথে সংস্কৃতির, আকীদার সাথে দর্শনের অনুরূপ ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান।

রাসূলের (সা.) জীবনে ইবাদতের সাথে Knowledge of context-এর সম্পর্ক

পবিত্র কাবার ভেতর মূর্তি থাকা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) একটি পর্যায় পর্যন্ত সেটিকে

সামনে রেখে নামায পড়েছেন, মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে রমযানের রাতে স্ত্রী সহবাসের উপর থেকে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন, বাস্তবতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্ব পালন করতে এসেও তা না করে সন্ধি করে ফিরে যান, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে নবীজির নাম থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দিয়েছেন। এ ধরনের বহু উদাহরণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পুরো জিন্দেগীতে দেখা যায়। ইবাদতের ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনা করে রুখসতের (ছাড় দেয়া) প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য। যদিও ইবাদতের নির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহের সব ক'টিকে বাতিল করা বা এসবের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনার কোনো সুযোগ নাই। যেমন পরিস্থিতির কারণে মূর্তি সামনে রেখে নামায পড়েছিলেন নবীজি। কিন্তু এটি নামাযের নিয়ম হিসাবে গণ্য হয়নি। তুরস্কে বহু বছর পর্যন্ত আরবী ভাষায় আযান দেয়ার উপর রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা ছিল। তখন মানুষ তাদের পরিস্থিতি মোতাবেকই আমল করেছে। কিন্তু এতে আযানের নিয়মের কোনো পরিবর্তন হবে না।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তা হলো ইবাদতের সাথে মুয়ামালাতের সম্পর্ক। যেমন: রোযার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি রোযা রাখলো কিন্তু মিথ্যা ছাড়তে পারলো না, তার উপোস থাকা খোদার কোনো দরকার নাই। নামাযের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে নামায ফাহেশা ও মুনকার কাজ থেকে মানুষকে দূরে রাখে। এখানে মুনকার বলতে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচারকে বুঝায়। নামাযের মধ্যে মানুষ যেভাবে রুকু সিজদার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে বাস্তব জীবনেও সেরকম আনুগত্যের ভাবধারার মধ্যে মানুষ থাকবে— এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যদি সে খোদার বিদ্রোহী হয় তাহলে তার আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের কি মূল্য থাকে? কারণ, বাস্তব আচরণ আনুষ্ঠানিক আচরণের সত্যায়ন বলে পরিগণিত হয়। বিপরীত পক্ষে, আনুষ্ঠানিক আচরণ (formal behavior) বাস্তব আচরণের (practical or real behavior) সত্যায়ন নয়। বাস্তব আনুগত্য না থাকলে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য কতটুকু অর্থপূর্ণ? ইবাদত মানুষের মনে আল্লাহর আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টি করে। আর বাস্তব জীবন সেই আনুগত্যেরই প্রকাশ ও প্রমাণ।

আধ্যাত্মিকতা ও কর্মতৎপরতা

এভাবে আধ্যাত্মিকতা ও কর্মতৎপরতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আত্মা যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে তার প্রভাব কর্মের উপর অবশ্যই পড়বে। আত্মা দূষিত হলে সেটিও কর্মের মাঝে প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি রুকু-সিজদার মাধ্যমে কেবল আল্লাহরই আনুগত্য প্রকাশ করে এবং কেবল তাকেই ভয় করে; সে যদি বাস্তব জীবনেও কেবল

আল্লাহরই আনুগত্য করে, কেবল তাঁকেই ভয় করে, বিপদে কেবল তার উপরেই ভরসা রাখে; তাহলে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতে তার কোনো দ্বিধা থাকে না। তার আত্মিক পরিশুদ্ধি প্রমাণিত হলো। আর তা যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে তার আধ্যাত্মিক সাধনা তথা তার ইবাদত, যিকির, নামায তার অন্তরকে মানুষের ভয় থেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে নাই; অন্যের আনুগত্যের মোহ থেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে নাই। তাই তারিক রমাদান বলেছেন, If you are not spiritually strong, you cannot be politically courageous. অতএব, প্রকৃত ইবাদত বা আধ্যাত্মিকতার যেমন রয়েছে বাস্তব প্রকাশ তেমনি বাস্তব জীবনের সফলতা নির্ভর করে আধ্যাত্মিকতার উপর।

এ পর্যন্ত যেসব আলোচনা করা হলো তা মূলত আত্মসমালোচনামূলক কথা বা critical thinking। এরূপ আত্মসমালোচনামূলক চিন্তা একেক জনের জন্য একেক রকম। জীবনের নানাবিধ কর্মযজ্ঞে কে কী ধরনের দায়িত্ব পালন করে, তার উপর এটি নির্ভর করে। একজন কৃষক আর একজন ফকীহ সমান নয়। তাদের আত্মসমালোচনার বিষয়ও সমান নয়। যদিও কৃষক ও কৃষি কাজ, ফকীহ ও ফিকাহ, গবেষক ও গবেষণা পদ্ধতি— কেউই বা কিছুই আত্মসমালোচনা ও সংস্কারের উর্ধ্বে নয়।

Outward looking knowledge এবং inward looking knowledge

এই বিষয়টিকে স্টিফেন টুলমিন এভাবে বলেন, মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাপদ্ধতি দুটি ধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। এই ধারা দুটি হলো outward looking knowledge এবং inward looking knowledge। প্রথম প্রকার জ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো জীবন ও জগৎ (objects out there)। আর দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো জ্ঞানের কর্তা ও জ্ঞানের পদ্ধতি (subjects and methods of knowledge)। এতদুভয়ের একটি বহির্মুখী চিন্তা অপরটি অন্তর্মুখী চিন্তা। প্রথমটি জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটায়, দ্বিতীয়টি জ্ঞানের গভীরতা সৃষ্টি করে। জ্ঞানের ব্যাপ্তিতে নতুন কিছু যুক্ত হলে তা জ্ঞানের গভীরতার ক্ষেত্রে নতুন জিজ্ঞাসার সূচনা করে। আবার জ্ঞানের গভীরতার ক্ষেত্রে নতুন কিছু যুক্ত হলে তা ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেও নতুন জিজ্ঞাসার সূচনা করে। এভাবে পারস্পরিক প্রভাবের দ্বারা একে অন্যের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এভাবে জ্ঞান সৃষ্ট ও বিকশিত হয় ।

জ্ঞানের আধিক্যের সাথে যথার্থতার ভারসাম্য

জ্ঞান আহরণ বা উৎপাদনের সাথে সাথে এর বৃদ্ধি ও পরিমার্জন একটি অন্তহীন

চলমান প্রক্রিয়া। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ‘সঠিকতা’ বিনা ‘অধিকতা’ বিপদজনক! অধিক জ্ঞান কাম্য নয় যদি তা সঠিক না হয়। এটি ইসলামের জন্য সর্বাধিক প্রযোজ্য। কোরআনে আছে, *‘ইউদ্বিল্লু বিহী কাছীরান, ওয়া ইয়াহদী বিহী কাছীরা’*, অর্থাৎ একই পাঠ অনেককে বিভ্রান্ত (গোমরাহ) করতে পারে, আবার অনেককে সঠিক পথেও (হেদায়াত) আনতে পারে। তাই আত্মসমালোচনা তথা সংস্কারমূলক চিন্তা ইসলামী চিন্তাবিদদের জন্য সর্বাধিক ও সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজন।

কার্ল পপারের ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড

একই কথা ভিন্নভাবে বলেছেন দার্শনিক কার্ল পপার। তিনি বলেছেন, মানুষের জ্ঞান trial and error method-এর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। পুরাতন ধারণার ত্রুটি খুঁজে তা পরিহার করতে হবে এবং তদস্থলে নতুন জ্ঞান উপস্থাপন করতে হবে। এই নতুনের মাঝে যদি পূর্বেকার মতো ত্রুটি বের হয় তাহলে আরো নতুন জ্ঞান উপস্থাপন করতে হবে। এভাবে পুনঃপুন সংশোধনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের ‘বৃদ্ধি’ এবং ভ্রান্তির নিরসন ঘটবে।

একটি ট্রায়াল হতে পারে এভাবে: ধারণা করা হলো, খোদার ওয়াদা অনুসারে যারা যথাযথভাবে ঈমান অর্জন করবে তাদেরকে তিনি খেলাফত প্রদান করবেন। দেখা যাচ্ছে, মুসলমানেরা ঈমানের দাবি করছে অথচ তাদের কাছে খেলাফত নাই। এমতাবস্থায় আত্মসমালোচনা করে দেখতে হবে, তাদের ঈমানের মধ্যে কোথায় এবং কী এরর আছে। সেই এরর সংশোধন করে আবারও ট্রায়াল করতে হবে যে ঈমানের ফলে তারা খেলাফতের দিকে এগুচ্ছে কিনা। যদি হয় তবে তাদের ঈমান ও ইলম আপাতত ফলপ্রসূ। আরো দেখতে হবে, ভবিষ্যতের কতদূর পর্যন্ত এই জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টা ফলপ্রসূ। ভবিষ্যতে যখন এতে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হবে তখনই আবার সংস্কারের প্রসঙ্গকে নতুন আঙ্গিকে ভাবতে (incorporate) হবে। এক কথায়, ইসলামসহ যে কোনো সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া।

ইসলামে বাধ্যবাধকতা ও স্বাধীনতার সীমারেখা

এ পর্যায়ে ইসলামে বাধ্যবাধকতা ও স্বাধীনতার সীমারেখা বুঝতে হবে। বিষয়টি সংস্কার ও সংরক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব হিসাবে প্রতীয়মান। কোন বিষয়ে সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা আছে আর কোন বিষয়ে সংস্কারের স্বাধীনতা আছে, তা বুঝতে হবে। ইসলাম মানুষের জন্য হেদায়েতস্বরূপ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য কতক মৌলনীতি প্রদান করেছে, যার ভিত্তিতে জীবন ও সভ্যতা গড়ে তোলার দায়িত্ব

মানুষের। যেমন: মানুষের অর্থনীতির ব্যাপারে খোদা কেবল কয়েকটি কথা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। যথা: যাকাত, সুদ, মজুতদারি, হালাল, হারাম, আল্লাহ সম্পদের মালিক আর মানুষ তার আমানতদার ইত্যাদি হাতেগোনা কয়েকটি মৌলনীতি দিয়ে দিয়েছেন। এসব হলো বাধ্যবাধকতা। আর এর ভিত্তিতে কোনো দেশের অর্থনীতি কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তা বিবেচনা করার স্বাধীনতা সংশ্লিষ্টদের থাকবে। বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে ফুটবল খেলার উদাহরণ দেখা যেতে পারে। একজন ফুটবলারকে কিছু বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয়। যেমন, দাগের বাহিরে যাবে না, হাত বলে লাগবে না ইত্যাদি। এই কয়েকটি বাধ্যবাধকতা মেনে চলা সাপেক্ষে একজন খেলোয়াড় মাঠে স্বাধীনভাবে খেলতে পারেন। তাই দেখা যায়, একেক জন খেলোয়াড় একেক রকম খেলে। তাদের সফলতা তাদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে।

একই ধরন বা প্যাটার্ন ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলাম কেবল মৌলনীতির দ্বারা একটি চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দেয়, আর সেই সীমারেখার ভিতরে থেকে বাকি সকল কাজের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। মানুষের সফলতাও তার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ফুটবল যিনি খেলেন তার জন্যই ফুটবলের নিয়মগুলো প্রযোজ্য। যিনি খেলেন না তার জন্য নয়। তেমনি কোরআনে আধ্যাত্মিকতা, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পর্কে খোদার মৌলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের জন্য, যারা নিজেদের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার জন্য দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই দায়িত্বের জন্যই মানুষকে আল্লাহর খলিফা বলা হয়। খেলাফতের এই দায়িত্ব কোনো ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের ক্ষমতা দিয়েছেন এই দায়িত্ব পালন করার জন্যই। ইবাদতের সাথে সাথে খেলাফতের এ দায়িত্ব অবশ্য পালনীয়।

সংস্কারের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র

১। কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে কোনো প্রকার জ্ঞানকে চিরস্থায়ী মনে না করা।

২। ফিকাহসহ অন্য সকল শাখার জ্ঞান, জ্ঞানের কর্তা ও জ্ঞানের পদ্ধতিকে পর্যালোচনামূলক অনুধাবনের (critical understanding) অন্তর্ভুক্ত মনে করা।

৩। ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে টেক্সট ও কনটেক্সটকে সমগুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা।

৪। আধ্যাত্মিকতা ও কর্মতৎপরতাকে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করা।

৫। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার জন্য পুনঃপুন পাঠ অব্যাহত রাখা।

৬। নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মের পাশাপাশি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। বিশেষত, সৃজনশীল চিন্তা ও মানব উন্নয়নের লক্ষ্যকে সমুন্নত রাখা আবশ্যক।

৭। মুসলমানদের সাধনা হতে হবে সকল মত ও পথের মানুষের কল্যাণ চিন্তা। একে নিছক কৌশল হিসেবে গ্রহণ না করে এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে।

৮। সকল প্রকার প্রান্তিকতাকে পরিহার করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

ইসলামে ধর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা

ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ: কাজী শিহান মির্জা

ইসলাম স্বাধীনতার মূলনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) বিখ্যাত উক্তিটি হলো— “তোমরা কবে থেকে তাদেরকে ক্রীতদাস বানিয়েছ? তাদের মায়েরা তো তাদেরকে স্বাধীন হিসেবেই জন্ম দিয়েছে!” আলী ইবনে তালিব (রা.) অসীয়ত করে গিয়েছেন, “অন্যের জীবনকে যাপন করো না, আল্লাহ তোমাকে স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।” প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সৃষ্টির নিয়ম ও জন্মের প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ স্বাধীন। তাই স্বাধীনতা মানুষের অধিকার, মানুষ কারো দাস নয়।

ইসলাম এসেই স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছে। অথচ সে যুগে চিন্তা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম এবং অর্থনীতির দিক থেকে মানুষ পরাধীন ছিল। ইসলাম মানুষকে বিশ্বাস, চিন্তা, মতপ্রকাশ ও সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছে। মোটকথা, মানুষ যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা বা অধিকার চায়, তার সবগুলোই ইসলাম তাকে দিয়েছে।

মানুষের নিরংকুশ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চেয়ে হিদায়াহ নামের একজন নারী onislam.net-এ একটি প্রশ্ন করেছিলেন। শায়খ ইউসুফ আল কারযাভী আরবীতে প্রশ্নটির বিস্তারিত জবাব দেন, যা ২০০৫ সালের ৩ আগস্ট ওয়েবসাইটটিতে প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধটি সেই প্রশ্নোত্তরের পরিমার্জিত অনুবাদ।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

ইসলাম এমন একটি দ্বীন যা ধর্মীয় তথা বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম কখনোই মানুষকে জোর করে ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অনুমতি দেয় না। আল্লাহর কালাম এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছে,

> "(হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে এ জমিনে যত মানুষ আছে তারা সবাই ঈমান আনতো; তুমি কি মানুষদের জোর-জবরদস্তি করবে যেন তারা সবাই মুমিন হয়ে যায়!"
>
> [সূরা ইউনুস: ৯৯]

এটা তো মক্কী যুগের কথা। মাদানী যুগে নাযিল হওয়া সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

> "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, সত্য মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে।"
>
> [সূরা বাকারা: ২৫৬]

এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি, ধর্মীয় স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করতে, এর তাৎপর্যকে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে এবং এর মূলনীতিকে নিশ্চিত করতে ইসলাম কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে। জাহেলী যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্রের নারীরা গর্ভধারণে অপারগ হলে মানত করতো যে ছেলে সন্তান হলে তাকে ইহুদী হিসেবে গড়ে তুলবে। এভাবে এই আরব গোত্র দুটির কিছু সন্তান ইহুদী হিসেবে বেড়ে উঠে। তারপর ইসলামের আগমন ঘটলে আল্লাহ এসব পিতামাতাকে এ দ্বীন কবুলের মর্যাদায় ভূষিত করে তাঁর নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করলেন। তখন কোনো কোনো পিতামাতা তাদের ইহুদী সন্তানদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তখন ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ চলমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম জোর করে কাউকে এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে — এমনকি তা ইসলামে হলেও — ধর্মান্তরিত করার অনুমতি দেয়নি। "ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই"— এই ঘোষণা ইসলাম এমন এক সময়ে দিয়েছে যখন বাইজেন্টাইনের অন্যতম নীতি ছিলো— হয় খ্রিস্টান হও, নয়তো শির পেতে দাও। তৎকালীন অপর পরাশক্তি পারস্যের ধর্মীয় সংস্কারকদের ব্যাপারেও অনুরূপ জঘন্য অভিযোগ রয়েছে।

সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতা বা কোনো বিপ্লবের ফলাফল হিসেবে স্বাধীনতার এই মূলনীতি আসেনি। মানবসভ্যতার অগ্রগতির এক পর্যায়ে তা এসেছে, এমনও নয়। আসলে এটা সমাজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বাধীনতার এই মূলনীতি

এসেছে আসমান থেকে, যার উপর দাঁড়িয়ে মানবজাতি উন্নত হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে মানবতাকে সমুন্নত করতেই ইসলামের আগমন ঘটেছে।

অবশ্য ইসলামে স্বাধীনতার এই মূলনীতিকে শর্তযুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে এই দ্বীন মানুষের হাতের খেলনায় পরিণত না হয়। ইহুদীরা সকালে ইসলামের প্রতি ঈমান এনে বিকেলে তা প্রত্যাখ্যান করে বলতো, আমরা মুহাম্মদের দ্বীনে এমন এমন বিষয় পেয়েছি, তাই ঈমান ত্যাগ করলাম। এমনকি তারা আজ ঈমান এনে পরদিন বা সপ্তাহখানেক পরেই তা বর্জন করতো। এভাবে তারা এই দ্বীনের সাথে নোংরামি করতো। এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

> "আহলে কিতাবদের (মধ্য থেকে) একদল তাদের নিজ লোকদের বলে, মুসলমানদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা সকাল বেলায় তার উপর ঈমান আনো এবং বিকেল বেলায় তা অস্বীকার করো, (এর ফলে) তারা সম্ভবত (ঈমান থেকে) ফিরে আসবে।"
>
> [সূরা আলে ইমরান: ৭২]

এসব কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চেয়েছেন এই দ্বীন যেন খেলার পাত্রে পরিণত না হয়। তাই কেউ ইসলামে প্রবেশ করার সময় যেন নিশ্চিত হয়ে অন্তর্দৃষ্টির সাথে সচেতনভাবে ইসলামকে পুরোপুরি ধারণ করে। নয়তো পরবর্তীতে কেউ ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেলে স্বধর্মত্যাগের শাস্তির জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত।[১]

অতএব, স্বাধীনতার অগ্রাধিকার বিবেচনা করলে প্রথমেই ধর্মপালন ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আসে।

চিন্তার স্বাধীনতা

দ্বিতীয় প্রকার স্বাধীনতা হচ্ছে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাধীনতা। ইসলাম মানুষকে বিশ্বজগৎ নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনা করার আহবান জানিয়েছে।

> "(হে নবী,) তুমি বলো, আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথারই উপদেশ দিচ্ছি, তা হলো— তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যই (সত্যের উপর)

---

[১] বক্তব্যটি পরিষ্কার নয়। চতুর্থ অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। — অনুবাদ সম্পাদক

দাঁড়িয়ে যাও, দুই দুইজন করে, (দুইজন না হলে) একা একা; অতঃপর ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করো।”

[সূরা সাবা: ৪৬]

“(হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা দেখো যে আসমানসমূহ ও জমিনে কী কী জিনিস রয়েছে।”

[সূরা ইউনুস: ১০১]

“তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? করলে তাদের অন্তরগুলো এমন হতো, যা দিয়ে তারা বুঝতে পারতো; অথবা কানগুলো এমন হতো যা দিয়ে তারা শুনতে পেতো। বস্তুত, চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত অন্তর।”

[সূরা হজ্ব: ৪৬]

তবে যারা নিজের আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনার অনুসরণ করে, ইসলাম তাদেরকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছে। আল্লাহ বলেছেন,

“আর সত্যের মোকাবেলায় (আন্দাজ) অনুমান তো কোনো কাজেই আসে না।”

[সূরা নাজম: ২৮]

আবার যারা নিজের প্রবৃত্তি, পূর্বপুরুষ, সমাজের প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয়দের অনুসরণ করে তাদের বিরুদ্ধেও ইসলাম কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তারাই কেয়ামতের দিন বলবে,

“হে আমাদের মালিক, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথাই মেনে চলেছি, তারাই আমাদেরকে তোমার পথ থেকে গোমরাহ করেছে।”

[সূরা আহযাব: ৬৭]

“আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী মাত্র।”

[সূরা যুখরুফ: ২২]

ইসলাম এ ধরনের লোকদেরকে পশু কিংবা তারচেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে তুলনা করেছে। অন্ধ অনুসারী ও নিষ্ক্রিয় মনমানসিকতার লোকদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কাজ করতে আহ্বান করেছে। মানুষের প্রতি জোর আহ্বান জানিয়ে

ইসলাম বলেছে,

> “যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমাদের দলীল প্রমাণ নিয়ে এসো!”
>
> [সূরা বাকারা: **১১১**]

আকীদা প্রমাণের জন্য ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলের উপর নির্ভর করেছে। এজন্যই আলেমগণ বলেছেন, “নিশ্চয়ই উদার বুদ্ধিবৃত্তি সঠিক আসমানী প্রত্যাদেশের ভিত্তি।” অর্থাৎ যুক্তি হলো ওহীর ভিত্তি। আল্লাহর অস্তিত্ব ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের বিষয়গুলো দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধিসম্মত যুক্তির উপর। বিবেক বুদ্ধিই বলে উঠে— তিনি আল্লাহর রাসূল, সত্যতা এবং মুজিজা হচ্ছে তাঁর নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ। অন্যদিকে বিবেকের যুক্তি বলে, অমুক তো মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল। তার কাছে সত্যও নেই, মুজিজাও নেই। এভাবেই ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিকে মর্যাদা দান করেছে।

জ্ঞানের জগতে স্বাধীনতা

চিন্তার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপরের আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর আসে জ্ঞানের জগতে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। আমরা দেখতে পাই, আমাদের আলেমগণ পরস্পরের সাথে নানা বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। তাঁরা একে অপরের ভুল ধরেছেন এবং জবাব দিয়েছেন। এসবকে কেউই সমস্যা মনে করেননি। আমরা দেখতে পাই, ইমাম জামাখশারী রচিত ‘তাফসীরে কাশশাফ’ গ্রন্থটিকে সুন্নী ও মুতাজিলা উভয় দলই সমাদর করেছে। ইমাম জামাখশারী মুতাজিলাপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই তাফসীর থেকে সুন্নীরা উপকৃত হয়েছে। এটিকে কেউ কোনো সমস্যা মনে করেনি।

আলেমরা এগিয়ে আসায় এমনটা সম্ভব হয়েছে। ইবনে মুনীরের মতো প্রখ্যাত সুন্নী আলেম তাফসীরে কাশশাফের উপর ‘আল ইনতিসাফ মিনাল কাশশাফ’ নামে একটি হাশিয়া তথা টীকা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে হাফিয ইবনে হাযরের মতো ইমামও এগিয়ে এসেছেন। তিনি এই তাফসীরে ব্যবহৃত হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ‘আল-কাফী আল-শাফী ফি তাখরিজি আহাদীসিল কাশশাফ’ নামে একটি পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এভাবেই আলেমগণ একজন আরেকজনের গবেষণাকর্ম থেকে উপকৃত হয়েছেন। আমরা দেখেছি, পারস্পরিক মতপার্থক্য করার ক্ষেত্রেও ফকীহগণের অন্তরের প্রশস্ততা ছিল। এসব উদাহরণ থেকে ইসলামী উম্মাহর মধ্যে চিন্তা ও জ্ঞানের স্বাধীনতার প্রমাণ দেখা যায়।

সমালোচনা ও বাকস্বাধীনতা

ইসলাম বাকস্বাধীনতা এবং সমালোচনার স্বাধীনতাও দিয়েছে। এক্ষেত্রে বরং অনেক বেশি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কারণ, উম্মাহর কল্যাণ, চরিত্র ও নৈতিকতা সংশোধনের স্বার্থে মতপ্রকাশ ও সমালোচনা করা কখনো কখনো ওয়াজিব হয়ে যায়। সবসময় হক কথা বলতে হবে, আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করা চলবে না। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে। কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকতে হবে। ভালো কাজের স্বীকৃতি দিয়ে মানুষকে বলতে হবে, আপনি উত্তম কাজ করেছেন। আর কেউ মন্দ কাজ করলে বলতে হবে, আপনি খারাপ কাজ করেছেন।

এসব হক কথা বলার জন্য যখন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিংবা আপনার নিরবতাই যখন উম্মাহর ক্ষতি ও মানুষের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তখন এসব সংশোধনমূলক কাজ অপরিহার্য কর্তব্যে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় সত্য বলা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এতে কোনো বিপদের পরোয়া করা যাবে না।

“সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করো। এতে বিপদ আসলে সবর করো। নিশ্চয়ই তা এক মহান ব্যাপার।”— এই হলো ইসলামের অন্যতম মৌলিক অনুশাসন। ইসলামে এমন কোনো সুযোগ নেই যাতে করে মানুষের টুঁটি চেপে ধরে লাগাম পরিয়ে রাখা হবে, যেন অনুমতি ছাড়া মানুষ কথা বলতে না পারে বা ঈমান আনতে না পারে। এটি ফেরাউনের বৈশিষ্ট্য। ফেরাউন তার যাদুকরদের বলেছিল, “তোমরা কি আমার অনুমতি ছাড়াই তাঁর উপর ঈমান এনে ফেললে?” সে চেয়েছিল মানুষ যেন অনুমতি ছাড়া ঈমান না আনে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কথা না বলে।

স্বাধীনতা সুরক্ষা

ইসলাম মানুষকে শুধু চিন্তার স্বাধীনতাই দেয়নি, চিন্তা করার নির্দেশও দিয়েছে। মানুষ যা সত্য মনে করবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। শুধু তাই নয়, এর অনুসরণ করাকে ইসলাম কর্তব্য হিসেবে ধার্য করে দিয়েছে। প্রয়োজনে অস্ত্রবলে নিজের এই আকীদাকে রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। মুসলিমদের আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন প্রয়োজনে স্বশস্ত্রপন্থায় নিজেদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা দূর না হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীন পুরোপুরি কায়েম না হয়। সবাই জুলুম থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত জালিমকে প্রতিহত করতে হবে।

কিতাল ও জিহাদের বিধান সংক্রান্ত প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয়, তাতে আল্লাহ বলেন,

> "তাদেরও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া গেলো, কেননা তাদের উপর সত্যিই জুলুম করা হচ্ছিলো।"
>
> [সূরা হজ্ব: ৩৯]

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ আবার বলছেন,

> "যদি আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে শায়েস্তা না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের) উপসনালয় ও গির্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, (ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদীদের) ইবাদতের স্থান ও (মুসলমানদের) মসজিদসমূহও, যেখানে বেশি বেশি পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়।"
>
> [সূরা হজ্ব: ৪০]

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যদি মুসলিম ও মুমিনদেরকে স্বশস্ত্রপন্থায় হলেও স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার না দিতেন, তাহলে কারো পক্ষেই আল্লাহর ইবাদত করা সম্ভব হতো না।

স্বাধীনতার সীমারেখা

ইসলাম অধিকারের স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু ধর্মহীনতা ও পাপাচারের স্বাধীনতা দেয়নি। আজকাল যাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা হিসেবে দাবি করা হয়, ইসলামের স্বাধীনতার স্বরূপ তেমনটা নয়। 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' পরিভাষা ব্যবহারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ইচ্ছেমতো ব্যাভিচার, মদপান ও সব ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করার সুযোগ তৈরি করা। তবে কল্যাণ ও সংশোধনের সাথে জড়িত ব্যাপারগুলোর কোনো স্বাধীনতা সেখানে নাও থাকতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, সমালোচনা করা যাবে না, যা বিশ্বাস করা হয় তা বলা যাবে না, উত্তম কাউকে বলা যাবে না যে 'তুমি ভালো কাজ করেছ', খোঁড়াকে খোঁড়া বলা যাবে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে শুধু নিজেকে নষ্ট করার মধ্যে, চরিত্র বরবাদ করার মধ্যে, চেতনাকে বিকৃত করার মধ্যে, ইবাদতকে নষ্ট করার মধ্যে, পরিবারকে ধ্বংস করার মধ্যে।

এই যদি হয় স্বাধীনতার অর্থ, তাহলে ইসলাম এমন স্বাধীনতাকে অনুমোদন করে না। কারণ, এটা পাপাচারের স্বাধীনতা; অধিকারের স্বাধীনতা নয়। চিন্তাভাবনা, জ্ঞানচর্চা, মতামত গঠন, মতপ্রকাশ, সমালোচনা, বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতাকে

ইসলাম অনুমোদন করে। এই স্বাধীনতাগুলোর উপরই মানবজীবন দাঁড়িয়ে আছে। অন্যের ক্ষতিসাধন করবে না— এই আইনী শর্ত ও নীতির ভিত্তিতে ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দেয়। ইসলামের সাধারণ মূলনীতি হলো, "ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও নয়, ক্ষতিগ্রস্ত করাও নয়।" আদতে এমন কোনো স্বাধীনতা কি আছে, যা নিজের বা অন্যের ক্ষতিসাধনের অনুমোদন দেয়? যদি থাকে তাহলে এমন স্বাধীনতাকে মোকাবেলা করা উচিত, শর্তাধীন করা উচিত। কারণ, এ ধরনের ব্যবস্থায় যেখান থেকে অন্যের স্বাধীনতার শুরু হয়, আপনার স্বাধীনতা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। তাই এমন স্বাধীনতার কথা কেউই সমর্থন করে না, যেখানে স্বাধীনতার নামে অপরকে দমনপীড়ন বা নিষ্পেষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রাস্তায় সবার চলাফেরার স্বাধীনতা থাকলেও রাস্তার আদব-কায়দাও তো মেনে চলতে হবে। আপনি অপরের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাতে পারেন না। যানবাহনের পথ রোধ করতে পারেন না। ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করতে পারেন না। লাল বাতি জ্বললে আপনাকে থেমে যেতে হবে, কিংবা নির্ধারিত পথেই আপনাকে হাঁটতে হবে। এগুলোই হচ্ছে আপনার স্বাধীনতার শর্ত বা সীমারেখা। সবার কল্যাণের স্বার্থেই এই বিধিনিষেধ ঠিক করা হয়েছে।

প্রত্যেক মতাদর্শ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থার মধ্যেই স্বাধীনতার এরূপ সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। ইসলামও তাই করেছে। কেননা মানবতার জন্য এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন তালুকদার

ভূমিকা

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কেননা, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন করেই সৃষ্টি করেছেন এবং স্বাধীনতা নিয়েই তার জন্ম হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক মানবসন্তান ফিতরাতের (প্রকৃতি) উপর জন্মগ্রহণ করে।" (বুখারী)। আরবী ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী, এই ফিতরাত শব্দটির মধ্যে স্বাধীনতার মর্মার্থ নিহিত রয়েছে। এ স্বাধীনতার অর্থ ও তাৎপর্য অত্যন্ত বিস্তৃত, যা মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ও দিককে অর্ন্তভুক্ত করে। তার চিন্তা-চেতনায়, মননে, কর্মে; এক কথায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার উপস্থিতি একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।"

[সূরা বাকারা: ৩০]

মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এই খেলাফতের মর্যাদালাভের পেছনে রয়েছে মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাজগতের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুম-

---

সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র কর্তৃক ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে আয়োজিত 'চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত।

আহকাম পালনে রত থাকলেও তাদের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই।

অন্যদিকে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির সেরা জীবরূপে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে মানবজাতিকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

> "আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদের জন্য জলে-স্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে পবিত্র রিযক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"
> [সূরা বনী ইসরাঈল: ৭০]

এ আয়াত স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে তার কিছু স্বকীয়তার কারণে এই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ভালো-মন্দের বিচার-বিবেচনা, স্বীয় কল্যাণচিন্তা, ইচ্ছা করার অধিকার এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ইত্যাদি এই স্বকীয়তার অন্যতম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিভিন্ন সৃষ্টির কাছে একটি বিশেষ বিষয় গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করেন, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

> "আমি আসমান, যমীন ও পর্বতের প্রতি (ইসলামের বোঝা বহন করার) আমানত পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকৃতি জানালো, তারা তাতে আশংকিত হলো, কিন্তু মানুষ সে দায়িত্ব নিলো। সে বড়ই অন্যায়কারী, বড়ই অজ্ঞ।"
> [সূরা আহযাব: ৭২]

'আমানত' শব্দটি এই আয়াতে কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, সে বিষয়ে মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় তারা যেসব মত ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে একটি মতানুযায়ী, এখানে 'আমানত' অর্থ হলো ভালো-মন্দ বাছাইয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা।

অতএব, চিন্তার স্বাধীনতার বিষয়টি মানুষের সৃষ্টি, তার সম্মান ও দায়িত্ব-কর্তব্যের

সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চিন্তার অধিকার তাই মানুষের একটি সহজাত ও স্বভাবগত অধিকার। একজন মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। সব মানুষই যে কোনো বিষয়ে ভাবতে ও গবেষণা করতে পারে। তবে তা হতে হবে শরীয়াহ নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে।

ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়:

১। চিন্তার স্বাধীনতা ও দাসত্ব
২। ধর্মীয় স্বাধীনতা
৩। বুদ্ধিবৃত্তিচর্চা ও ইসলাম
৪। ইচ্ছার স্বাধীনতা
৫। চিন্তার স্বাধীনতার শরয়ী নীতিমালা

১। চিন্তার স্বাধীনতা ও দাসত্ব

দাসত্ব স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে অন্তরায়। এ কারণে ইসলাম মানুষকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে দেখতে চায়। ইসলামের দৃষ্টিতে, কেউ তাকে তার এ স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না এবং জোর-জবরদস্তি করে তাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করবে না। এ প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) সেই বিখ্যাত উক্তিটিও উল্লেখযোগ্য। তিনি ঘোষণা করেছেন,

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟

“কীভাবে তুমি মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছো? অথচ তার মা তাকে স্বাধীন মানুষ রূপেই জন্ম দিয়েছে।”

(কানযুল উম্মাল, আছার নং ৩৬০১০]

ইসলাম তাই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মানবতাকে মুক্তির জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন:

ক. দাসত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এক মানুষের জন্য অপর মানুষের দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি শ্রেষ্ঠতম মানব সন্তান নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রেও এ বিধান পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।"

[সূরা বাকারা: ২১]

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

"আর তাদের মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম এই বলে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা (তাঁকে) ভয় করবে না?"

[সূরা মুমিনুন: ৩২]

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

"কোনো মানবসন্তানের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান ও নুবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে লোকেদেরকে বলে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও'।"

[সূরা আলে ইমরান: ৭৯]

খ. সকল মানুষকে একই পিতা-মাতার সন্তান ঘোষণার মাধ্যমে তাদের মর্যাদাগত পার্থক্য বিলোপ করা হয়েছে। যাতে কেউ কাউকে দাস হিসেবে গ্রহণ না করে। আল্লাহ বলেছেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

[সূরা নিসা: ১]

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (প্রত্যেকের জন্য) একটি স্থান অধিক দিন থাকার জন্য এবং একটি স্থান অল্প দিন থাকার জন্য রয়েছে। এই নিদর্শনসমূহ আমি তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে।"

[সূরা আনআম: ৯৮]

গ. একইভাবে সমষ্টিগত বা বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাতে সামষ্টিক দাসত্বের ধারণাও বিলুপ্ত হয়।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত যে ব্যক্তি অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।"

[সূরা হুজরাত: ১৩]

মহানবী (সা.) বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

"হে মানবমণ্ডলী! জেনে রাখো, তোমাদের প্রভু একজন। তোমাদের সকলেই এক পিতার সন্তান। আরো জেনে রাখো, কোনো অনারবের উপর আরবের, অনুরূপ কোনো আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা নেই। একইভাবে কালো বর্ণের মানুষের উপর লাল বর্ণের মানুষের এবং লাল বর্ণের মানুষের উপর কালো বর্ণের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা নেই। তবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে (একজনের উপর অপরজনের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে)।"

(ইমাম আহমদ; এবং আলবানীর 'সহীহাহ', ৬/১৯৯]

ঘ. যুদ্ধ দাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তৎকালীন সময়ে যুদ্ধে পরাজিত বাহিনীর মধ্য

হতে আটককৃত নারী-পুরুষ-শিশু দাস হিসেবেই গণ্য হতো। ইসলাম দাস সৃষ্টির এ উৎসটি বন্ধের জন্য এ সংক্রান্ত নতুন বিধান দিয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের ক্ষমা করে নিঃশর্ত মুক্তি অথবা মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে ছেড়ে দেয়ার বিধান জারি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

> "অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত করো, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলো। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করো। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হলো। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন)। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না।"
>
> [সূরা মুহাম্মদ: ৪]

উপরিউক্ত আয়াতে দুটি মাত্র অপশন রাখা হয়েছে। তৃতীয় কোনো বিকল্প তথা দাস বানানোর কোনো অপশন এখানে রাখা হয়নি।

৬. ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে যে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল, তা থেকে মানবতাকে মুক্তির জন্য ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপও এক্ষেত্রে আলোচনার দাবি রাখে। এ ব্যাপারে ইসলাম ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন:

- পবিত্র কোরআনের মক্কী ও মাদানী উভয় যুগের সূরাতেই দাস মুক্তির ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে, এর মাহাত্ম্য ও ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ.

"(মানুষকে এত গুণবৈশিষ্ট্য ও মেধা দেয়া সত্ত্বেও) সে (ধর্মের) দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করলো না। তুমি কি জানো দুর্গম গিরিপথ কী? (তা হচ্ছে) দাসমুক্তি।"

[সূরা বালাদ: **১১-১৩**]

- মাদানী সূরাসমূহ থেকে এখানে আমরা একটি আয়াত উদ্বৃত করছি:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে করো কিংবা পশ্চিম দিকে, এতে কোনো কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে এতে যে কোনো ব্যক্তি ঈমান আনবে মহান আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি এবং মহান আল্লাহর ভালোবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞ্রাকারীদের এবং দাসত্বজীবন থেকে নিষ্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়াদা করার পর স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সঙ্কটে ধৈর্যধারণ করবে। এসব লোকেরাই সত্যপরায়ণ। আর এ লোকেরাই মুত্তাকী।"

[সূরা বাকারা: **১৭৭**]

- দাসমুক্তিকে যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ভুলক্রমে হত্যা, শপথভঙ্গ, যিহার ইত্যাদি অপরাধের কাফফারা হিসেবেও দাসমুক্তির বিধান দেয়া হয়েছে।

অতএব বলা যায়, ইসলাম মৌলিকভাবে দাসপ্রথাকে নাকচ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, দাস সৃষ্টির রাস্তা বন্ধ করেছে। তৃতীয়ত, কোনো কারণে কেউ দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে তার মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। এমনকি সংশ্লিষ্ট দাস ইচ্ছা করলে নিজের মুক্তির জন্য মালিকের সাথে অর্থের বিনিময়ে চুক্তি করতে পারে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, যদি খেলাফতে রাশেদা আরও কিছুকাল চলমান থাকতো, তাহলে ইসলামী সভ্যতা থেকে দাসপ্রথা একবারে বিলুপ্ত হয়ে যেত।

২। ধর্ম চর্চার স্বাধীনতা

মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে তার ধর্ম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে ধর্মবিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াতসমূহ থেকে এ সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশনা স্পষ্টভাবে জানা যায়।

মক্কী জীবনে মহানবীর (সা.) উপর অবতীর্ণ আয়াতসমূহে তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে মানুষের ধর্মীয় অধিকার সর্বাবস্থাতেই স্বীকৃত থাকবে। ঈমান আনা না আনা ব্যক্তির ইচ্ছা বা এখতিয়ারভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ

> "আর বলে দাও, সত্য এসেছে তোমাদের রবের নিকট হতে, কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।"
>
> [সূরা কাহাফ: ২৯]

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ

> "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সমস্ত লোক অবশ্যই ঈমান আনতো, তাহলে কি তুমি ঈমান আনার জন্য মানুষদের উপর জবরদস্তি করবে?"
>
> [সূরা ইউনুস: ৯৯]

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

> "তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য, আর আমার জন্য আমার পথ।"
>
> [সূরা কাফিরুন: ৬]

মাদানী সূরায় এসে আরও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

> "দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।"
>
> [সূরা বাকারা: ২৫৬]

এক্ষেত্রে রাসূলের দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রচার বা দাওয়াত দান। মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ রাসূলের দায়িত্ব বহির্ভূত বিষয়। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

> "অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে; আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব শুধু প্রচার করা। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"
>
> [সূরা আলে ইমরান: ২০]

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

> "আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে জেনে রেখো আমার রাসূলের দায়িত্ব হলো সুস্পষ্টভাবে (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়া।"
>
> [সূরা মায়েদা: ৯২]

দাওয়াতের পদ্ধতিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

> "জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান জানাও, আর লোকেদের সাথে বিতর্ক করো এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে গোমরাহ হয়ে গেছে। আর কে সঠিক পথে আছে তাও তিনি বেশি জানেন।"
>
> [সূরা নাহল: ১২৫]

কোরআন বরং ধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যক্তির চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে এর দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তার উপর ছেড়ে দিয়েছে। এই বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

> "তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (অন্তরের) আলো এসে পৌঁছেছে, যে লোক (এই আলো দিয়ে) দেখবে তাতে তার

নিজেরই কল্যাণ হবে, আর যে অন্ধ থাকবে, তার অকল্যাণ তার ঘাড়েই পড়বে। (বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে) আমি তোমাদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইনি।"

[সূরা আনআম: ১০৪]

৩। বুদ্ধিবৃত্তিচর্চা ও ইসলাম

বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ছাড়া কোনোভাবেই চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় না। ধর্মীয় স্বাধীনতা বা স্বাধীন সত্তার সুফলও ভোগ করা যায় না।

- ইসলামী শরীয়ার মূল উদ্দেশ্য বা মাকাসিদে শরীয়াহর একটি হলো, হেফজুল আকল বা বুদ্ধিমত্তার সংরক্ষণ।

- ইসলাম মানুষকে তার চিন্তা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে لعلكم تعقلون، يتفكرون، تدبر، تفقه ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

- আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

  قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

  "(হে নবী,) তুমি বলো, আমি তোমাদের শুধু একটি কথারই উপদেশ দিচ্ছি। তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যই (সত্যের উপর) দাঁড়িয়ে যাও, দুই দুইজন করে, (দুইজন না হলে) একা একা; অতঃপর ভালো করে চিন্তাভাবনা করো।"

  [সূরা সাবা: ৪৬]

- যারা চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করে না, কোরআন তাদের নিন্দা করেছে:

  أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

  "তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারতো, আর তাদের কান শুনতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ তো অন্ধ নয়, বরং বুকের ভিতর যে হৃদয় আছে তা-ই অন্ধ।"

  [সূরা হজ্ব: ৪৬]

- একই কারণে কোনো কিছুর অন্ধ অনুকরণ নিষিদ্ধ করে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে দ্বীনের বিষয়গুলো গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

  قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

  "বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের দলীল পেশ করো।" [সূরা বাকারা: ১১১]

- কোরআন নির্ধারিত দাওয়াতের অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো 'মুজাদালাহ', যা চিন্তা-গবেষণা ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়।

- বিচারকের জন্য চিন্তা ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগকে অনুমোদন করা হয়েছে। মুয়াজকে (রা.) ইয়েমেনে প্রেরণের প্রাক্কালে রাসূল (সা.) তাঁকে দিকনির্দেশনা দিয়ে যা বলেছিলেন, সেই হাদীসটি এ বিষয়ের অন্যতম দলীল।

- ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতার কারণেই বরং একই বিষয়ে নানা মত, দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। তাফসীর ও ফিকাহসহ ওহীর জ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞানের আলোচনাকে আমরা মতবিরোধে পূর্ণ দেখতে পাই। মুজতাহিদগণ নির্দ্বিধায় একে অপরের ভুল ধরেছেন এবং স্বীয় বুঝজ্ঞান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ও দালীলভিত্তিক জবাব দিয়েছেন।

- মতানৈক্য সত্ত্বেও ভিন্ন চিন্তাকে আলেমগণ সম্মান করেছেন। আমরা দেখতে পাই, ইমাম জামাখশারী রচিত 'তাফসীরে কাশশাফ' গ্রন্থটিকে সুন্নী ও মুতাজিলা উভয় দলই সমাদর করেছে। ইমাম জামাখশারী মুতাজিলাপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই তাফসীর থেকে সুন্নীরা উপকৃত হয়েছেন। এটিকে কেউ কোনো সমস্যা মনে করেন নাই।

৪। ইচ্ছার স্বাধীনতা

ইচ্ছার স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলামের ইতিহাসের দার্শনিক চিন্তাগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। তাদের মধ্যে একদল মনে করে, মানুষের কোনো ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। অন্য দল মনে করে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। উভয় পক্ষের মতের পক্ষে পবিত্র কোরআনের আয়াত বিদ্যমান।

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে:

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

"যে ব্যক্তি পার্থিব ফল চায়, আমি তা থেকে তাকে দেই; আর যে ব্যক্তি আখেরাতের ফল চায়, আমি তাকে তা থেকে দেই এবং কৃতজ্ঞদেরকে আমি শীঘ্রই বিনিময় প্রদান করব।

[সূরা আলে ইমরান: ১৪৫]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

"যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কার কামনা করে সে জেনে রাখুক যে আল্লাহর নিকট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পুরস্কার আছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

[সূরা নিসা: ১৩৪]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

"যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি কোনো কমতি করা হয় না।"

[সূরা হুদ: ১৫]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

"যে কেউ নগদ নগদ পেতে চায় তাকে আমি এখানেই জলদি করে দিয়ে দেই যাকে যা দিতে ইচ্ছে করি, অবশেষে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। তাতে সে জ্বলবে ধিকৃত ও রহমত বঞ্চিত অবস্থায়।"

[সূরা বনী ইসরাঈল: ১৮]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

"যে লোক পরকালের ক্ষেত করতে চায়, আমি তার জন্য তার ক্ষেতে বৃদ্ধি দান করি। আর যে লোক দুনিয়ার ক্ষেত চায়, আমি তাকে তা থেকে দেই, কিন্তু পরকালে তার অংশে (বা ভাগ্যে) কিছুই নেই।"

[সূরা শূরা: ২০]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও— তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা করো, তাহলে এসো, তোমাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালের গৃহ কামনা করো, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

[সূরা আহযাব: ২৮-২৯]

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"

[সূরা রাদ: ১১]

৫। চিন্তার স্বাধীনতা সংক্রান্ত শরয়ী নীতিমালা

ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি সুসংবদ্ধ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হলো:

- চিন্তার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ দ্বীন জানা, বুঝা ও এর প্রচার-প্রসারের জন্য কাজ করা।
- মানবতার কল্যাণ, উম্মাহর সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য চিন্তা করা।
- দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকা।
- সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অকল্যাণকর চিন্তা থেকে দূরে থাকা।
- শরয়ী কোনো বিষয়ে গবেষণা করলে যথাযথ নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিছকই সঠিক সিদ্ধান্ত বা অধিকতর সহীহ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর নিয়ত পোষণ করা এবং ভিন্ন মতকে সর্বাবস্থায়ই সম্মান করা।

- চিন্তার ক্ষেত্রে নৈতিকতার দাবিকে সমুন্নত রাখা।
- অন্ধ অনুকরণ থেকে বাঁচার জন্যই চিন্তা ও গবেষণা করা।
- চিন্তার প্রকাশের ক্ষেত্রে যথাযথ নীতি মেনে চলা।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি সহজেই অনুধাবন করা যায়, মহান আল্লাহ মানব সত্তার সাথে স্বাধীনতাকে একীভূত করে দিয়েছেন। জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন। এ কারণে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দাসপ্রথা নির্মূলের জন্য ইসলাম সচেষ্ট হয়েছে। কেননা, মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে দাসত্ব হলো একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। একমাত্র আল্লাহর জন্য দাসত্বকে নির্দিষ্ট করার পরে মানুষকে স্বীয় পছন্দ মোতাবেক ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। একই সাথে, তাকে মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের হুকুম দেয়া হয়েছে। প্রবৃত্তিপূজা, অজ্ঞতা, অন্ধ অনুকরণের বশবর্তী হয়ে অথবা দলীল-প্রমাণবিহীন ধারণার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বরং, বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি, তাকে দেয়া হয়েছে ইচ্ছার স্বাধীনতা। যাতে করে তারই ইচ্ছার ভিত্তিতে সম্পাদিত কর্মের কারণে তাকে পারলৌকিক জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা যায়। তথাপি, মানুষের এই চিন্তার স্বাধীনতার জন্য একটি সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে মানব সমাজ এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে না পারে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।

ট্র্যাডিশনাল ইসলাম, মডার্নিস্ট ইসলাম এবং মধ্যবর্তী অবস্থান

আসিফ সিবগাত ভূঞা

ইসলাম নিয়ে আমাদের চিন্তায় দুটি প্রান্তিক পক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ আলোচনার দরজাকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইসলাম রিলেটেড যে কোনো আলোচনা যেন এ দুটি পক্ষের একটিকে সমর্থন না করে হতেই পারে না। যারাই মাঝপথে থাকতে চাইবেন তারা এ দুই প্রান্তিক গোষ্ঠীর মুহুর্মুহু আক্রমণের শিকার।

শায়েখ ইউসুফ আল-কারাদাওয়ীর কথা চিন্তা করুন। বর্তমান সময়ে ইসলাম নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন ও চিন্তা করেছেন তাদের মাঝে এই ব্যক্তির চেয়ে বড় কাউকে চিন্তা করা কঠিন। আবার বহু আলেমের কাছে তিনি বিতর্কিত। বহু আলেম তাকে এখনকার অল্প কজন মুজতাহিদ ইমামের অন্যতম হিসাবে গণ্য করেন। তাকে অর্থডক্স মুসলিমদের অনেকে মডার্নিস্ট মনে করেন, আবার পশ্চিমের অনেক অমুসলিম স্কলারদের কাছে তিনি একজন র‍্যাডিকাল ট্র্যাডিশনাল মোল্লার অধিক কিছু নন।

ইউসুফ আল-কারাদাওয়ীর সব মতের সাথে আপনাকে একমত হতে হবে এমন নয়। তিনি নিজেও সেটা চাননি। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সব মতের সাথে একমত নই। কিন্তু তাঁর কথাকে এবং ইজতিহাদকে না বুঝে এবং অনেক সময় অন্যের কথার উপর নির্ভর করে মানুষ তাঁকে অপবাদ দিয়েছে। তাঁর ভুলগুলোকে জ্ঞান দিয়ে বিচার না করে লোকেরা নিজ নিজ পক্ষ ও দলীয় অবস্থানের আলোকে বিচার করেছে।

আল-কারাদাওয়ী নিজে গণ্ডিবদ্ধ থাকার মতো মানুষ নন। এভাবে পক্ষভুক্ত হয়ে থাকার অনেক উপরে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ও অবস্থান। কখনো তাঁর ফতোয়া আপনার কাছে খুবই লিবারেল মনে হবে। আবার কখনো তিনি অত্যন্ত র‍্যাডিকেল। প্রতিটি ইস্যু তাঁর কাছে একটি নতুন রিসার্চের সম্ভাবনা। মানুষের আশা বা আশঙ্কার উপর ভর করে তিনি মত দেন না। তিনি তাঁর রিসার্চ অনুযায়ী কথা বলেন।

একজন মানুষের অবস্থান বুঝতে হলে তার মৌলিক লেখাতেই ফিরে যেতে হবে। আল-কারাদাওয়ী তাঁর নিজের ফিলোসফি নিয়ে বহু বইতে লিখেছেন। তাঁর উসূল বা মৌলিক অবস্থান বোঝাতে গিয়ে তিনি এটাই বলেছেন যে তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ে ইসলামিক চিন্তাকে তিনটি দলে ভাগ করা যায়।

প্রথমটি হলো আয-যাহিরিয়্যাহ আল-জুদুদ (নব্য আক্ষরিকতাবাদী)। এরা সেই দল যারা কোরআন ও হাদীসের আক্ষরিক জ্ঞানকে কাজে লাগাতে গিয়ে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা, স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞানকে বিসর্জন দিয়েছেন। এদেরকে নব্য আক্ষরিকতাবাদী বলা হচ্ছে। কেননা, পূর্বে যাহিরী নামে একটি মাযহাব ছিলো যাদের তিনি পুরোনো আক্ষরিকতাবাদী বলছেন। যার পুরোধা ছিলেন ইমাম ইবনে হাযম। ইবনে হাযম কিন্তু নব্য আক্ষরিকতাবাদীদের মতো এত গোঁড়া ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব আক্ষরিকতাবাদের মধ্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক জিনিয়াসের ছোঁয়া আমরা পাই। 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে তিনি তাঁর আক্ষরিকতাবাদী মাযহাবের পক্ষে বহু বুদ্ধিবৃত্তিক সাফাই দিয়েছেন। মজাটা এখানেই। এত বুদ্ধি তিনি খরচ করেছেন এটা বোঝাতে যে কোরআন-হাদীস বুঝতে বেশি বুদ্ধি খরচ করার দরকার নেই।

দ্বিতীয়টি হলো আল-মুয়াত্তিলাহ আল-জুদুদ (নব্য বিসর্জনবাদী)। পুরোনো বিসর্জনবাদীদের চিন্তাভাবনা কিছু বিশ্বাসগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিলো। তারা আল্লাহর কিছু নাম ও গুণাবলিকে (যা কোরআন-হাদীসে রয়েছে) অস্বীকার করতো, বিসর্জন দিতো। তাদের ধারণা ছিলো, এসব নাম ও গুণাবলি স্বীকার করলে আল্লাহর এককত্বকে অস্বীকার করা হয়। এ যুক্তির ভুলটা নিয়ে আলোচনা করার স্কোপ এখানে নেই। ঐতিহাসিকভাবে তারা টেকেওনি। কিন্তু আল-কারাদাওয়ী যে নব্য বিসর্জনবাদীদের কথা বলছেন তাদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। এরা কোরআন ও সুন্নাহকে বিসর্জন দিয়ে কেবল নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে ইসলামকে দাঁড় করাতে চায়। তারা সবসময় যে কোরআন হাদীসকে বাদ দেয়ার কথা বলেছে, তা নয়। যখন কোরআন-হাদীসের কোনো ভাষ্য বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রাখছে তখন তারা বরং খুশি। কিন্তু যখনই কোরআন-হাদীসের কোনো স্পষ্ট নিরেট ভাষ্য তাদের বুদ্ধির

বিরুদ্ধে যায় তখনই তারা বুদ্ধির আদালতে কোরআন হাদীসকে বিবাদীর কাঠগড়ায় খাড়া করিয়ে দেয়। এ দলের কথা শুনলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে কোরআন হাদীস আসলে এক দুধভাত জিনিস, থাকা না থাকা সমান, বুদ্ধি দিয়ে এমনিতেই কোনটা ঠিক-বেঠিক তা ঠিক করে ফেলা যাবে। সন্দেহ নেই পশ্চিমা নীতিনির্ধারকরা এই ইসলামকেই সঠিক ইসলাম বা গুড ইসলাম মনে করেন। যেন কোনটা ভালো ইসলাম আর কোনটা খারাপ ইসলাম, এটা মুসলিমদের অন্যের কাছে বুঝে নিতে হবে।

তৃতীয় দলটি — যা ইউসুফ আল-কারাদাওয়ী (ও আমাদের) সমর্থিত দল — হলো মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী দল। যারা কোরআন-হাদীসের জ্ঞানের সাথে কম্প্রোমাইজ যেমন করতে চান না, একইভাবে নিজেদের বুদ্ধিকেও বন্ধক রাখতে চান না। বরং কোরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান যদি সঠিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বোঝা যায় তাহলেই সত্যের সন্ধান মিলবে বলে তারা মনে করেন। উলামাদের মতে, “আল-নাকলুস-সাহীহ লা ইউয়ারিদুল আকলুস সারীহ”। এ প্রিন্সিপলের অর্থ হলো— যদি কোরআন বা হাদীসের টেক্সট সঠিক হয়ে থাকে, আর এটা বোঝার জন্য যে বুদ্ধিকে কাজে লাগানো হয়েছে তা যদি পরিষ্কার এবং ত্রুটিমুক্ত হয়ে থাকে; তাহলে এ দুয়ের মাঝে ফান্ডামেন্টালি কোনো সংঘর্ষ হতে পারে না। যেহেতু দুটিই আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ত্রুটিমুক্ত। কোনো আপাত সন্দেহ যদি দেখা দেয় তাহলে দুটো সমস্যার যে কোনো একটি বা দুটোই হয়ে থাকতে পারে— হয় কোরআন বা হাদীসের যে টেক্সটটি আলোচ্য সেটি সঠিক নয় (অর্থাৎ অথেন্টিক বা সহীহ নয় অথবা ভুলভাবে কোট করা হয়েছে), অথবা কোরআন-হাদীসের টেক্সটটি বোঝার জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে গোলযোগ রয়েছে, অথবা দুটোই।

যে কেউ তাড়াহুড়ো করে মত না দিয়ে যদি একটু চিন্তাভাবনা করেন, তাহলে বুঝবেন এই চ্যালেঞ্জটা খুব সহজ নয়। একই সাথে যেমন বুঝতে হবে কোরআন-হাদীসের টেক্সট সঠিক বা অথেন্টিক কিনা বা সঠিকভাবে কোট করা হয়েছে কিনা; ঠিক তেমনি আমাদের বুদ্ধি ব্যবহারে কোনো ঘাটতি থেকে যাচ্ছে কিনা সেটাও নির্ধারণ করা দরকার। এজন্য দরকার নিরলস জ্ঞানচর্চা, বিনম্রতা, নিজের চিন্তাকে যাচাই করার ক্ষমতা ও চিন্তাকে দলবাজিতা থেকে মুক্ত রাখার ক্ষমতা। দলবাজি করা এবং অন্যকে গালিগালাজ করা, টিটকারি দেয়া, দলবল নিয়ে কারো চিন্তাকে মাত করার চেষ্টা করা – এসবই অলস লোকের লক্ষণ; যারা সত্যকে বোঝার জন্য কষ্ট করতে চায় না, কিন্তু সত্যকে নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি বানাতে চায় ঠিকই।

আল্লাহ ইউসুফ আল-কারাদাওয়ীকে আরও হায়াত দিন, তাঁকে ভালো রাখুন দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ আমাদের শক্তি দিন যেন এই ইমামের মতো আমরাও কোরআন-হাদীসের প্রতি কমিটমেন্ট বজায় রেখেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা চালিয়ে যেতে পারি। আমাদের নিয়তের ব্যাপারে আমরা কাউকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। আমাদের পড়াশোনা ও চিন্তা আলোচনার টেবিলে আসুক এবং গৃহীত বা বর্জিত হোক।

অধ্যায় ২

ইসলামের সাথে যুক্তি ও দর্শনের সম্পর্ক

যুক্তি পছন্দ নয়? কী করবেন, যুক্তি থেকে তো মুক্তি নাই...

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

এক যুক্তি দিয়ে আরেক যুক্তিকে খণ্ডন করা যায়। কিন্তু, বিষয় যা-ই হোক না কেন, যুক্তির অপরিহার্যতাকে আপনি কোনোভাবেই খণ্ডন করতে পারবেন না। এমনকি, যদি তা পারেনও, তাতে করেও যুক্তি প্রক্রিয়ার কোনো অসুবিধা নাই। কেননা, যুক্তির 'অসারতা' প্রমাণের জন্য আপনি তো যুক্তিকেই ব্যবহার করলেন! সেজন্যই 'মুক্তবুদ্ধি চর্চা কেন্দ্র'র শ্লোগান ঠিক করেছি– 'যুক্তির বাইরে কিছু নয়, বুদ্ধির অনুকূলে আমরা সর্বদা'।

ব্যাপারটা মজার কিংবা মর্মান্তিক, যুক্তি শুধু উন্নততর যুক্তি দিয়েই খণ্ডিত হতে পারে।

আমরা জানি, সত্য আর মিথ্যার সম্পর্ক হলো সমতলধর্মী বা horizontal। হয়তো সত্য হবে, না হয় মিথ্যা হবে। এরা পরস্পরকে রিপ্লেস করে। অন্যদিকে উত্থাপিত যুক্তির সাথে পাল্টা যুক্তির সম্পর্ক হলো ক্রমসোপানমূলক বা hierarchical। একইসাথে সব যুক্তি বিদ্যমান থাকতে পারে। ব্যাপার হলো, সব যুক্তি মানসম্মত বা ভালো নয়। কিছু যুক্তি নিম্নমানের। কিছু যুক্তি উচ্চমানের। এনটায়ার লজিকে তাই সত্য-মিথ্যা না বলে সব সময়ে বলা হয়, বৈধ যুক্তি বা অবৈধ যুক্তি, ভালো যুক্তি অথবা খারাপ যুক্তি, শক্তিশালী যুক্তি কিংবা দুর্বল যুক্তি।

'ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন?' শিরোনামে আমার একটি ফেইসবুক পোস্টে একজন পাঠক মন্তব্য করেছেন, "without logic Allah Is God & Creator of the world."

উত্তরে আমি লিখেছি: আপনি বলছেন লজিক ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা। হ্যাঁ, আপনার কথা একশ ভাগ সঠিক। আল্লাহ তায়ালার কাছে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা হওয়ার জন্য কোনো মানুষের স্বীকৃতি পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টা অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। এটা সত্য।

কিন্তু আল্লাহর দিক থেকে আল্লাহ কেমন হতে পারেন তা নিয়ে আপনি আমি কেন মাথা ঘামাবো? আমরা মূলত নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই সমস্যাগ্রস্ত ও চিন্তিত। আমাদের মধ্যে চিন্তা আসে— আমরা কোথা থেকে এলাম? এই জগৎ কোথা থেকে এলো? এই জগতের সাথে আমাদের প্রকৃত ও ন্যায্য সম্পর্ক কী? শুরু কোত্থেকে? এসব কিছুর শেষ কোথায়?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমরা চিন্তিত। আল কোরআন আমাদের এই প্রশ্নগুলোরই এক রকম উত্তর দেয়। যাকে আমরা সংক্ষেপে ইসলাম হিসেবে জানি। তাই তো?

এবার আসেন আল-কোরআনে এসব বিষয়ে কী বলা হয়েছে, কেমন করে বলা হয়েছে, সেদিকে একটু লক্ষ করি। আমরা দেখি, আল কোরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ তায়ালা নানা বিষয়ে যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে গেছেন। আপনি জানেন, কোরআনের অধিকাংশ সূরা ও আয়াত হলো মক্কী যুগের। সেইসব সূরা ও আয়াতসমূহে কোন কোন বিষয়ে কী কী বলা হয়েছে, কীভাবে বলা হয়েছে, একটু স্মরণ করেন।

তাহলেই বুঝবেন, ইসলামের সাথে যুক্তির সম্পর্ক কী বা কতটুকু। আমি শুধু আপনাকে এ বিষয়ে চিন্তা করার পথ বাতলে দিলাম। সাথে এতটুকুও মনে রাখবেন— যখন বলবেন, 'যুক্তির দরকার নাই', তখন আপনাকে অথবা যিনি এমনটা বলবেন তাকে কোনো না কোনো যুক্তি দিয়েই বলতে হবে কেন তিনি মনে করছেন, যুক্তির দরকার নাই। তাহলে দিনশেষে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো?

মন্তব্য ও প্রতিমন্তব্য

Rafsan Munsi: যুক্তির কি সীমাবদ্ধতা আছে? থাকলে সেটার দৌড় কতটুকু?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** ধরে নিলাম, যুক্তির সীমাবদ্ধতা আছে। তাই এককভাবে যুক্তির উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। যুক্তির সীমাবদ্ধতা দেখানোর জন্য তো যুক্তিই দাঁড় করানো হলো। তাহলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ালো?

রুপক ইবরাহীম: যুক্তির দৃষ্টি দিয়ে একটা কল্পনাকে বাস্তবতায় রূপ দেয়া যাক। ধরা যাক, একটা সাপ তার নিজের লেজ হতে শুরু করে তার কোমর, এরপর তার পেট, এরপর তার গলা গিলতে গিলতে শেষে এসে তার মাথা পর্যন্ত পৌঁছালো। কিন্তু সাপটা নাছোড়বান্দা। সে ঠিক করলো, আজ সে তার পুরোটা গিলে খাবে।

এবার প্রথম থেকে প্যারাটা আরেকবার পড়ুন। তারপর কল্পনায় একে একটা ভিডিও চিত্রে রূপ দিন। ভাবুন, আপনি সাপের গিলে খাবার মুহূর্তটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন। এবং আমাকে জানান যে আপনি কতটুকু পর্যন্ত সেই কল্পিত চিত্রটাকে যুক্তির মাধ্যমে দেখতে পেলেন? সেই গলা পর্যন্তই এসে আপনি থেমে যাবেন। আপনার কল্পনায় জন্ম নেয়া সেই ভিডিও চিত্রটি সেখানেই অন্ধকারে রূপ নিবে। অথচ কী আশ্চর্য, আমরা কল্পনায় চাইলে মহাকাশ ভেদ করে সাত আসমানে চলে যেতে পারবো কোনো রকম যুক্তিবিদ্যা ছাড়াই! অথচ সাপের গিলে খাবার মুহূর্তটাকে যুক্তি দিয়েও আমরা আর কল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। তখন প্রশ্নটা এমন দাঁড়াবে, সে যা গিলবে সেটাই তো তার মুখ তাহলে কোন মুখ দিয়ে তা গিলবে? এটাই হলো যুক্তির সীমাবদ্ধতা। এবং কল্পনারও। অতএব, যুক্তি উভয় প্রক্রিয়ায় হেরে গেল। এবং সে নিজেকে নিজেই হারালো।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যুক্তির সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নেয়াটা তো যুক্তিরই দাবি। তাই না? যুক্তি বিরোধিতার সমস্যাটা এখানেই। পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে যুক্তির দিকে ঠেলে দেয়। কারণ, পর্যবেক্ষণের রয়েছে সীমাবদ্ধতা। যুক্তি সে তুলনায় বৃহত্তর পরিসরের। কিন্তু যুক্তিরও রয়েছে সীমাবদ্ধতা। সে তুলনায় কল্পনার অবকাশ অনেক বেশি। যুক্তির মিশেলে বা সমর্থনে যে কল্পনা, তাকে আমরা বলি বিশ্বাস। বিশ্বাসের সমর্থনে যে যুক্তিকে সেট করা হয় তা যদি দুর্বল হয়, তখন বিশ্বাসটা ভুল হবে।

পর্যবেক্ষণ, যুক্তি ও কল্পনা— এসব কিছুরই নিজস্ব ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে। বিশ্বাস হলো এসব সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। তাই, বিশ্বাসটা সঠিক হওয়া জরুরি।

Umme Kawsar: যুক্তির সীমানা মানুষের জানা পর্যন্তই সীমিত। এটি আল্লাহর জন্য নয়। মানুষ ০.৫%-এর বেশি এখনও জানে না। সুতরাং, যুক্তির দোহাই আমরা সব ক্ষেত্রে দিতে পারি না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: এই যে আপনি যুক্তি দিয়ে বললেন, "মানুষ ০.৫%-

এর বেশি এখনও জানে না। সুতরাং...।” শেষ পর্যন্ত কি যুক্তির বাইরে যেতে পারলেন?

Umme Kawsar: আমি তো তাই বলেছি। যুক্তির লিমিটেশনের কথাই তো বললাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যুক্তির সীমাবদ্ধতা আছে, এই যুক্তিতে আমাদের উচিত যুক্তির উপর এককভাবে নির্ভর না করা। এই যে কথাগুলো আমি বললাম, আপনি খুব সম্ভবত এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন। তা যদি হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি কি যুক্তির বাইরে যেতে পারলেন?

আবার খেয়াল করেন। “যুক্তির সীমাবদ্ধতা আছে, এই যুক্তিতে আমাদের উচিত যুক্তির উপর এককভাবে নির্ভর না করা।” – এইটুকু নিজেই একটা যুক্তি নয় কি?

সেই জন্যই বলেছি, যুক্তির মধ্যে আছে ভালো যুক্তি, খারাপ যুক্তি, শক্তিশালী যুক্তি, দুর্বল যুক্তি, বৈধ যুক্তি আর অবৈধ যুক্তি। যুক্তির মোকাবিলায় যুক্তি ছাড়া কিছু নাই। হতে পারে না।

যদি বলেন, যুক্তি বনাম যুক্তি ছাড়া আর কিছু। আমি কখনোই ‘যুক্তি ছাড়া আর কিছু’র পক্ষে যাবো না। যারা যুক্তিবিরোধী, আমি তাদের বিরোধী।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সিঁড়ি বা লিফট দিয়ে আমি ছাদে উঠলাম। সেখান হতে হেলিকপ্টারে করে আকাশে উড়লাম। তো, লিফট আমাকে আকাশে ওড়াতে পারে না। তাই বলে কি আমি বলতে পারি, সিঁড়ি বা লিফটের দরকার নাই? যুক্তিটা হচ্ছে সিঁড়ি। আর বিশ্বাস হচ্ছে কপ্টার।

একটার পরিবর্তে আরেকটা হলো এক ধরনের সমতলধর্মী সম্পর্ক। মনে করেন, একটা চেয়ার আছে। সেখানে আপনি বসবেন। অথবা, আমি বসবো। এটা হলো সমতলধর্মী পারস্পরিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য। অথবা, হতে পারে, উপরে একটা আসন। আর নিচে একটা আসন। ট্রেনের স্লিপিং বার্থের মতো। তাতে করে দুজন উপরে নিচে অবস্থান নিয়ে একই কক্ষে একই সাথে ভ্রমণ করতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের সম্পর্ক হলো ক্রমসোপানমূলক সম্পর্ক।

যুক্তি আর বিশ্বাসের সম্পর্ক ক্রমসোপানমূলক। বিশ্বাসের মধ্যে আছে যুক্তি। আর যুক্তির মধ্যে থাকে বিশ্বাস। এই দুটোর সম্পর্ক নন-বাইনারি, রেসিপ্রোকাল।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে কেউ একজন ‘ডিম আগে না মুরগি আগে’ ডিলেমাটি নিয়ে এসেছেন। উনাকে বলেছি—

‘ডিম আগে না মুরগি আগে’— এই সমস্যা সমাধান করতে পারছি না বিধায় আমরা মনে করতে পারি: (১) ডিম আগে, কেননা...। অথবা, আমরা মনে করতে পারি: (২) মুরগী আগে। কারণ...। অথবা, আমরা এও মনে করতে পারি: (৩) এটি কোনো সমস্যাই নয় বা এর কোনো উত্তর নাই। এই তিনটা ‘উত্তর’ই ভুল।

ডিম আগে? না, মুরগি আগে?— এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে: এ বিষয়টা আমাদের জ্ঞানের আওতার বাহিরে। অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞান যতটুকু পর্যন্ত জানতে পারে এটি তার অতিবর্তী বা beyond-এ।

সসীম সত্তা হওয়ার কারণে আমরা সবকিছু জানতে পারি না। তাই আমাদের অজানা বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য আমরা নির্ভরযোগ্য কাউকে খুঁজবো। এরপর তিনি বা সেই কর্তৃপক্ষ যা বলবে তা-ই আমরা মেনে নেব। যেমন করে আমরা বিশেষজ্ঞদের কথা চোখ বুঁজে মেনে নিই।

আমরা যুক্তির সহায়তায় এভাবে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ত্রুটি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করি। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে বিজ্ঞান কিংবা ধর্ম পর্যন্ত সব বিষয়েই আমরা এই মেথডলজি অনুসরণ করি। ব্যাপারটা সিম্পল— “না জানলে যিনি জানেন তার কাছ হতে জেনে নাও।”

Shamim Ahsan: আমি এবং আমরা বেঁচে থাকব কি থাকব না— এটার পিছনে যুক্তি কী?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** যুক্তি হলো জ্ঞানের হাতিয়ার। আর জ্ঞান হলো প্রত্যেক সত্তার নিজ নিজ সামর্থের ব্যাপার। কেউই সামর্থের বাইরে জ্ঞানার্জন করতে পারে না। তাই সব যুক্তি দেওয়া হলেও আপনি সব যুক্তি ধারণ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার ধারণাতীত যুক্তিকে আপনি যুক্তি নয় বলে মনে করবেন। সেজন্য যুক্তির দাবি হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ or higher authority-কে স্বীকার করে নেওয়া। যেমন আপনার প্রশ্নটা। আমাদের এই জীবন ও জগতের থাকা না-থাকার যুক্তি কী— সেটা আমরা জানি না। তার মানে এই নয়, এটার কোনো যুক্তি নাই। বরং আমাদের সত্তাগত সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা এইসব বা এই ধরনের বিষয়গুলোর সঠিক জ্ঞান যুক্তিতে ধারণ করতে পারি না। সে জন্য এসব বিষয়ে এনগেইজ হওয়া আমাদের জন্য category mistake।

Shamim Ahsan: স্যার, অব্যশই আমি এটা বিশ্বাস করি। আমি শিখবো। আমার একটা concept যুক্তি আমাদের চিন্তা-চেতনার পরিধির উপর নির্ভর করে!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমাদের চিন্তা-চেতনা তথা আমাদের জ্ঞানের যে সীমাবদ্ধতা সেটা বুঝতে পারাটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার। যুক্তির সীমাবদ্ধতা যে আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি, স্বীকার করি, তাতে আমাদের কোনো ডিসক্রেডিট নাই। বরং, নিজের অজ্ঞতাকে গায়ের জোরে অস্বীকার করা হলো গোঁয়ার্তুমি ও অন্ধবিশ্বাস। বিজ্ঞানবাদীরা যা করে।

Sheikh A Ahmed: আমি যুক্তির পক্ষের মানুষ, কিন্তু 'যুক্তিতেই মুক্তি মিলবে' এই প্রবচনে খুব বেশি বিশ্বাস রাখতে পারি না। কেন পারি না তার একটি উদাহরণ দিয়ে পরিস্কার করছি।

৪০ বছর বয়সে আবিষ্কার করলেন আপনার মাথার একটা চুল পেকে গেছে। এখন বলুন দেখি ৮০ বছর বয়সে কটা চুল পাকবে?

কিংবা পদ্মা সেতুর একটি স্প্যান বসে গেছে এবং ৫১ পার্সেন্ট কাজ শেষ হয়ে গেছে। যুক্তি দিয়ে বললে দুটো স্প্যান বসলে তো সেতুর কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা!

আমি বিশ্বাস করি 'মুক্তি', যাকে আমরা ইসলামী পরিভাষায় 'হেদায়াত' বলি, সেটা গডের পক্ষ থেকে একটি গিফট। এটা গড যাকে খুশি তাকে দেন। তিনি কেন এই গিফট রামকে না দিয়ে রহীমকে দিলেন এটা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা বেশ কঠিন বটে।

তবে তারপরেও বলবো যুক্তির অনুশীলন আমাদের ভীষণ দরকার। কেননা, কেবল যুক্তি দিয়েই আমি বুঝতে পারবো আমার সীমাবদ্ধতা কোথায়। আমার নিজস্ব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বুঝে আসার পরেই আমি উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারস্থ হবো এবং নিজেকে সমর্পণ করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারব। হেদায়েতের যোগ্য হবার জন্য সেটাও একটা পূর্বশর্ত বটে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ৪০ বছর বয়সে আপনার যতগুলো চুল পেকেছে ৮০ বছর বয়সে সে তুলনায় কতগুলো চুল পাকবে সেটা পর্যবেক্ষণের ব্যাপার, যুক্তির ব্যাপার নয়। তবে যুক্তি বলবে, আপনি যদি আরো ৪০ বছর বেঁচে থাকেন অর্থাৎ ১২০ বছর বেঁচে থাকেন তবে সেই বয়সে বা তখন ডেফিনেটলি

আপনার সব চুলগুলো পেকে যাবে। যুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে আপনার মতো সবাইকেই কোনো না কোনো যুক্তির আশ্রয়ই শেষ পর্যন্ত নিতে হয়। যদিও সেগুলো হতে পারে ভুল যুক্তি কিংবা দুর্বল যুক্তি। যুক্তি বলতে কী বোঝায় সেটা না বোঝাটাও অন্যতম যুক্তির সমস্যা। কিছু মনে করবেন না আশা করি।

Sheikh A Ahmed: আমি তো শুরুই করলাম যে আমি যুক্তির পক্ষের মানুষ। যুক্তির বিরোধিতা করলাম কোথায়? যুক্তিতে মুক্তি মিলবে ধারণাটা যে সর্বাংশে সত্য নয় সেই বিষয়ে আমি আলোকপাত করেছি মাত্র। আমার মন্তব্য শেষ না হতেই যুক্তি ছেড়ে দিলেন! যুক্তিবাদী আজ লাঠি-বল্লম-সড়কি সব নিয়ে মাঠে নেমেছে। সবাই সাবধান। হা হা।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সময় মিলাইয়া দেখেন। আপনার কথা শেষ হওয়ার পরই তো আমি মন্তব্য করলাম।

Sheikh A Ahmed: ধন্যবাদ। আমি আপনার প্রস্তাবিত শ্লোগানের মধ্যে কিঞ্চিত দুর্বলতা খুঁজে পাচ্ছি।

"যুক্তির বাইরে কিছু নয়, বুদ্ধির অনুকূলে সর্বদা।"

স্লোগানের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আমার আপত্তি আছে। কোনো কিছু যদি বুদ্ধির অনুকূলে না হয় তাহলে কি করবেন, ফেলে দিবেন? নবী মূসা (আ.) ও খিযিরের (আ.) ঘটনায় যে বালকটিকে কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করলেন বলে কোরআনে উল্লেখিত আছে তা কীভাবে বুদ্ধির অনুকূলে যায়! এটাকে ব্যাখ্যা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই beyond বোধির দ্বারস্থ হতে হবে। যা সাধারণের বুদ্ধির অনুকূলে নয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: একজনের জন্য যা বুদ্ধির অনুকূলে অন্যজনের জন্য তা অনুকূল নাও হতে পারে। এর কারণ হলো, এই দুইজনের সত্তাগত কিংবা ক্ষমতার পার্থক্য। খিজির (আ.) যতটুকু জানতেন সে আলোকে উনি যা করেছেন তা উনার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। সঠিক কারণ না জানার কারণে মুসার (আ.) কাছে একই বিষয় অযৌক্তিক মনে হয়েছে। অতএব, ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো, যেটা আমরা জানি না, প্রয়োজন না থাকলে অযথা সেটা জানার চেষ্টা করবো না। আমরা জানি না অথচ আমাদের জানা প্রয়োজন, ব্যাপারটা যদি এমন হয় তাহলে আমাদের উচিত জানার চেষ্টা করা। কিন্তু ব্যাপারটা যদি এমন হয়— আমরা জানি না অথচ জানা দরকার, কিন্তু জানার

চেষ্টা করার সময় বা সামর্থ্য আমাদের নাই; তখন আমাদের উচিত এ বিষয়ে কেউ জানে কি না, তা জানার চেষ্টা করা এবং তেমন নির্ভরযোগ্য কারো উপরে সংশ্লিষ্ট বিষয় ভরসা করা। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় এটাকে বলে testimonial knowledge। ঘটনাক্রমে আগামীকাল সাড়ে **১১**টায় এ বিষয়ে আমি একটা ক্লাস নেবো। ডেভিড হিউমের empiricism-এর সাথে testimony'র সম্পর্কের উপরে। ফেসবুকে 'দর্শন, যুক্তি ও জীবন' নামে আমার একটা পেইজ আছে। সেখানে গতকাল এ বিষয়ে **১২** মিনিটের একটা ভিডিও আপ করেছি। সময় থাকলে চেক করে দেখতে পারেন।

বিশেষজ্ঞের উপর ভরসা করা আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি দাবি।

Sheikh A Ahmed: চমৎকার বলেছেন। আমি নিশ্চয়ই আপনার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করছি। কারণ, এটাই আপনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল যে বিভিন্ন বিষয়ে লোকজন কথা বলবে, প্রশ্ন করবে, ইস্যু তুলে আনবে এবং সবাই মিলে আলোচনা করবে। এটা যারা পড়বে তাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু উপকৃত হবে। যেমন আমি নিজেও উপকৃত হচ্ছি।

যুক্তিবুদ্ধির ব্যবহার নিয়ে ইসলামপন্থীদের স্ববিরোধিতা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

যুক্তিবুদ্ধির ব্যবহার নিয়ে ইসলামপন্থীদের মধ্যে অদ্ভুত সব স্ববিরোধিতা কাজ করে। একদিকে তারা মনে করেন ইসলাম হলো যুক্তিবুদ্ধির একমাত্র দাবি। অথচ, তারাই আবার মনে করেন, বিশ্বাস এবং যুক্তিবুদ্ধি পরস্পরবিরোধী দুটি ব্যাপার! ঈমানের সাথে যেন যুক্তিবুদ্ধির কোনো ইতিবাচক সম্পর্ক নাই। যুক্তি দিয়ে ঈমান আনলে যেন সেটা ঈমানের দুর্বলতার পরিচয়!

এ কাজে তারা দুটি ঘটনাকে 'যুক্তি' বা দলীল হিসেবে পেশ করেন।

ইবলিশ আল্লাহর কাছে যুক্তি পেশ করেছিল। সেজন্য তারা আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে যুক্তি উপস্থাপনকে খুব খারাপ মনে করে। অথচ আমরা দেখি, বিভিন্ন নবী-রাসূল আল্লাহর সাথে 'তর্ক' করেছেন, প্রশ্ন করেছেন, যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দানে আল্লাহর ক্ষমতা নিয়ে ইবরাহীমের (আ.) জানতে চাওয়া, যাকে আমরা পাখি সংক্রান্ত ঘটনা হিসাবে জানি; কিংবা, মৃতকে জীবিত করা নিয়ে উযাইরের (আ.) সাথে আল্লাহ তায়ালার সওয়াল-জবাব ইত্যাদি ঘটনা স্বয়ং কোরআন হতেই আমরা জানতে পারি। সাহাবীদের সাথে আল্লাহর রাসূলের (সা.), যাকে আমরা বলি ফেয়ার ডিবেট, সে ধরনের 'তর্ক-বিতর্ক' ও যুক্তি উপস্থাপনের অনেক নজির আমরা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থগুলোতে পেয়ে থাকি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তো বিরোধীদের সাথে সুন্দরতর উপায়ে বিতর্ক করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "তাদের সাথে তোমরা বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়।"

আল্লাহর সাথে ইবলিশের যুক্তি উপস্থাপনটা পদ্ধতিগতভাবে ভুল ছিল। অধীনস্ত হিসেবে যুক্তি উপস্থাপন এবং সমকক্ষ হিসেবে যুক্তি উপস্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। থাকাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সব শুদ্ধতার পরম মানদণ্ড, তাই তাঁর হুকুমকে মেনে নেয়াই যুক্তিবুদ্ধির একমাত্র দাবি। দেখুন, মানুষ সৃষ্টির সময় আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের যুক্তিতর্ক শুনেছেন এবং কেন তাদের যুক্তি বা আশংকা ভুল তা বলেছেন। তারমানে, মানুষ সৃষ্টির আগে এমনকি ফেরেশতারাও আল্লাহর কাছে তাদের বুঝজ্ঞান মোতাবেক যুক্তি উপস্থাপন করতো। ফেরেশতাদের যুক্তি প্রক্রিয়া ছিল সঠিক পদ্ধতির।

হযরত আলীর (রা.) একটা কথাকেও যুক্তি ও স্বাধীন জ্ঞানচর্চার বিপক্ষ দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেছেন, শরিয়ত যদি মানুষের যুক্তির উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা হতো তাহলে তায়াম্মুমে পা মাসেহ করার মাসয়ালা অন্যরকম হতো। অর্থাৎ পায়ের উপরের অংশ না মুছে পায়ের তলা মুছতে বলা হতো। যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধীদের দাবি অনুসারে, ময়লা লাগে পায়ের তলায়। তাই মুছতে হলে পায়ের তলাতেই মাসেহ করা যুক্তিসঙ্গত।

এখানে তারা পবিত্রতাকে বা তাহারাতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। পবিত্রতা এক জিনিস আর পরিচ্ছন্নতা ভিন্ন জিনিস। পবিত্রতার মধ্যে কিছুটা পরিচ্ছন্নতা থাকলেও পবিত্রতার ধারণা হলো খোদা কর্তৃক আরোপিত। প্রত্যেক অথরিটিই নিজের মতো করে কিছু ফরমালিটি আরোপ করে থাকে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নির্ধারিত ফরমালিটিগুলোকে আমরা রিচুয়্যাল বা ইবাদত বলে থাকি।

খোদা তায়ালা যেভাবে করতে বলেছেন সেভাবেই আমাদের সেসব করতে হবে। এটাই যুক্তিবুদ্ধির দাবি। যে বিষয়ে আমরা জানি না, সে বিষয়ে সব সময়ই আমরা সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করি। ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের এই অনিবার্যতা নিয়েই আমাদের জগৎ ও জীবনের পথ চলা। ঊর্ধ্বতনের কাছে আপনি যুক্তি উপস্থাপন করতে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনাকে ঊর্ধ্বতনের হুকুমকেই মেনে চলতে হয়। নচেৎ 'ঊর্ধ্বতন-অধস্তনের সম্পর্ক' আর বহাল থাকে না। দ্বিরুক্তি করে বললে, নিজেকে অধস্তন হিসাবে স্বীকার করার পরে ঊর্ধ্বতনের পক্ষ থেকে আসা নির্দেশ-নির্দেশনাকে অমান্য করা হলো নিজেরই যুক্তিবুদ্ধির বিরোধিতা করা। কী বলেন? আমি কি ভুল বললাম?

যদিও অপবিত্রতার গোসল আর গোসলের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জন এক নয়,

তৎসত্ত্বেও যদি আমরা পানি দিয়ে গোসল করাকে পবিত্রতার স্ট্যান্ডার্ড বলে মনে করি, তাহলে তো তায়াম্মুমের পুরো বিষয়টাই বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তো পায়ের উপরে মোছাও যা, নিচে মোছাও তা। দুটোই বাতিল হওয়ার কথা।

কথা হলো, যেসব বিষয়কে আমাদের মানবিক বিবেচনায় চিন্তা, যুক্তি ও জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বিষয় বলে মনে করি; সে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কি আমরা নিজেদের মানবিক বিবেচনা তথা চিন্তা, যুক্তি ও জ্ঞানকে পরিহার করি? নাকি, সেগুলোর ভিত্তিতে আমরা নিজেদের সীমিত মানবিক বিবেচনাপ্রসূত চিন্তা, যুক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জনের জন্য সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পরবর্তী স্তরের দিকে অগ্রসর হই?

প্রচলিত প্রবল ভুল ধারণাগুলোর কারণে লক্ষ করে দেখেছি, লোকেরা কথাগুলো ঠিক বুঝে না। তাই কথাটা আবারো বলছি। আমাদের যুক্তি যখন আমাদেরকে বৃহত্তর বা ঊর্ধ্বতন কোনো অথরিটিকে গ্রহণ করে নিতে বলে, তখন যদি যুক্তিবুদ্ধির দাবি অনুসারে সেই ঊর্ধ্বতন সত্তাকে অথরিটি হিসাবে মেনে নেই, তখন আমরা কি আদৌ যুক্তিবুদ্ধির বিরোধিতা করলাম? নাকি, স্বীয় গাঠনিক সীমাবদ্ধতার চোরাগলিতে ঘুরপাক খাওয়ার পরিবর্তে সামনে এগিয়ে যাওয়ার বৌদ্ধিক দাবিকে মেনে নিলাম?

আসুন, নিজেদের মধ্যে অযথা তর্কবিতর্ক না করে নিজেরা খোলামনে ভাবতে থাকি।

মন্তব্য

Masudul Alam: ইসলামপন্থীদের যুক্তিতর্কের বিরোধিতার যুক্তি হিসেবে আপনি ইবলিশের ঘটনা এবং হযরত আলীর (রা.) রেফারেন্স দিয়েছেন। আমার ধারণা, উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আরো একটা কারণ কাজ করে।

আমাদের একটা প্রবাদ আছে: 'বিশ্বাসে মেলায় স্বর্গ/তর্কে বহুদূর।' উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মীয় সমাজে প্রবাদটা বেশ প্রচলিত। তবে আমার ধারণা, হিন্দু ধর্ম এখানকার আদিধর্ম হওয়ায়, আরো অন্য অনেক কিছুর মতো এই প্রবাদটাও মুসলমানরা সেখান থেকে ইনহেরিট করেছে।

সামগ্রিক বিবেচনায় নানামাত্রিক ইনকসিসটেন্সির কারণে হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের ‘যৌক্তিক’ হওয়ার সুযোগ নেই। ‘অন্ধ বিশ্বাস’ই তাদের অবলম্বন। আমার ধারণা, যুক্তির পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাসের যে তাত্ত্বিক বিপদ, তা অনুধাবন না করেই এখানকার মুসলমানরা অন্ধ বিশ্বাসকে বেছে নিয়েছে।

যুক্তিবুদ্ধির পক্ষে আল্লাহ তায়ালা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের ফকীহ বানিয়ে দেন।’ এখানে ফকীহ বলতে যা বুঝানো হয়েছে, হাদীসটি পড়ামাত্র এখনকার একজন মুসলিমের এ সম্পর্কে যে ধারণা হবে তা হতে ভিন্নতর। এখন যাদেরকে আমরা ইসলামী আইনশাস্ত্রের উপর পণ্ডিত তথা ফকীহ হিসেবে জানি, মহানবীর (সা.) জীবনকাল হতে শুরু করে পরবর্তী অন্তত একশ বছরেও ফকীহ বলতে তা বুঝানো হতো না। এখনকার সময়ে ফকীহ কথাটা একটা টার্ম হিসাবে গড়ে উঠেছে। আর তখনকার সময়ে ফকীহ কথাটাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হতো। তখন ফকীহ বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হতো, যিনি জীবন, জগৎ, সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তখনকার ফকীহ শব্দের মর্মার্থ ছিলো অধিকতর ফিলসফিক্যাল তথা তত্ত্বগত। এখনকার সময়ে ফকীহ শব্দের অধিকতর তাৎপর্য হলো আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কীয়।

একবার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববীতে ঢুকে দেখতে পেলেন, সাহাবাগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দু’পাশে বসেছেন। এক গ্রুপ জিকির করছিলেন। অপর গ্রুপ জ্ঞানচর্চা করছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমাকে শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই আমি আলাপ-আলোচনায় যারা নিয়োজিত তাদের সাথেই বসবো।

এভাবে হাদীস ও সীরাতে জ্ঞানচর্চার উপর কোন লেভেলে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে

তা যদি আমরা কম্পাইল করতে যাই তা একটা বিরাট ভলিউম হয়ে যাবে। এমনকি উপরের শিরোনামের অধীনে কোরআনের বাণীগুলোকে কম্পাইল শুরু করার পর আমরা বুঝতে পারি— যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করা সংক্রান্ত আয়াতগুলোর একটা পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রস্তুত করতে গেলে তা একটা বিরাট ভলিউমে পরিণত হবে। প্রত্যক্ষভাবে প্রায় সাড়ে ছয়শত কোরআনের আয়াতে যুক্তি-বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। যুক্তি-বুদ্ধির পক্ষে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে এমন আয়াতের সংখ্যা হবে সহস্রাধিক।

দীর্ঘকাল হতে মুসলমানরা প্রচলিত ফিকাহর যাঁতাকলে পড়ে ভুলেই গেছে, যুক্তি-বুদ্ধির যথাযথ চর্চা না থাকলে ইসলাম টিকবে না। যুক্তি-বুদ্ধিহীন অথচ আইন তথা শরীয়াহনির্ভর ইসলাম হলো দরজা, জানালা, দেয়াল, ফার্নিচার, ছাদ ও ফাউন্ডেশন ছাড়া একটা বিল্ডিংয়ের পিলারসর্বস্ব স্ট্রাকচারের মতো। ভারসাম্যপূর্ণ একটা জীবনব্যবস্থাকে যদি আমরা একটা সুস্থ মানবদেহের সাথে তুলনা করি, তাহলে মোটাদাগে বলতে পারি, আইনী বিধি-বিধানসমূহ হলো শরীরের অস্থি-কাঠামো তথা হাড়ের মতো। কংকাল যেমন শরীর নয়, তেমন করে শরীয়াহ মানেই ইসলাম নয়। আবার কংকাল ছাড়া যেমন শরীর অচল তেমন করে শরীয়াহ ছাড়া ইসলাম অসম্ভব।

সঙ্গত কারণেই আমরা এখানে কিছু আয়াতকে নমুনা হিসাবে পেশ করেছি। মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামভিত্তিক ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোতে প্রচলিত প্যাসিভ লার্নিং সিস্টেম তথা গুরুবাদী শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাবে সাধারণ মুসলমানরা মনে করে, ইসলামে যুক্তিবুদ্ধির বুঝিবা প্রচলন বা অনুমোদন নাই। যেন ওহীর জ্ঞান আছে, তাই মানবীয় জ্ঞানের দরকার নাই। ওহীর জ্ঞান বনাম মানবীয় জ্ঞান, এই যে একটা ফলস বাইনারি করা হচ্ছে, আমরা এর বিরোধী। এই সংকলনে আমরা দেখিয়েছি, ওহীর জ্ঞানেই মানবীয় জ্ঞানপদ্ধতির স্বীকৃতি প্রদান তো বটেই, বরং সেটার যথোচিত চর্চার কথা বারংবার বলা হয়েছে। আমরা জানি, ওহীর জ্ঞানে মানবীয় জ্ঞানের দোহাই দেয়া হয়েছে, মানবীয় জ্ঞানের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মানবীয় জ্ঞানের ভিত্তি, পদ্ধতি, পরিণতি ও পূর্ণতা হলো ওহীর জ্ঞান।

সোজা কথায়, জ্ঞানের প্রচলিত উৎস হিসাবে অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ ও সাক্ষ্য— এগুলোর স্বরূপ হলো স্বজ্ঞা বা ইন্টুইশন। আরবিতে যাকে বলা হয় ইলহাম। বলাবাহুল্য, ইলহাম হলো অপরিশীলিত বা অপূর্ণ ওহী। তারমানে, প্রত্যাদেশ বা ওহী হলো পারফেক্ট ইন্টুইশন। নবী-রাসূলদের ইন্টুইশন হলো ওহী। অতএব, ওহী

ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য গুণ ও মাত্রাগত। অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, সাক্ষ্য, স্বজ্ঞা ও ওহী—এটি ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের সর্বজনগ্রাহ্য কাঠামো। পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের উৎস নিয়ে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা হরাইজন্টাল বা ডাইকোটমিক। তারা বিতর্ক করে মূলত অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি, এতদুভয়ের কোনটি গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব এই দৃষ্টিতে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি ক্রমসোপানমূলক হায়ারার্কিক্যাল। মুসলমানরা এটি যত দ্রুত বুঝবে, তত দ্রুত তাদের ইমানসিপেশন ঘটবে। অন্যথায়, প্রতিক্রিয়াশীলতার ঘুরপাকেই তারা জীবন কাটাবে। তারা হতে পারবে না কৌশলী ও যোগ্য। এখন যা আছে তা-ই থেকে যাবে। সুখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান প্রজন্মের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার অধিকারী। তাদের জন্য এই সংকলন।

১। মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে থিংক-ট্যাঙ্ক সিস্টেম

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা (অসদাচরণ) থেকে বিরত হয়?

[সূরা তওবা: ১২২]

২। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সন্ধান করতে হবে অখণ্ড সত্যকে

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

আসলে তাদের বেশিরভাগ লোকই নিছক আন্দাজ-অনুমানের পেছনে চলছে। অথচ আন্দাজ-অনুমান দ্বারা সত্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র মেটে না। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

[সূরা ইউনুস: ৩৬]

৩। বুদ্ধি-বিযুক্ত কোনো কাজ সঠিক হতে পারে না

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউই ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না তাদের উপর কলুষতা চাপিয়ে দেন।
[সূরা ইউনুস: ১০০]

৪। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভের জন্য দেশ-বিদেশে সফর করতে হবে

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ - أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনা করেনি? আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে— সবকিছু সঠিক উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না।

আর এরা কি কখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণাম এরা দেখতে পেতো।
[সূরা আর-রুম: ৮-৯]

৫। কেবলমাত্র আনুগত্যশীল লোকেরাই অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে

تَبَارَكَ الَّذِى جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا - وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

অসীম বরকতসম্পন্ন তিনি, যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন।

তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষাগ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।
[সূরা ফোরকান: ৬১-৬২]

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ - وَمَآ أَنتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَن ضَلٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ

তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না, বধিরকেও তোমার আহ্বান শোনাতে পারবে না— (বিশেষত) যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আর অন্ধদেরকেও তুমি পথ দেখিয়ে বিপথগামী হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না। তুমি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতগুলোর উপর ঈমান আনে। অতঃপর তারাই মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী।

[সূরা নামল: ৮০-৮১]

৬। পাশবিক নয়, চাই মুক্তচিন্তার এক নান্দনিক মানবিক জীবন

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا - أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

কখনো কি তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো, যে তার নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিতে পারো?

তুমি কি মনে করো তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুর মতো, বরং তারও অধম।

[সূরা ফুরকান: ৪৩-৪৪]

৭। দলীল প্রমাণের গুরুত্ব

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

তারা বলে, ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না। এটি তাদের অবাস্তব আকাঙ্খা মাত্র। তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি তোমাদের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসো।

[সূরা বাকারা: ১১১]

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

যদি আকাশে ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ হতো, তাহলে (পৃথিবী ও আকাশ) উভয়ের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো। কাজেই এরা

যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

[সূরা আম্বিয়া: ২২]

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ - أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَٰلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ - أَمَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

... তোমরা সামান্যই চিন্তাভাবনা করে থাকো।

আর কে জলস্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান? এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান? আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও কি (এ কাজ করে)? এরা যে ধরনের শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে।

আর তিনি কে, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর আবার এর পুনরাবৃত্তি করেন? আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহও কি (এ কাজে অংশীদার) আছে? বলো, আনো তোমাদের যুক্তি, যদি তোমার সত্যবাদী হয়ে থাকো।

[সূরা নামল: ৬২-৬৪]

৮। যুক্তি, জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর নির্দেশ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা অন্যদেরকে সৎকর্মশীলতার পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমার কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না?

[সূরা বাকারা: ৪৪]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা তো সে পথে চলবো। আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ

না করে থেকে থাকে? এবং সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে? তাহলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে যেতে থাকবে?

[সূরা বাকারা: ১৭০]

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ - وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনার ভান করে; কিন্তু তুমি বধিরদেরকে কী শোনাবে যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে! তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমাকে দেখার ভান করে। কিন্তু তুমি অন্ধদের কী পথ দেখাবে, যদি তারা কিছু দেখতে না পায়? আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে।

[সূরা ইউনুস: ৪২-৪৪]

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অবশ্যি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের জানোয়ার হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা লোক, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

[সূরা আনফাল: ২২]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? করলে তাদের অন্তরগুলো এমন হতো যা দিয়ে তারা বুঝতে পারতো, আর কানগুলো এমন হতো যা দিয়ে তারা শুনতে পেতো। কেননা, চোখ তো আসলে অন্ধ হয় না, বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়ে থাকে।

[সূরা হজ্ব: ৪৬]

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

তোমাদের জন্য মহান আল্লাহ নিজের আহকাম এমনভাবে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

[সূরা বাকারা: ২৪২]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন আমার সাথে ঝগড়া করছো? তাওরাত ও ইনজীল তো ইবরাহীমের পরে নাযিল হয়েছে। তোমরা কি এটুকুও বুঝো না?

[সূরা আলে ইমরান: ৬৫]

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

দুনিয়ার জীবন তো একটি খেল-তামাশার ব্যাপার। আসলে যারা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চায়, তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই ভালো। তবে কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে না?

[সূরা আনআম: ৩২]

قُل لَّوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرٰىكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আর বলো, যদি এটিই হতো আল্লাহর ইচ্ছা, তাহলে আমি কখনো এ কোরআন তোমাদেরকে শোনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করতে পারো না?

[সূরা ইউনুস: ১৬]

يٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى الَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

হে আমার সম্প্রদায়! এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁর জিম্মায় যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তবুও কি তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি খাটাবে না?

[সূরা হুদ: ৫১]

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

হে লোকেরা! আমি তোমাদের প্রতি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার

মধ্যে তোমাদেরই কথা আছে, তোমরা কি বুঝ না?

[সূরা আম্বিয়া: ১০]

৯। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর তাগিদ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(এই সত্যটি চিহ্নিত করার জন্য যদি কোনো নিদর্শন বা আলামতের প্রয়োজন হয় তাহলে) যারা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর ঘটনাকৃতিতে, রাতদিনের অনবরত আবর্তনে, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগর-দরিয়ার চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, যা আল্লাহ বর্ষণ করেন উপর থেকে, তারপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং নিজের এই ব্যবস্থাপনার বদৌলতে পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

[সূরা বাকারা: ১৬৪]

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলতে যারা অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা ঠিক তেমনি যেমন রাখাল তার পশুদের ডাকতে থাকে কিন্তু হাঁকডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই তাদের কানে পৌঁছে না। তারা কালা, বোবা ও অন্ধ, তাই কিছুই বুঝতে পারে না।

[সূরা বাকারা: ১৭১]

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَءَايٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبٰبِ

নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনের মাঝে জ্ঞানী লোকদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন।

[সূরা আলে ইমরান: ১৯০]

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُولَٰٓئِكَ كَالْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْغَٰفِلُونَ

বহু জ্বীন ও মানুষ রয়েছে, যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মতো, বরং তাদের চাইতেও অধম। তারা চরম গাফেলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।

[সূরা আরাফ: ১৭৯]

هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - إِنَّ فِى اخْتِلَٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِى السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময়। আর তার (হ্রাস-বৃদ্ধির) মনযিলসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা বৎসর গুণে (সময়ের) হিসাব রাখতে পারো। আল্লাহ এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি, তিনি নিদর্শনগুলোকে বিশদভাবে উপস্থাপন করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

নিশ্চয়ই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তাতে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

[সূরা ইউনুস: ৫-৬]

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয়? এই শোনার ও দেখার শক্তি কার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে? কে মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আনে? কে চালাচ্ছে এই বিশ্ব-

ব্যবস্থাপনা? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা (সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে) সতর্ক হচ্ছো না?

[সূরা ইউনুস: ৩১]

صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

আর দেখো, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূখণ্ড, রয়েছে আংগুর বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ–কিছু একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট আবার কিছু এক কাণ্ডবিশিষ্ট, যা একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনোটাকে বেশি ভালো এবং কোনোটাকে কম ভালো। যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এসব জিনিসের মধ্যে রয়েছে প্রচুর নিদর্শন।

[সূরা রাদ: ৪]

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَٰتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ الْوَٰحِدُ الْقَهَّٰرُ - أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَٰطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীর রব কে? বলো আল্লাহ! তারপর এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসল ব্যাপার যখন এই তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মাবুদদেরকে নিজেদের কার্যসম্পাদনকারী বানিয়ে নিয়েছো, যারা তাদের নিজেদের জন্যও কোনো লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না? বলো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়ে থাকে? আলো ও আঁধার কি এক রকম হয়? যদি এমন না হয়, তাহলে তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তারাও সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী বলে সন্দেহ হয়েছে? বলো, প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি একক ও সবার উপর পরাক্রমশালী।

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রত্যেক নদী-নালা নিজের সাধ্য অনুযায়ী তা নিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর যখন প্লাবন আসে তখন পানির উপরে ফেনা ভাসতে থাকে। আর লোকেরা অলংকার ও তৈজসপত্রাদি নির্মাণের জন্য যেসব ধাতু গরম করে তার উপরও ঠিক এমনি ফেনা ভেসে ওঠে। এ উপমার সাহায্যে আল্লাহ হক ও বাতিলের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন। ফেনারাশি উড়ে যায় এবং যে বস্তুটি মানুষের জন্য উপকারী, তা জমিনে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমার সাহায্যে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন।

[সূরা রাদ: ১৬-১৭]

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তিনিই রাত ও দিনকে তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন। আর সুরুজ ও চাঁদকেও; এবং তারকারাজিও তাঁরই নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

[সূরা নাহল: ১২]

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বে আমি যে নবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই মানুষই ছিলো, এসব জনবসতিরই অধিবাসী ছিলো এবং তাদের কাছেই আমি অহী পাঠাতে থেকেছি। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্বে যেসব জাতি চলে গেছে তাদের পরিণাম দেখেনি? নিশ্চিতভাবেই আখেরাতের আবাস তাদের জন্য আরো বেশি ভালো যারা (নবীর কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?

[সূরা ইউসুফ: ১০৯]

মন্তব্য ও প্রতিমন্তব্য

Ibrahim Hossain: "নবী-রাসূলদের ইন্টুইশন হলো ওহী"— এ কথাটি মানতে পারলাম না। এ কথা দ্বারা বুঝায়, নবী-রাসূলগণ যুক্তিবুদ্ধি চর্চার এক পর্যায়ে ওহী প্রাপ্ত হতেন। আসলে কি তাই? আমরা যতটুকু জানি, আল্লাহ তার বান্দাদের মাঝ থেকে বিশেষ কাউকে নির্বাচন করেন তাঁর ওহীর প্রচারক হিসেবে। ওহী descends Wahi deals with issues which are above and beyond human intuition.

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইন্টুইশন হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞানের কোনো মাধ্যম নাই, বিশেষ কোনো কারণও নাই। কেন, কীভাবে ইত্যাদির কোনো ব্যাখ্যাও এতে নাই। কিন্তু যিনি এটা পেয়েছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারেন, এটি সন্দেহাতীত ও শতভাগ নিশ্চিত, নিখাঁদ সত্য। তো, এই ধরনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন কোনো সাধারণ ব্যক্তি প্রাপ্ত হন, তখন তাকে আমরা বলি ইন্টুইশন বা ইলহাম। আর এই ইন্টুইশন যখন নবী-রাসূলদের ওপর ঘটে, তখন সেটাকে আমরা বলি ওহী, রেভিলেশন বা প্রত্যাদেশ।

সাধারণ মানুষদের ইলহাম বা ইন্টুইশন অন্যদের জন্য অনুসরণযোগ্য নয়। কোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে তা দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এটি শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু নবীদের উপর নাযিল হওয়া এই ধরনের ইমিডিয়েট এন্ড ডাইরেক্ট নলেজ তথা ওহী অন্যদের উপরেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণযোগ্য।

আমার এই কথার পক্ষে আপনি প্রমাণ খুঁজে পাবেন যদি মুহাম্মদের (সা.) উপর ওহী নাযিলের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আপনি জানেন। সেখানে আপনি দেখবেন, ওহী নাযিল হওয়ার অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো, আল্লাহ রাসূলের কাছে তেমন দৃঢ়ভাবে মনে হয়েছে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।

আমরা জানি, আল্লাহর রাসূলের (সা.) নবুয়ত সংক্রান্ত সবকিছুই ওহীর অন্তর্ভুক্ত। এর একটা বিশেষ ও ক্ষুদ্র অংশকে আমরা কোরআন হিসেবে জানি। বাদবাকিগুলোকে আমরা হাদীস হিসেবে জানি। অর্থাৎ হাদীসগুলোও এক ধরনের ওহী। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় 'ওহীয়ে গাইরে মাতলু'। অর্থাৎ কোরআনের আয়াত হিসেবে তেলাওয়াত করা হয় না এমন ধরনের ওহী।

তার মানে হলো, সব বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ওহী না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি এক

অনির্বচনীয় অন্তর্গত প্রেরণা থেকেই সব কাজ করেছেন। এই অনির্বচনীয় অন্তর্গত প্রেরণাকে জ্ঞানের উৎস বিবেচনায় উচ্চতর স্বজ্ঞা বা পারফেক্ট ইন্টুইশন ছাড়া আর কী বলা যায়?

স্বজ্ঞা বা প্রত্যাদেশ হচ্ছে জ্ঞানের শতভাগ নির্ভুল উৎস। স্বজ্ঞা হলো নিম্নমানের প্রত্যাদেশ। আর প্রত্যাদেশ হলো উচ্চ মানের স্বজ্ঞা।

Ibrahim Hossain: এইবার বুঝে আসছে। ধন্যবাদ।

দর্শন কী? প্রসঙ্গ: দর্শন ও ইসলাম

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

'মানুষ' মানুষ হয়েছে দর্শন চর্চার মাধ্যমে। মানুষ জানতে চেয়েছে, অতিক্রম করে যেতে চেয়েছে। তাতে সে অর্জন করেছে প্রযুক্তি, গড়ে তুলেছে বিজ্ঞান। হয়েছে সভ্য। চোখ দিয়ে আমরা দেখি। কিন্তু চোখকে দেখি না, যদি না আয়নার সামনে দাঁড়াই। তেমনি দর্শনে ডুবে থেকে মানুষ দর্শন সম্বন্ধে বেখবর হয়ে থাকে। বলে— ফিলোসফি ইজ ডেড। দর্শনের দরকার নাই। দর্শনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে আস্তিক, ধর্মবাদী, সংশয়বাদী ও নাস্তিক— সব ক্যাটাগরির লোকদের একাংশের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যমত্য লক্ষ্য করা যায়। স্টিফেন হকিংয়ের সাড়া জাগানো সর্বশেষ বইটির একটা চ্যাপ্টার হলো দর্শনের কথিত মৃত্যুর দাবি নিয়ে। এমনকি 'সোনার বাংলাদেশ ব্লগের' একজন অতি সম্মানিত বিদ্যজনও সম্প্রতি ইসলামের দিক থেকে দর্শনের বিরোধিতা করে পোস্ট দিয়েছেন।

মানুষ যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন সে যথাসম্ভব চেষ্টা করে তার নিকট স্বীকৃত মানদণ্ড দিয়ে যাচাই করে সর্বোত্তমকে গ্রহণ করতে। এমনকি মানুষ যখন লটারি করে তখনও সে র‍্যাশনাল ডিসিশন গ্রহণ করে। যেমন– সফরে কোন স্ত্রীকে সাথে নিবেন তা ঠিক করতে রাসূল (সা.) লটারি করতেন। যেভাবে আম্পায়ার বা রেফারিগণ লটারি করে থাকেন। মোদ্দা কথা হচ্ছে, যখনই আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন, যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন, সেটি অতি অবশ্য আপনার র‍্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে নিবেন। বলাবাহুল্য, এটিই হচ্ছে দার্শনিক পদ্ধতি। প্রতিটি মানুষই হচ্ছে এক একজন দার্শনিক।

মানুষ প্রতিনিয়ত পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনে চলাফেরা করে, যদিও সে জানে না

কেন সে বাঁক নেবার সময় একটা নির্দিষ্ট মাপে হেলে চলে। একজন পদার্থবিদ্যাবিদও তাই করেন। অবশ্য তিনি নিয়মটি জানেন বা জানার চেষ্টা করেন। সেজন্য তিনি পদার্থবিদ্যাবিদ। আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত শরীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়াদি চলছে। এজন্য আমরা বেঁচে আছি বটে। কিন্তু আমরা জানি না এসব ফিজিওলজিক্যাল প্রসিডিউর কী বা কীভাবে হচ্ছে। একজন শরীরতত্ত্ববিদ সেটি জানেন। আর যা জানেন না, তা জানার চেষ্টা করেন। একজন কৃষক কৃষিবিদ্যার নিয়ম মেনেই চাষাবাদ করেন। কিন্তু তিনি জানেন না কৃষিবিদ্যা বিভাগে এসব বিষয় নিয়ে কী ধরনের জ্ঞানচর্চা হয়ে থাকে। তেমনি, যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন চর্চা করেন তারা জানে ও জানার চেষ্টায় থাকেন সব বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান। সংশ্লিষ্ট জ্ঞানগত শাখাটি যেসব বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বা ধ্রুবক হিসেবে (নির্বিচারে) গ্রহণ করে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়, দর্শনের কাজ হচ্ছে সেই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা। তাই, ফিলোসফি ইজ অলওয়েজ ফিলোসফি অফ সামথিং।

মানুষ মঙ্গল গ্রহে নভোযান পাঠিয়েছে। আপনারা, ফিলোসফির লোকেরা কী করেছেন? একজন নবীন শিক্ষার্থীর এমন এক প্রশ্নের জবাবে আমি পকেট থেকে কলম বের করে বললাম, দর্শনের লোকেরা এ রকম একটি কলমও তৈরি করতে পারে নাই। ন্যাশনাল জিডিপিতে তাদের কোনো অবদান নাই। তাহলে আমরা এটি কেন পড়বো? বা এটি কেন পড়ানো হবে? বিশ্বের নামকরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেকেরই ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট বলে কোনো বিভাগ নাই। এটি হলফ করে বলা যায়। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

তথাকথিত ভালো কোনো সাবজেক্টে চান্স না পেয়ে বাধ্য হয়ে দর্শন বিভাগে ভর্তি হওয়া এই স্টুডেন্টের সাথে একমত হয়ে আমি স্বীকার করলাম, নভোযান পাঠানো তো দূরের কথা একটা সুঁইও দর্শনের লোকেরা বানাতে পারে নাই। তাকে বললাম— আচ্ছা ইরাক, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে না হয় তেলের জন্য গেছে, মঙ্গল গ্রহে আমেরিকা পাথ ফাইন্ডার কেন পাঠালো? গুহা ও বন্য জীবন থেকে মানুষ কেন বের হয়ে আসলো? মানুষ কেন অজানাকে জানতে চায়? যা কিছু প্রচলিত, মানুষ কেন সেটিকে অতিক্রম করে নতুনকে পেতে চায়?

কারণ, সিন্দাবাদের সেই কাঁধে চড়ে বসা বুড়ো ভূতের মতো দর্শনচেতনা মানুষকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে বুঝে না— কেন সে ব্যবসায়ী না হয়ে বিজ্ঞানী হলো। বা, কেন সে বিজ্ঞানী না হয়ে সাহিত্যিক হলো। যখনই আপনি ‘কেন’ প্রশ্নটির মুখোমুখি হবেন, তখন এই ‘কেন’র উত্তর আপনি যা-ই ঠিক করেন না কেন, এমনকি কোনো উত্তরকেই সঠিক মনে না করলেও, আপনি দর্শনের জালে জড়িয়ে গেলেন। দর্শনই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জ্ঞান হলো দর্শনের পণ্য।

আমরা বিজ্ঞান চর্চা করবো প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সুখ, কল্যাণ বা ভালোকে পাওয়ার জন্য। ভালো কথা। কিন্তু সুখ বলতে আমরা কী বুঝবো? কার সুখ? কীসের সুখ? কীভাবে? কীসের বিনিময়ে? আসলে 'আমরা' কারা? সবাই তো ভালো চাই। কিন্তু ভালোটা কোথায়? আদৌ কোনো পরম ভালো আছে কি? থাকলে এর যুক্তি কী? এ ধরনের সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিতে সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিয়ে সে মোতাবেক জীবনযাপন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও এসব ব্যাপার নিতান্ত অবচেতনে ঘটে বা ক্রিয়াশীল থাকে। ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলে তার অবস্থানটা জানা যায়। দর্শনের ইতিহাস যত দিনের, 'ফিলোসফি ইজ ডেড' দাবিটির ইতিহাসও প্রায় ততদিনের। ফিলোসফির বিরুদ্ধে যারা যুক্তি দেন, মজার ব্যাপার হলো তারা কোনো না কোনো দার্শনিক গোষ্ঠীর মতামত ও যুক্তিকেই তুলে ধরেন।

দর্শনের কোনো কনক্রিট ফাইন্ডিংস নাই। থাকতে পারে না। যে বিষয়ে কোনো বিরুদ্ধ মত পাওয়া যাবে না, তা দর্শন হতে পারে না। আর কোনো বিষয়ে বা কোনো কিছু সম্পর্কে মতৈক্য পাওয়া গেলে সেটি দর্শন হতে আলাদা হয়ে একটা স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিসেবে অগ্রসর হবে। যেভাবে একে একে সব সাবজেক্ট দর্শন হতে বের হয়ে গেছে। সর্বশেষ গেছে মনোবিদ্যা। এক সময় ফিজিক্সও ফিলোসফি হিসেবে ছিলো।

দর্শনের কোনো পক্ষ নাই, থাকতে পারে না। তবে দার্শনিকের অবশ্যই কোনো না কোনো পক্ষ থাকবে। যুক্তি-পাল্টাযুক্তির মধ্যে ব্যক্তিমানুষকে কোনো একটা পক্ষে অবস্থান নিতে হয়। সতেচনভাবে না নিলে অবচেতন বা সামাজিকভাবে সে কোনো না কোনো পক্ষে নিজেকে আইডেন্টিফাই করে। দর্শন-শিক্ষকের কাজ হলো বিপরীত বা বিকল্প মত ও তৎসংশ্লিষ্ট যুক্তিসমূহ তুলে ধরা।

তাহলে আমরা প্রথম কথায় আবার ফেরত আসলাম, অর্থাৎ যখনই আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেই তখন আমরা দার্শনিক পদ্ধতি মেনেই তা নেই। সেটি যা-ই হোক না কেন। ঈশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী বা সংশয়বাদী যা-ই হোন না কেন, আপনি একটি দার্শনিক মতেরই অনুসরণ করছেন। জাতীয়তাবাদী, বা আন্তর্জাতিকতাবাদী– যাই হোন না কেন, আপনি একটা প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদকেই সঠিক হিসেবে গ্রহণ করছেন। মানুষকে বলা হয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। বুদ্ধিচর্চা তো দার্শনিকতারই নামান্তর।

তাহলে, ইসলামের সাথে দর্শনের কী সম্পর্ক? আমার দৃষ্টিতে, ইসলাম হচ্ছে দর্শনের সারনির্যাস। মজার ব্যাপার হলো দর্শনের খুব কম সংখ্যক লোকেরা এটি জানে। এবং ইসলামপন্থীরা কোমর বেঁধে এ কথার বিরোধিতা করছে ও করবে!

আচ্ছা, মুয়াজ ইবনে জাবালকে রাসূল (সা.) যখন বললেন, 'রা-সূল আমরি আল-ইসলাম' (মূল বিষয় হলো ইসলাম)— এ কথা দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? ইসলামের, বিশেষ করে ঈমানের পদ্ধতি কী? দর্শন চর্চা ইসলামে কতটুকু প্রাসঙ্গিক?

এসব প্রশ্নের জবাব পাবেন পরবর্তী নিবন্ধে।

মন্তব্য ও প্রতিমন্তব্য

নোমান সাইফুল্লাহ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এই বিষয়টি ভাবছিলাম। এবং আপনার এক ছাত্রের সাথে অনেক কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে আপনার কথা বলেছেন। কিন্তু মাঝে অনেক দিন আপনি ব্লগে আসেননি। তাই কথা বলতে পারছিলাম না। ভালো হয়েছে। আমরা ইসলামের নামে অনেক কিছুই ইসলামবিরোধী বিষয় উপস্থাপন করছি, যা কোনোভাবেই উচিত নয়। যে যেই বিষয়ে জানে না, সে বিষয়ে লেখা মানেই বোকামী করা। আপনাকে আবারও মোবারকবাদ। আশা করছি নিয়মিত ব্লগে লিখবেন।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।
>
> ইসলামপন্থী লোকজন যে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার দিক থেকে অনেক সংকীর্ণ ও অনাগ্রহী, মন্তব্যের অত্যল্পতা সেটি প্রমাণ করে। দর্শন, বিশেষ করে নাস্তিকতা নিয়ে যখন আমি সামহোয়্যারে লিখতাম, তখন অনেক মন্তব্য আসতো।
>
> এসবি ব্লগ একটা স্টেরিওটাইপে আবদ্ধ হয়ে আছে। অন্তত পাঠক ও লেখকের দিক থেকে।
>
> "আমরা ইসলামের নামে অনেক কিছুই ইসলামবিরোধী বিষয় উপস্থাপন করছি, যা কোনোভাবেই উচিত নয়।"– আপনার এই মন্তব্যের আলোকে আলোকপাত করুন। আলাদা পোস্ট দিলে, আমাকে দয়া করে বার্তা দিতে ভুলবেন না।

নীলু ও প্রজাপতি: "দর্শনে ডুবে থেকে মানুষ দর্শন সম্বন্ধে বেখবর হয়ে থাকে।"

এই বেখবরে বেখবর হয়ে থাকা মানুষের খাসলতের একটা অংশ হতে পারে। কিন্তু সে বেখবরকে জাস্টিফাইড করার জন্য যখন লোকে উঠে পড়ে লাগে তখন

দ্বন্দ্বে পড়ে যাই।

দর্শন চর্চা বেদাত বা এটা পথভ্রষ্ট করে– এই ধরনের কথার মধ্যে দৈবতার আঁশটে গন্ধ লেগে থাকে। অথচ, আমরা দেখি সেই দৈবতাকে যুক্তিসম্মতভাবে (অনেক ধার্মিক যুক্তিসম্মত হতে না পারাকে লজ্জার কারণ মনে করেন) উপস্থাপনের কতই না চেষ্টা। কেন এই চেষ্টা?

কিন্তু সেইসব চেষ্টা কেন মানুষ করে? কেন তার এই অন্তর্নিহিত তড়পড়ানী সেই খোঁজ কি নিতে চায়? কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই বেখবরকে খবর করে তোলার চেষ্টাকে (দর্শন নামে) গলা টিপে মারার চেষ্টা করা হয়। আজকাল দেখি সেটাকে বিজ্ঞান নামেও ডাকা হয়। অথচ শুধুমাত্র যদি এই প্রশ্ন তোলা হয়– আমরা যা যা নিয়ে কথা বলছি, কেন বলছি? তাহলে হয়তবা কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলে।

কিন্তু যারা নানা দোহাইয়ে নিজেরা দরজা বন্ধ রাখে, অন্যদেরও বন্ধ করার কথা বলে, তারা কেন একবার নিজের দিকে ফিরে দেখে না।

সরি, দর্শন নিয়ে বিপত্তিকর অভিজ্ঞতার কিছু কথা বললাম। আপনার লেখার পরের অংশের অপেক্ষায় থাকলাম।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** দর্শন নিয়ে ইসলামপন্থীদের মনোভাব আপনি যা বলেছেন মোটামুটি সেরকমই, দেখেছি। এসব ভুল ধারণা। তবে, প্রতিষ্ঠিত।
>
> মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

“freedom is a combination of liberty and authority. absolute freedom is absurd and meaningless.”

— mohammad mozammel hoque

ইসলাম ও দর্শন: প্রচলিত ভুল ধারণার সংশোধন

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

রাসূল (সা.) কীভাবে ওহী পেয়েছেন?

ইসলাম হলো দার্শনিকতার উৎকৃষ্টতম ফসল। দর্শনের মূলকথা হলো ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সব ব্যাপারের মূল হলো আল-ইসলাম, নামায হলো এর ভিত্তি এবং জিহাদ হলো এর চূড়া। রাসূল (সা.) যখন হেরা পর্বতের গুহায় 'ধ্যান' করতেন, তখন আসলে তিনি সেখানে কী করতেন? নিশ্চয়ই আমরা এখন যেভাবে বুঝি সেভাবে তিনি জিকির-মোরাকাবা করতেন না। সেখানে তিনি ঘুমাতেও যাননি। পালিয়েও থাকেননি। দারুল আরকামের মতো একটি নিরাপদ স্থান হিসেবেও সেটিকে বেছে নেননি।

বরং তিনি ভাবছিলেন, গভীরভাবে— একটা সত্যিকারের জীবনাদর্শ কী হতে পারে, সত্য কী, ন্যায়ের চূড়ান্ত মানদণ্ড কী হতে পারে, মানুষের মুক্তির পথ কী, এ জগতের রহস্য কী, এর কন্টিনিউশন কী হতে পারে ইত্যাদি ধরনের সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে। এক পর্যায়ে তিনি ওহী লাভ করেন। যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আরাধ্য হেদায়েত বা দিকনির্দেশনা।

রাসূল (সা.) সত্যকে জানা ও পাওয়ার জন্য প্রচলিত ধ্যানধারণাকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে স্বীয় যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করে বুঝেছেন– যা কিছু প্রতিষ্ঠিত তার অনেক কিছুই ঠিক নয়। সমাধান কী হবে, তা তিনি গভীরভাবে ভাবছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়তের আলো দিয়ে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূল হওয়ার কারণে তিনি ওহীপ্রাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন। সত্যকে পেতে চাইলে আমরা

সাধারণ মানুষ হিসেবে ওহী পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না। ইতোমধ্যে ওহী এসে যাওয়ায় তার দরকারও নাই; তবে সত্যকে জানতে চাইলে যে কেউ তা খুঁজে পাবে। চূড়ান্ত ওহী-পরবর্তী এই সময়কালের সত্যপ্রাপ্তি হচ্ছে ওহীর সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়া, ওহীর সত্যতাকে খুঁজে পাওয়া।

কুরআন কীভাবে মানুষকে ডাকে?

কুরআন মানুষকে বলে চিন্তা-গবেষণা করতে। যেসব বিষয়কে পেরেনিয়্যাল প্রবলেম হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেসব সম্পর্কে জানতে, যাচাই করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের পাতায় পাতায় যুক্তি দিয়ে মানুষকে বলেছেন, যদিও পরমসত্তা হিসেবে তিনি শুধু করণীয় সম্পর্কে হুকুম নাযিল করলেও তা বাধ্যতামূলক হতো। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে দেখিয়েছেন নিদর্শন তথা আয়াত, যা যুক্তিবুদ্ধি তথা বিবেক-জ্ঞান দিয়ে খুঁজে নিতে হয়। জ্ঞানচর্চাকে, বুদ্ধির অনুশীলনকে প্রপাগেইট করা হয়েছে নিয়মিতভাবে। ঈমান বা বিশ্বাস হলো বুঝজ্ঞান অনুসারে পাওয়া একটা সিদ্ধান্ত বা উপসংহার। না বুঝে বিশ্বাস করার কোনো মূল্য নাই।

আমাদের বোধ-জ্ঞান-বিবেচনা-যাচাইয়ের সীমা কতটুকু?

আমাদের বোধ-জ্ঞান-বিবেচনা-যাচাইয়ের সীমা যতটুকুই হোক তা শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ বিবেচনায় শুধুমাত্র স্বীয় ব্যক্তিগত বুঝজ্ঞানের উপর নির্ভর করা অযৌক্তিক। আবার পরম সত্যকে পাওয়ার জন্য নিজ বুঝজ্ঞানকে বাদ দিতে হবে– এটিও অগ্রহণযোগ্য একটা প্রান্তিকতা। যখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই তখন তার প্রেসক্রিপশনের উপর আপাতদৃষ্টিতে অন্ধভাবে বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু তিনি ভালো ডাক্তার কিনা তা যাচাই করেই আমরা তার কাছে যাই। দর্শন বিষয়ে উপরের আলোচনায় বলেছি– যখনই আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেই তখন যাচাই করেই সেই সিদ্ধান্ত নেই। আবার যাচাই করা মানে একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা নয়। আমরা যুক্তি ও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি। যখন আমরা চোখে দেখি তখনও আমরা চোখের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি।

রাসূলকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করতে হলে বুঝজ্ঞান লাগবে। রেসালাতের সত্যতায় নিশ্চিত হওয়ার পর বাকিটুকু বিশ্বাসের বিষয়। এবং এটিই যৌক্তিক। ব্যবহারিক জীবনে কোনো এক্সপার্টের বিষয়ে আমরা যা করে থাকি। গাড়ির ড্রাইভার হতে শুরু করে ডাক্তার পর্যন্ত সবার সাথে। এসব ক্ষেত্রে সর্বদাই আমরা স্বীয় বুঝজ্ঞানের উপর থাকি, এমনকি যখন আমরা কাউকে কোনো বিষয়ে আমাকে গাইড করার উপযুক্ত বিবেচনা করে তার নির্দেশনাকে বিনাবাক্যে গ্রহণ করি, তখনও।

জ্ঞানতত্ত্ব ও ঈমান তথা ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব

প্রচলিত পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব হলো দ্বন্দ্ববাদী। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি— এ দুটি পক্ষ। কারো মতে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যে জ্ঞান দেয় সেটি অপরাপর যে কোনো জ্ঞানের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য জ্ঞান। আবার বুদ্ধিবাদীদের মতে, কখনো কখনো বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান পাই তা-ই সঠিক বা বেটার নলেজ। পাশ্চাত্যের কেউ কেউ স্বজ্ঞার কথা বলেছেন বটে, তবে তারা স্বজ্ঞাকে যতটা সম্ভব সযতনে এড়িয়ে গেছেন। কমনসেন্স নামে কেউ কেউ একে বেনামে স্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে, ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব সমন্বয়বাদী। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। এর উপরে বুদ্ধি। এর উপরে স্বজ্ঞা বা ইলহাম। স্বজ্ঞার পূর্ণতা তথা পারফেকশন হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ। শুধুমাত্র নবীগণই জ্ঞানের এই সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারেন। আমাদের জ্ঞানতত্ত্বে ওহীর পর্যায় হলো যৌক্তিক প্রকল্প। এবং একমাত্র যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক (র‍্যাশনাল) সম্ভাবনা হওয়ার কারণে একে প্রমাণিত ও সত্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করি। যদি প্রত্যাদেশকে স্বীকার করা না হয় তাহলে স্বজ্ঞার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যায় না।

মূলকথা হলো, আমরা যখন প্রত্যাদেশ-নিঃসৃত কিছু বিশ্বাস করি তখন আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই তা বিশ্বাস বা গ্রহণ করি। কেউ যদি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে না করেন তখন তিনি নিজেকে অবিশ্বাসী হিসেবে আইডেন্টিফাই করেন।

বিশ্বাসী তথা ঈমানদারদের বেলায় জ্ঞানের এই চার স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যতার দিক থেকে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তেমনটি হলে তিনি ওহীর জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও ওহীবহির্ভূত সব সূত্রকে পুনর্মূল্যায়ন করবেন। এতদসত্ত্বেও, একজন মুমিনের এ ধরনের অভিজ্ঞতা ও বুঝজ্ঞান তার জ্ঞানের উৎস হিসেবে বাতিল (nullified) হয়ে যায় না। কারণ, তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও বুঝজ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যাদেশকে সর্বোচ্চ মান হিসেবে পেয়েছেন ও গ্রহণ করেছেন। যেসব বিষয়ে কোনো ঐশী জ্ঞানের কথা সরাসরি বলা নাই, সেক্ষেত্রে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এটি দ্বন্দ্ব নয়, সমন্বয়।

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা ও স্বরূপ

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্লেটোর প্রস্তাবনা অনুসারে পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ঞা হলো: knowledge is justified true belief। **১৯৬৩** সালের

পর থেকে এই সংজ্ঞাকে মেরামত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটি অন্য প্রসঙ্গ। মূলকথা হলো, বিশ্বাস ছাড়া জীবন অসম্ভব, সে বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন। সকল জ্ঞানই মূলত বিশ্বাস হলেও বিশ্বাস মাত্রই জ্ঞান নয়। শুধুমাত্র সেসব বিশ্বাসই জ্ঞান হিসেবে গৃহীত হবে, যা যাচাইকৃত ও সত্য হবে। এছাড়া নিছক বিশ্বাস স্পষ্টতই অন্ধ বিশ্বাস।

বিশ্বাস হলো যা জানি না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হিসেবে কোনো কিছুকে স্বীকার করা— শুধুমাত্র এটুকু বললে ভুল বোঝা সম্ভব। আসলে বিশ্বাস হলো— যা জানি, তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অজানা সম্পর্কে সর্বোত্তম ও যৌক্তিক অনুমান করে তা সত্য হিসেবে গ্রহণ করা। এভাবেই আমরা 'গড অফ দ্য গ্যাপস' নামক নাস্তিকতার যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারবো। আল্লাহর সত্তাকে আমরা জানি না বটে, তবে আমরা যা জানি সেসবের জ্ঞানগত যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহর অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি রেসালতকে না মানা হয়। এ ধারায় সব কিছু যা ইসলামে আছে বা ইসলামের মূলকথা।

When the declaration of the *Kalima* is a rational conclusion then it is worthy enough. Mere utterance of *Kalima* is totally useless. Rationality, any sort of rationality is nothing but doing philosophy. Where any argument is not working, it has to be shown with healthy argument that why argumentation is not applicable there. Trust on and submission to authority(ies) is a must for our life to continue, no matter what is/are that/those authority(ies).

মন্তব্য ও প্রতিমন্তব্য

আবু সাইফ: আপনি বলেছেন, "ঈমান বা বিশ্বাস হলো বুঝজ্ঞান অনুসারে পাওয়া একটা সিদ্ধান্ত বা উপসংহার। না বুঝে বিশ্বাস করার কোনো মূল্য নাই।"

ব্যাপারটা আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ আছেন যারা 'মুখলিস' বটে, কিন্তু না বুঝেই দ্বীনের অনুসরণ করেন, বোধশক্তি খুবই সাধারণ, কোনোমতে টেনেটুনে জীবনটা চালিয়ে নেন। তাঁদের 'বিশ্বাসের কোনো মূল্য নাই' এ কথায় একমত হই কী করে?

আসলে খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, আর একটু ব্যাখ্যা দরকার। কী জানি! হয়তো অন্য পাঠকরা সবাই বুঝতে পারছেন, আমি অধম অক্ষম...।

ধন্যবাদ এমন গুরুত্বপূর্ণ পোস্টের জন্য।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** জ্ঞানকে যদি আমরা অক্ষরজ্ঞান ও জটিল বিশ্লেষণের উপস্থাপনা হিসেবে না ধরে বুঝ তথা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিসেবে ধরি তাহলে আপাত অবুঝরাও মূলত অবুঝ নন। সর্বনিম্নমানেরও নিচের অবুঝ হলে তিনি ইসলামকে বুঝতেন না, গ্রহণ করতেন না। অবশ্য, শুধুমাত্র জন্মসূত্রে মুসলিম যারা, তাদের কথা আমি ভাবছি না।
>
> মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

নোমান সাইফুল্লাহ: আমার একটা বিষয় জানার ছিলো। যারা ওহীর জ্ঞানে বিশ্বাস করেন না। তারা কীভাবে সত্য লাভ করেন? বা ওহীর জ্ঞান সত্যের একমাত্র উৎস কিনা? ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যা আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কারা কারা দিয়েছেন? মুসলমানরা বর্তমানে দর্শন চর্চায় পেছনে পড়ে আছে কেন?

"আমাদের কাছে জ্ঞান দু'ধরনের– নাযিলকৃত জ্ঞান বা ওহী (revealed knowledge) এবং অর্জিত জ্ঞান (acquired knowledge thorough scientific method)।"

এই বক্তব্যটি একটু বিশ্লেষণ করুন।

"দর্শন শাস্ত্রের জনক ও অনুসরণকারীদের কাছে ওহীর জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা তাদের চিন্তাপ্রসূত ধারণা দিয়ে সত্য উপলব্ধি করেন।

ঠিক এ কারণেই আমাদের উলামারা দার্শনিকদের বিরোধিতা করেছেন। অ-বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য আমরা শুধু ওহীর দ্বারস্থ হই, কোনো দার্শনিকের নই।"

এই বক্তব্যটিও একটু বিশ্লেষণ করুন।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির দ্বন্দ্বের মতো রিভিল ও ইম্পিরিক্যাল নলেজের এই দ্বন্দ্ব অমূলক। ইম্পিরিক্যাল নলেজ যেখানে অসম্ভব সেখানেই শুধু রিভিল নলেজের প্রসঙ্গ আসে। জ্ঞান চর্চার শুরুতে ওহীর জ্ঞান অ-প্রত্যক্ষ (ফাউন্ডেশনাল), কিন্তু শেষে অবভিয়াস তথা চূড়ান্ত প্রাপ্তি (কনক্রিট ফাইন্ডিংস)।

আল্লাহ তো বলেছেন— তুমি তোমার সকল (ইম্পিরিক্যাল) ক্ষমতা দিয়ে দেখো আমি আল্লাহ কিনা। তোমার যৌক্তিকতার দাবি হলো আমাকে স্বীকার করে নেওয়া। অতএব, আমার কথা মানো। আমার রাসূলকে মানো।

দেখুন, আল্লাহ নিজেকে চাপিয়ে দেন নাই। বরং নিজের অথরিটির পক্ষে কোরআনের ছত্রে ছত্রে যুক্তি দিয়েছেন, বিচার-বিবেচনা ও বিবেকের কথা বলেছেন। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা রিচ্যুয়ালসের বিষয়গুলো ছাড়া সব বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনার পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেছেন।

আলেমগণ কেন দার্শনিকদের বিরোধিতা করেছেন, সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে দার্শনিকদের বিরোধিতা করে 'দর্শনের খণ্ডন' নামক কিতাব লিখে আবু হামিদ আল গাযালী নামের একজন আপাদমস্তক আলেম শ্রেষ্ঠতম মুসলিম দার্শনিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। সুতরাং, সমস্যাটা উলামা বনাম দার্শনিকদের; দর্শন বনাম ইসলামের নয়।

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

নোমান সাইফুল্লাহ: আরেকটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন। মনে করুন, হেইডেগার বা বার্টান্ড রাসেল– তাঁরা তো অমুসলিম, একজন আবার নাস্তিক। এই ক্ষেত্রে কে কীভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করবেন। কারণ, একজন অমুসলিম বা নাস্তিক তো ওহীর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সত্য খোঁজে না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ওহী পর্যন্ত যে পৌঁছতে পারলো সে পূর্ণাঙ্গ সত্যকে পেল। যে পৌঁছতে পারলো না তার সত্যতাপ্রাপ্তি খণ্ডিত ও অপূর্ণ থাকলো। সে জন্য পদ্ধতি অর্থাৎ দর্শনের কিছু যায় আসে না।

ধন্যবাদ।

নোমান সাইফুল্লাহ: বিষয়টি আরেকটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য বলছি। ধরুন, একজন অমুসলিম যদি আপনার এ কথাকে দর্শনের ভাষায় অস্বীকার করেন, তার উত্তর কী হবে? এই বিষয়ে আমি খুবই অজ্ঞ। তারপরও আমি জানতে চাচ্ছি, কোনো মুসলিম দার্শনিক কি গবেষণায় প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে সত্যের শেষ স্তর ওহী? এবং তা আধুনিক দর্শন স্বীকার করে নিয়েছে? জানালে উপকৃত হতাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যিনি মানছেন না তাকে আপনার যুক্তি বলবেন। মানা বা না মানা তার বিবেচ্য।

মুসলিম দর্শনে ওহীর স্থান স্বীকৃত। ওহীর স্বরূপ, বিশেষ করে বুদ্ধির সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

ধন্যবাদ।

লোনার: 'ফালসুফা' হচ্ছে ইসলামের এন্টিথিসিস। ইসলামকে দর্শন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করার জন্য আপনাকে সচেতন মাইনাস!!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আগের পর্বে দর্শন সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্য ও বর্তমান পর্বে উপস্থাপিত বক্তব্যের আলোকে আপনার বক্তব্য আশা করছি।

থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিন্থেসিসের থিওরিটা হেগেলের, যা তার ছাত্র মার্ক্সের নামে প্রচারিত। আপনি হেগেল-মার্ক্স অনুসারে ইসলাম ও এর সাথে দর্শনের সম্পর্ককে দেখছেন। কী আর বলবো!

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

আবূসামীহা: "ইসলাম হলো দার্শনিকতার উৎকৃষ্টতম ফসল। দর্শনের মূলকথা হলো ইসলাম।"

দর্শনের জনক গ্রীকরা। তাহলে তারাও ইসলাম চর্চা করতো! এরিস্টটল, সক্রেটিস, প্লেটোরাও তাহলে আমাদের ইসলাম শিখিয়েছেন!

রাসূলুল্ললাহ (সা.) ফালসাফা (ফিলোসফি) চর্চা করেননি হেরা গুহায়। তিনি তাফাক্কুর করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা.) জন্মের আগে থেকেই ফালসাফা প্রচলিত ছিলো।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: পাশ্চাত্য দর্শনের যে ইতিহাস পড়ানো হয় তাতে গ্রীসের আইওনিয়ার অধিবাসী থেলিসকে দর্শনের জনক বলা হয়। আপনি ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু যা আপনার বক্তব্যে আসেনি তা হচ্ছে প্রাচ্য দর্শনের দুটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছে। একটি গ্রিসের আগে, ভারতীয় দর্শন। অন্যটি আরবে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে হযরত হাসান বসরীর হাতে। উনার সহীফা নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর

ড. মো: বদিউর রহমান একটি সাড়া জাগানো থিসিস করে দেখিয়েছেন যে মুসলিম দর্শন আর ইসলাম একইসাথে এসেছে। বাহিরের প্রভাবে তার উৎপত্তি হয়নি। উনার লেখা বইটি বাজারে পাওয়া যায়।

দর্শন হলো চিন্তার একটি পদ্ধতি। যাতে বুদ্ধি ও বোধের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা হয়। যুক্তি এর হাতিয়ার। আপনার ব্যবহৃত তাফাক্কুরকে বলা যায় এর চালিকাশক্তি।

আগের পর্বে এটি বলেছি– দর্শন যে কোনো মত বা পথের ভালো-মন্দ, পক্ষ-বিপক্ষ, যুক্তি-পাল্টাযুক্তিকে তুলে ধরে। তাই দর্শন সর্বদা নিরপেক্ষ। কিন্তু যে কোনো দর্শন চর্চাকারী (প্রতিটা ব্যক্তিই প্রতি মুহূর্তে দর্শনচর্চা করে থাকেন, যখনই সে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে) কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না। তিনি কোনো না কোনো যুক্তিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। এমনকি কিছু না বলাকেও তিনি প্রেফার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি উইথহোল্ডিংয়ের পক্ষে! আর দর্শন বিষয়ে পাঠদানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে পক্ষ-বিপক্ষকে তুলে ধরা ও নিজের প্রেফারেন্সকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া। এ দৃষ্টিতে প্রফেটরা ফিলোসফি শিক্ষা দেন না। কারণ, তাঁদের সুনির্দিষ্ট পক্ষ থাকে, যাকে তাঁরা একমাত্র সত্য হিসেবে প্রচার করেন। সুতরাং, প্রফেটগণ দার্শনিকদের (শিক্ষক অর্থে) মতো নিরপেক্ষ নন। যদিও তাঁদের সত্যপ্রাপ্তি ও তা প্রচার-প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হচ্ছে দর্শনেরই পদ্ধতি।

আপনি ইমাম গাযালীর উদারহণটিই দেখুন। তিনি কখনো নিজেকে দার্শনিক পরিচয় দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টো গ্রীকদর্শন প্রভাবিত তৎকালীন দার্শনিকদের ২০টি দাবির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সেগুলো ঠিক নয়। বইয়ের নাম দিয়েছেন, তাহাফাতুল ফালাসিফা। অথচ, উনাকেই শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক মনে করা হয়। কেন? কারণ বিষয়গুলোকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। শুধুমাত্র কোরআন-হাদীসের রেফারেন্স দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি।

কোরআন কোনো দার্শনিক গ্রন্থ নয়, যেভাবে আমরা কোনো দার্শনিকের লেখা বই পড়ে থাকি। এটি ওহী। এই ওহীকে স্টাবলিশড করা হয়েছে যুক্তি-তত্ত্ব ও দার্শনিকসুলভ পদ্ধতি ও প্রমাণ দিয়ে।

এতে মানুষের পরিচিত জগৎ ও সাদামাটা বিষয়গুলোকে বারংবার ও

নানাভাবে রেফার করা হয়েছে সেসব নিয়ে মুক্তমনে চিন্তা গবেষণা করার জন্য। এটিই তো এম্পিরিক্যাল স্টাডি। তাই না? মানুষের চিন্তনকে গাইড করে একে ঐশী বাস্তবতার দিকে চালিত করা হয়েছে।

যেসব দার্শনিক ঐশী স্তরে পৌঁছতে পারেননি, সেটি তাদের সীমাবদ্ধতা, দর্শনের নয়। কারণ, যারা জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর তথা ঐশী জ্ঞানে পৌঁছতে পেরেছেন, তারা সুশৃংখল চিন্তা-পদ্ধতির মাধ্যমেই সেটি পেরেছেন। আল্লাহর রাসূলও (সা.) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। হেরা গুহায় তিনি কী করছিলেন সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। শুধু এটুকু জানি যে তিনি ভাবছিলেন। আচ্ছা, তিনি কী ভাবছিলেন? এটি নিশ্চিত যে তিনি নিজ স্বার্থ নিয়ে ভাবছিলেন না। তাঁর ভাবনার বিষয় ছিলো জগৎ, সমাজ, সমগ্র। সূরা ইনশিরাহর ২-৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদূদী এ কথাই বলেছেন। তাই না?

হ্যাঁ, ফালসাফা রাসূলের (সা.) জন্মের আগে থেকে প্রচলিত ছিলো, তবে এই নামে ছিলো না। যখন থেকে মানুষ নিজ বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়ে কোনো কিছু জানতে চেয়েছে, প্রশ্ন করেছে; তখন থেকে এই চিন্তা ও জ্ঞানগত প্রক্রিয়াও অস্তিত্ব লাভ করেছে।

ফিলোসফি মানে 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'; ফিলোস মানে জ্ঞান, সোফিয়া মানে অনুরাগ। এটি কীভাবে ইসলামবিরোধী হতে পারে? হতে পারে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অন্য অনেক কিছুর মতো ইসলামের পক্ষের লোকেরা এসব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন না বলে ইসলামবিরোধীরা উপরের এক মন্তব্যকারীর ব্যবহৃত শব্দ 'এন্টিথিসিস' হিসেবে একে কাজে লাগাচ্ছে।

ইসলামই হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি চর্চার মূল ক্ষেত্র। দার্শনিকতার সর্বোত্তম পরিণতি হলো ইসলাম। "রা'সুল আমরি আল-ইসলাম"-এর এটিই মর্মার্থ।

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। দীর্ঘ প্রতিমন্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

"বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করো না?"

— আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত: ২০

ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

ভূমিকা

ইসলাম আসলে কী? অথবা, প্রচলিত অর্থে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিকল্প হিসেবে ইসলামের কি আলাদা কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে? হলে সমস্যা কী? তাহলে কি 'ইসলামী দর্শন' কথাটা আদতে ভুল? তাই যদি হয়, এতো এতো মুসলিম দার্শনিকরাই বা কী করেছেন? ইমাম গাজ্জালী বা আল্লামা ইকবালের 'ইসলামী দর্শন' কি প্রমিন্যান্ট দর্শন হিসেবে স্বীকৃত নয়? এসব প্রশ্নের 'ইঙ্গিতমূলক' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত উত্তর নিয়েই এই নিবন্ধ।

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ আসলে ইসলামের প্রচলিত ব্যাখ্যাপদ্ধতি কী— তা নির্ণয় করাও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবে। ইসলামকে জানা-বুঝা ও এর ব্যাখ্যা-ভাষ্য রচনার প্রচলিত পদ্ধতিটা হচ্ছে ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি। আমরা জানি, কোনো ধর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মগুরুর সিদ্ধান্তের প্রতীয়মান অর্থ অনুসারে ধর্মের নানা বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া ও ভাষ্য রচনার যে পদ্ধতি, তা-ই হলো ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি। ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে এবং ধর্মবেত্তাগণ তা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মূলগত দিকটা অক্ষুণ্ন রেখেই ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য তৈরি হয়।

ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত, প্রচলিত এবং প্রায়শই আক্ষরিক অর্থের বাইরে ধর্মের বিষয়সমূহকে

(notions or issues) যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করাকে ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সোজা কথায়, ধর্মের বিষয়গুলো নিয়ে দর্শন চর্চা বা ধর্মকে দর্শনের আলোকে দেখাই হচ্ছে ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যাপদ্ধতি।

ব্যাপারটা তাহলে দর্শনের সংজ্ঞায় এসে ঠেকলো। তাই না? মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবীর তাবৎ দার্শনিকরা একমত হয়েছেন, দর্শনের এমন কোনো সংজ্ঞা নাই। বলা যায়, দার্শনিকরা (দার্শনিক হিসেবে) যা করেন, যেভাবে করেন, তা-ই দর্শন! এক একজন দার্শনিক দর্শনের এক একটি দিকের উপর গুরুত্বারোপ করে দর্শনের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সেসব বিতর্কে না গিয়ে দর্শনের লক্ষণগত একটা সংজ্ঞা বা পরিচয় এভাবে হতে পারে: কোনো মৌলিক বিষয়ের তত্ত্বগত দিকসমূহকে যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করা। অন্য কথায়, যে কোনো প্রশ্নকে গ্রহণ করা ও তাত্ত্বিক যুক্তি (logical argument) দিয়ে নিজের কথা তুলে ধরা।

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বাইরে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে কিনা— এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। আমার মতে, ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক দু'ধরনের ব্যাখ্যাই হতে পারে। ইসলামের দিক থেকেও তা হতে পারে, ইসলামের বাইরের দিক থেকেও তা হতে পারে। ইসলামের ভেতর থেকে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার অনুমোদন থাকার মানে হলো– ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর পক্ষে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিগুলো কী, তা আলোচনা করা। যেমন: তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত ইত্যাদির পেছনে কী ধরনের দার্শনিক যুক্তি রয়েছে, তা আলোচনা করা। এক্ষেত্রে দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পরস্পর পরিপূরক (complementary) হিসেবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ হিসেবে ইমাম গাজ্জালীর 'তাহাফাতুল ফালাসিফা'র কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর বিবেচনায়, তৎকালীন মুসলিম দার্শনিকদের গৃহীত 'ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক' ২০টি অনুসিদ্ধান্তকে তিনি দার্শনিক যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। ধর্মের বিষয়গুলোকে নিছক ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণের প্রচলিত পদ্ধতির (ফকীহদের পদ্ধতি) পরিবর্তে দার্শনিকদের প্রমাণ-পদ্ধতিতেই তিনি ইসলামের মূল বিষয়গুলোর সমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন। এমন নয় যে, এতে তিনি কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দেন নাই। কোরআন-হাদীসের রেফারেন্স উভয় পদ্ধতিতেই ব্যবহৃত হয়। তফাৎ হলো, ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তা 'দোহাই' বা অবশ্য-মান্য হিসেবে আসে, আর দার্শনিক পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট রেফারেন্সের গুরুত্ব অনুসারে তা 'যুক্তি' হিসেবে আসে। ইমাম গাজ্জালী নিজেকে কখনো দার্শনিক ভাবেন নাই। বইয়ের নামই দিয়েছেন,

'দর্শনের খণ্ডন'! অতএব, বুঝা গেলো, কোনো কিছু দর্শন হয়ে ওঠা সেটির উপস্থাপনা-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। ইমাম গাজ্জালীর দর্শন এই অর্থে একটি যথার্থ দর্শন। অতএব, ইসলামী দর্শন বা এর দার্শনিক ব্যাখ্যা আলোচ্য অর্থে সম্ভবপর এবং তা ইসলামের দিকে থেকে গ্রহণযোগ্যও বটে। বরং বলা যায়, ইসলামী দর্শন ইসলামের একটি অপরিহার্য দিক।

সমস্যা হলো ইসলামী ধর্মতত্ত্বের আওতাবহির্ভূত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 'দার্শনিক ব্যাখ্যা'র গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। ধরা যাক, এ রকম একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা-পদ্ধতিতে ইসলামকে অর্থাৎ ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করা হলো। যেহেতু এটা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দর্শন চর্চা, তাই এটি এক অর্থে ইসলামী দর্শনও বটে। ইসলামকে যিনি সমর্থন করেন তাকেও ইসলামিস্ট বলা যায়। আবার ইসলামকে যিনি ইসলামের ভেতরকার দিক থেকে মানেন না বা সমর্থন করেন না; কিন্তু ইসলাম নিয়ে কাজ করেন তিনিও নিজেকে ইসলামিস্ট দাবি করতে পারেন। অতএব, ইসলাম নিয়ে চর্চিত দর্শনমাত্রই ইসলামী দর্শন, হোক তা ইসলামকে সমর্থন করে কিংবা তা না করে। ইসলামকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করে এর কোনো বিশেষ বিষয়কে (notion অর্থে) গ্রহণ করে বা তাকে ভিত্তি ধরেও দর্শন চর্চা হতে পারে। ইসলামকে locate করার সুনির্দিষ্ট বা অনতিক্রম্য (specific or predefined) কোনো 'ইসলামী' পদ্ধতি আছে কিনা এবং সেখানে কোন ধরনের দার্শনিক পদ্ধতির স্থান কী রকম– তা নিরূপণ করাই এই আলোচনার মূল বিষয়।

ইসলাম নিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দর্শন চর্চার সমস্যা

আমরা জানি, ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ববাদ (unicity of God)। তাওহীদের ধারণা স্রষ্টার অস্তিত্ব, এককত্ব এবং তাঁর সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে ইসলাম-এর মৌলিক বিষয়গুলো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যায় তা যদি বাহ্যিক ও মর্মগত দিক থেকে হুবহু স্বীকার ও প্রত্যয়ন করা না হয় তাহলে দু'ধরনের সমস্যা হতে পারে:

১। ধর্মতাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত অর্থের বিপরীত অর্থ সাব্যস্ত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সরাসরি অস্বীকার করার নামান্তর বা কুফর।

২। এমন ব্যাখ্যা হতে পারে, যা দৃশ্যত ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাথে বিপরীত না হলেও শেষ পর্যন্ত তা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক। যুক্তি-পদ্ধতির যেমন নানা রকম মান ও মাত্রা রয়েছে; কোনো বিষয়ের উপর উপস্থাপিত যুক্তিও নানা

রকম মান ও মাত্রার হতে পারে। সামগ্রিকভাবে না দেখলে এবং প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা না থাকলে একই বিষয়ের বিপরীতমুখী ফলাফল হতে পারে। '১০-এর মান কত?' এটি কোনো প্রশ্নই নয়। কারণ, কত দিয়ে কী (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) করা হচ্ছে, তা পূর্বেই নির্ধারণ না করলে ১০-এর ভিত্তিতে বহু রকমের ফলাফল হতে পারে।

আরেকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মনে করুন, কেউ যুক্তি দিয়ে বললো— যেহেতু আল্লাহ বলেছেন তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল, অতএব আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মানুষকে তিনি দোযখে দিতে পারেন না। স্থায়ীভাবে দোযখে জ্বালানোর কথাগুলো মূলত রেটরিক। নিছক ভয় দেখানোর জন্য সেগুলো বলা হয়েছে! এহেন যুক্তি বা যুক্তিধারা দর্শনসম্মত হলেও ইসলামসম্মত নয়। আমরা জানি— নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, হুদুদ ইত্যাদিসহ ইসলামী শরীয়াহর প্রতিটি বিষয়ের পেছনে কোনো না কোনো যুক্তি, উদ্দেশ্য বা মর্মার্থ রয়েছে, যা মানুষ চিন্তা করলে বুঝতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) সেসব কারণ বা যুক্তির কথা উল্লেখও করেছেন। যেমন: নামাযের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটি মানুষকে অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এখন এই আয়াতকে ভিত্তি ধরলে যিনি অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করেন, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য নামায পড়ার বাধ্যবাধকতা বহাল থাকে না। অথচ, নামায-রোযাসহ সকল ইবাদতের বিষয় এ জন্যই ফরয যে আল্লাহ তা হুকুম করেছেন। যুক্তির সমর্থন বা উদ্দেশ্যের বিষয়গুলো পরিপূরক মাত্র। অতএব, ইবাদতের বিষয়গুলোকে মূলত 'আল্লাহর হুকুম, তাই মান্য'– এভাবে গ্রহণ করা না হলে ইসলামের দিক থেকে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ভাষ্য তৈরির বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য

ইসলামের দিক থেকে ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সদাসর্বদা কি অভিন্ন? না, তা নয়। তাহলে ইসলামসম্মত দার্শনিক ব্যাখ্যার সাথে আলোচ্য ইসলাম কর্তৃক অসমর্থিত দার্শনিক ব্যাখ্যা-ভাষ্যদান পদ্ধতির ফারাকটা কোথায়? ব্যাখ্যা-ধারার বৈপরীত্য অর্থে ভিন্নতা (contradiction in interpretation) এবং বৈচিত্র্য অর্থে ভিন্নতার (plurality in interpretation) মধ্যে এই ফারাক নিহিত। বৈপরিত্য এক প্রকারের ভিন্নতা, আবার ভিন্নতাকেও এক অর্থে বৈপরীত্য বলা যায়। তবে এখানে ভিন্নতা ও বৈপরীত্যকে আমরা আলাদা করেই বুঝবো। একই পথের ডান পাশ, বাম পাশ ও মাঝখান বরাবর চলা– এই তিন ধরনের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে,

বৈপরিত্য নেই। একটি নির্দিষ্ট ধারার ব্যাখ্যা পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য অর্থে ভিন্নতা হতেই পারে। উল্টোভাবে, ভিন্ন আঙ্গিক বা ভিন্ন যুক্তিতে ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। এসবই হলো ইসলামের মধ্যে দার্শনিকতার ক্ষেত্র বা অবকাশ (scope of philosophy in Islam)। দার্শনিকতার অবকাশ থাকা মানে দর্শন চর্চার ইতিবাচক সম্ভাবনা। আবার ইসলাম 'অনুমোদিত' অবকাশকে অতিক্রম করে মুক্তভাবে দর্শন চর্চাও এক প্রকারের ইসলামী দর্শন চর্চা। এই উভয় প্রকারের দর্শন চর্চার পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক ও স্বচ্ছ ধারণা ব্যতিরেকে ইসলামী দর্শনের ক্ষেত্র, সম্ভাবনা ও সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

দর্শন ও ডগমার ডিলেমা

এখানে স্বয়ং দর্শন সম্পর্কেই অধিকতর মৌলিক একটি প্রশ্ন এসে পড়ে। ইসলাম প্রসঙ্গে হোক বা অন্য কোনো বিষয়েই হোক, কোনো ধরনের আপ্তবাক্যকে (dogma) অলংঘনীয় বা 'মৌলিক বিষয়' হিসেবে অক্ষুণ্ন রাখার শর্ত চাপিয়ে দিয়ে, সোজা কথায় চিন্তার সীমারেখা টেনে দিয়ে যুক্তি চর্চার নামে যা হবে, তা কি আদৌ দর্শন হবে? আপাতদৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত জটিল ও অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন। বিশেষ করে, যারা দর্শনকে দর্শনের ভেতর থেকে দেখেননি তাদের কাছে এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন।

আচ্ছা, দর্শনে এমন কোনো তত্ত্ব, মতবাদ, যুক্তিধারা বা এমন কোনো দার্শনিক চিন্তাধারা আদৌ কি আছে বা হতে পারে, যা কোনো না কোনো পূর্বানুমানকে (pre-supposition) অবলম্বন করে সেটিকে বা সেগুলোকে স্বয়ং-সঠিক (self-justified) হিসেবে গণ্য না করে দাঁড়িয়েছে? এর উত্তর হ্যাঁ-সূচক হলে সেই তত্ত্বটির নাম কি? আদতে এ রকম তত্ত্ব বা এ জাতীয় কিছু নাই। কিছু বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েই কোনো বিষয়কে যাচাই করতে হয়। বলা যায়, কোনো না কোনো 'উত্তর'কে ইতোমধ্যে বা যে কোনো প্রকারে গ্রহণ করে নিয়েই ওই বিষয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন করতে হবে। Every question does have some 'answers' and every answer does have some questions। এই যে ধরে নেয়া, দর্শনের ভাষায় এটাকে বলা হয় নির্বিচারবাদ (dogmatism)। নির্বিচারবাদের বিরুদ্ধে দর্শন, আবার দর্শনই কিছু নির্বিচারের উপর নির্ভর করে। আশ্চর্যের ব্যাপার! তাই না? আসুন এ বিষয়কে একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করি।

জ্ঞানের উৎস সংক্রান্ত মতবাদগুলোর অন্যতম প্রধান দুটি হচ্ছে বুদ্ধিবাদ ও

অভিজ্ঞতাবাদ। মূলধারার (পাশ্চাত্য) দর্শনে এ দুটিই মূলত নির্বিচারবাদ (dogmatism)। কেউ বুদ্ধিকে জ্ঞানলাভের অধিকতর গ্রহণযোগ্য উৎস হিসেবে মনে করলে তিনি বুদ্ধিবাদী। আর কেউ পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে আগত অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের মূল বা প্রাথমিক উৎস গণ্য করলে তিনি অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক গণ্য হবেন। বুদ্ধিবাদ কীভাবে নির্বিচারবাদী হয়? জ্ঞানের উৎস সন্ধান বা যাত্রাপথেই যদি 'ধরে নেয়া' হয় যে, বুদ্ধিই জ্ঞানের প্রকৃত বা একমাত্র উৎস; তাহলে তা পথ চলার শুরুতেই গন্তব্যের মূল্যায়ন শেষ করার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একই সমস্যা বা অভিযোগ অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ধারায় আলোচনা করলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এক এক করে সাপ বেরুবে।

তাহলে দর্শনটাই কি সামগ্রিক ও অন্তর্গতভাবে নির্বিচারবাদী!? অথচ আমরা জানি, নির্বিচারবাদ এবং দর্শন— উভয়ই পরস্পরকে খণ্ডন করে। ব্যাপার হলো, দর্শনের কোনো চিন্তাপদ্ধতিই আদতে (in its fundamental level) নির্বিচারবাদমুক্ত (non-dogmatic) নয়। বলা যায়, দর্শনের ভিতরকার এই স্ববিরোধী পরিস্থিতিই মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক নিয়তি (epistemic predicament)। কোনো মাপকাঠির (scale) মাপকাঠি হওয়ার জন্য কোনো আদর্শ মাপ (standard measurement) না থাকা সত্ত্বেও 'মাপকাঠি' মাপকাঠি হয়েছে। হওয়াটা ঠিকই হয়েছে। 'ধরে নেয়া' ধ্রুবক দিয়েই আমরা যাচাই বা পরীক্ষা করি, অন্তত শুরুর দিকটা তা-ই। ধ্রুবক বা স্বতঃসিদ্ধ, সোজা কথায়, মাপকাঠি সম্পর্কে 'কেন?' জাতীয় কোনো প্রশ্ন চলে না। এ ধরনের সার্বজনীন ও মানবিক চিন্তাপদ্ধতির কারণেই জ্ঞান-গবেষণা সম্ভবপর হয়েছে। এই ধরনের চিন্তাধারার ছাঁচে ফেলেই 'স্বেচ্ছাচারিতা'কে 'স্বাধীনতা'র ধারণা হতে আলাদা করে বিবেচনা করা সম্ভব। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা মানেই কোনো না কোনো বিশেষ আঙ্গিকে চর্চা। স্বাধীন মানেই কোনো না কোনো সীমাবদ্ধ জাতীয় 'কিছুর' প্রেক্ষিতে স্বাধীন।

দর্শন, দার্শনিকতা ও দার্শনিক

দর্শন কোনো বিষয়েই একপাক্ষিক (biased) বা চূড়ান্ত (conclusive) কোনো কথা বলে না। যেমন, খোদার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে দার্শনিক যুক্তি চার রকমের (category) হতে পারে:

১। মানুষ ও জগতের স্রষ্টা 'আছে' বলে যারা মনে করেন তাদের মতটি হলো— আস্তিকতা (theism)।

২। স্রষ্টা 'নাই' যারা মনে করেন তাদের মতটি হলো— নাস্তিকতা (atheism)।

৩। মানুষ ও জগতের একজন বা একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকতেও পারে, নাও থাকতেও পারে; এখনো নিশ্চিত নন বা কখনোই নিশ্চিতযোগ্য নয়, তবে বিষয়টিকে একটি বিবেচ্য বিষয় হিসেবে যারা মনে করেন তাদের মত বা অবস্থানকে বলা যায়— অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism)।

৪। অপরদিকে মানুষ ও জগতের স্রষ্টা থাকা কিংবা না থাকা সংক্রান্ত পুরো বিতর্ক ও বিষয়টিকে যারা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন তাদেরকে আমরা নির্বিকারবাদের (irrelevantism) ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করতে পারি।

অজ্ঞেয়বাদের সাথে নির্বিকারবাদের পার্থক্য হলো, অজ্ঞেয়বাদ বিষয়টিকে (issue) স্বীকার করে (to take in cognizance)। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদের এই অবস্থানটা হলো 'not yet' ধরনের। খোদার অস্তিত্ব প্রশ্নে এ চারটি অবস্থা বা অবস্থান কিংবা মতের সব কয়টিই দর্শন-এর অবস্থান, মত বা তত্ত্ব। এগুলোর আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে ব্যক্তিবিশেষের একটি অবস্থান শেষ পর্যন্ত উঠে আসে। সেটি হতে পারে আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ কিংবা নির্বিকারবাদ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে কেউ এই সবগুলো তত্ত্বই পড়বেন। তা সত্ত্বেও, দর্শন চর্চাকারী ব্যক্তি তথা একজন দার্শনিকের অবস্থান সব সময়ই কোনো না কোনো একটি মতের পক্ষে থাকে, যেটিকে তিনি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। এমনকি জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে মাঝামাঝি বা নিরপেক্ষ অবস্থানও একটি পক্ষ, সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা abstain করা বলি। রেফারি টাইপের কারো জন্য সেটিই সর্বাধিক যুক্তিসম্মত অবস্থান হতে পারে। এ ধরনের চিন্তার সূত্রে IBE'র (Inference to the best explanation) মতো 'মৌলিক সূত্র' ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রশ্নে উপরের যে কোনো একটি পক্ষ, অবস্থান বা মতকে দর্শনসম্মত কিংবা দার্শনিক মত হিসেবে গ্রহণ এবং অপরাপরগুলোকে বর্জন করা সম্ভব। আসলে দর্শনে তো কোনো 'প্রমাণ' নাই, হতে পারে না। অধিকতর গ্রহণযোগ্য যুক্তিকে (argument) আমরা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ, উপস্থাপন ও অনুসরণ করি।

যাহোক, দর্শন ও দার্শনিকের এই পার্থক্য যদি আমরা বুঝি তাহলে এতক্ষণে এটা খুবই পরিষ্কার যে ইসলামী ধর্মতত্ত্বের আওতাবহির্ভূত 'দার্শনিক ব্যাখ্যা' কেন এবং কোন্ যুক্তিতে ইসলামের দিক হতে গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মতাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত ইসলাম-এর আওতার মধ্যে থেকে কীভাবে 'দর্শনচর্চা' সম্ভব, তাও উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায়।

আগেই বলেছি, ইসলামের সমর্থন এবং বিরোধিতা উভয় প্রকারের দর্শনই 'ইসলামী

দর্শন'। সোজা কথায়, 'ইসলাম নিয়ে দর্শন চর্চা' মাত্রই তা ইসলামী দর্শন হিসেবে গণ্য হবে। যেমন, মনোদর্শন। যারা বস্তু অতিরিক্ত একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা 'মন'-এর অস্তিত্ব থাকার পক্ষে যুক্তি দেন, তারাও মনোদার্শনিক। আবার এ ধরনের কোনো 'মন'-এর অস্তিত্বের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যারা যুক্তি দেন, তারাও মনোদার্শনিক হিসেবে গণ্য। ধর্মদর্শন হলো মূলধারার দর্শনের একটি পরিচিত শাখা। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা বা খণ্ডন করা— এর কোনোটিই ধর্মদর্শনের কাজ নয়। আবার ধর্মদর্শনের যত আলোচনা তার প্রত্যেকটি শেষ পর্যন্ত ধর্মের পক্ষ বা বিপক্ষেই যাবে। ব্যাপার হলো, ধর্মকে নিয়ে দর্শন চর্চা, তা ধর্মের পক্ষেও যেতে পারে, বিপক্ষেও যেতে পারে। যে কোনো অবস্থাতেই তা দর্শন, যদি তাতে যুক্তির ব্যবহার থাকে। এই যুক্তির উপস্থাপনায় ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স আসতে পারে। তবে তা ধর্মের পদ্ধতিতে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য-মান্য (dogma) হিসেবে নয়।

ইসলাম ব্যাখ্যার ইসলামসম্মত পদ্ধতি

ইসলামের উন্মুক্ত ব্যাখ্যা-ভাষ্য পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক দুটি উৎস কী বলে, এবার তা খানিকটা খতিয়ে দেখা যাক। ইসলাম স্বয়ং কোরআনকে বুঝা, ইসলামকে মানা বা বুঝা ও ইসলামের ব্যাখ্যাদান পদ্ধতি (way of interpretation) পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে।

আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন,

> "পাঁচটি বিষয়ের উপর কোরআন নাযিল হয়েছে: (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকাম, (৪) মুতাশাবিহ ও (৫) আমসাল (বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ঘটনাবলি)। সুতরাং, তোমরা হালালকে হালাল জানবে। হারামকে হারাম মানবে। মুহকামের উপর আমল করবে। মুতাশাবিহের উপর ঈমান রাখবে। আর আমসাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।"
>
> [মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদীস নং ১৮২]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে তিনি বলেছেন,

> "করণীয় তিন প্রকার: এমন করণীয় যা স্পষ্টতই ভালো, তা পালন করো। এবং এমন করণীয় যা সুস্পষ্টভাবে মন্দ, অতএব তা পরিহার করো। এবং সেই কাজ যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে, তা মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর উপর ন্যস্ত করো।"
>
> (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদীস নং ১৮৩)

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক কোরআনে দুই ধরনের আয়াত রয়েছে: (১) আয়াতে মুহকাম (সুস্পষ্ট আয়াত) এবং (২) আয়াতে মুতাশাবিহ (রূপক অর্থের আয়াত)। এ সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের আয়াতটি স্ব-ব্যাখ্যাত (self-explanatory)। আল্লাহ বলছেন,

> "তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কিছু আয়াত 'মুহকাম', এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ', যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহসমূহের পেছনে লেগে থাকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা গভীর জ্ঞানী তারা বলে, 'আমরা এগুলোর উপর ঈমান এনেছি। এসব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত। এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"
>
> [সূরা আলে ইমরান: ৭]

উল্লেখ্য, "বলো, আল্লাহ অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো পুত্র নন, কারো পিতাও নন। তার সমকক্ষ কেউ নাই।" কিংবা, "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো" ইত্যাদি ধরনের আয়াত হলো মুহকাম আয়াত। আবার "আল্লাহ হলেন আলোর ভিতর আলো [নুরুন আলা নুর]" এ ধরনের আয়াতগুলো হলো মুতাশাবিহ আয়াত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুহকাম আয়াতসমূহকে মান্য করতে হবে। কিন্তু সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফকীহদের মধ্যে যেসব মতানৈক্য হয়েছে, তার কী হবে? আল-কোরআনকে সামঞ্জস্য (consistent) হিসেবে মানবো কিনা, তা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বীয় যুক্তি ও বুদ্ধির দাবিকে মেনে নিয়ে যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তাদের পরবর্তী কাজ হলো আপাত বিরোধের আড়ালে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যতাকে খুঁজে বের করা। ফিকাহর ভাষায় যাকে 'তাহকীক' বলা হয়। অতএব, ইসলামকে সামগ্রিকভাবে (holistically) গ্রহণ করাটা ইসলামের দিক থেকে অবশ্য কর্তব্য। ইসলামের কোনো একটা বা কয়েকটা দিককে গ্রহণ করে কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করলে তা, এমনকি তার সবকটি উপাদান, স্বতন্ত্রভাবে ইসলামসম্মত হওয়ার মতো পরিস্থিতিতেও সর্বোপরি বিষয়টি ইসলামবহির্ভূত হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

> "... তোমরা কি (তাহলে) আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো?"
>
> [সূরা বাকারা: ৮৫]

কোন ব্যক্তিবর্গের আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে ইসলামের কোনো বিশেষ বিষয়ে সঠিক মত হিসেবে নিতে হবে, সে সম্পর্কে ইসলামে পরিষ্কার ভাষায় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

> "আমার পর তোমাদের মধ্যে লোকেরা শীঘ্রই নানা মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নত এবং সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের রীতিনীতি দাঁতে কামড়ে ধরার মতো করে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে নতুন কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।"

[আহমদ, আবু দাউদ, তিরমীযী ও ইবনে মাজাহ সূত্রে মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ১৬৫]

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন,

> "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যে পর্যন্ত তোমরা এ দুটি মজবুতভাবে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পথ হারাবে না। এ দুটি হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ।"
>
> [মুয়াত্তা সূত্রে মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ১৮৬]

ইসলাম অনুসরণ করার ব্যাপারে বহুত্ব শুধু নয়, বৈপরিত্যও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমভাবে অনুমোদিত। সফরে রোযা রাখা না রাখা, বনু কুরাইযাতে পৌঁছতে গিয়ে এক দল কর্তৃক আসরের নামায পথিমধ্যে পড়া এবং আরেক দল কর্তৃক কাযা করা, অবরোধ চলাকালীন শত্রুপক্ষের ফলবান খেজুর গাছ কাটা বা না কাটা ইত্যাদি এর উদাহরণ। ইসলামে ব্যাখ্যাগত বৈচিত্র্য দেখা যায় শরীয়াহর ক্ষেত্রে। কিন্তু আকীদার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আকীদাগত তথা ফিলোসফিক্যাল আসপেক্টে ইসলাম কোনো প্রকার সমঝোতা অনুমোদন করে না। বলা যায়, এই একটি ক্ষেত্রে ইসলাম সাদা-কালো নীতি অনুসরণ করে। এমনকি আস্তিকতার কেবল একটি সুনির্দিষ্ট ভাষ্যকেই ইসলাম অনুমোদন করে।

"নিশ্চয়, আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম" অথবা, "তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করো না"— এ ধরনের আয়াতসমূহের তাৎপর্য খুবই পরিষ্কার। আমলের ক্ষেত্রে অপারগ পরিস্থিতিতে

কমবেশি করার অনুমোদন থাকলেও ইসলামের আকীদা তথা ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এর অনুমোদন নাই। ইসলামের ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিজের মতো করে নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নাই। উপরের হাদীসগুলো ভালো করে পড়লে দেখা যাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) যেভাবে বলেছেন ও সাহাবাগণ যেভাবে বুঝেছেন– তার বাইরে গিয়ে ইসলামের কোনো 'ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং' হাজির করার এখতিয়ার ইসলাম কাউকে দেয় না।

> "একবার উমর (রা.) রাসূলের (সা.) নিকট এসে বললেন, 'আমরা ইহুদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কথাবার্তা শুনে থাকি, যা অত্যন্ত চমৎকার মনে হয়। এগুলোর কিছু লিখে রাখতে আপনি আমাদের অনুমতি দেবেন কি?' রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, 'ইহুদী-খৃস্টানদের মতো তোমরাও কি দ্বীনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছো? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দ্বীন নিয়ে এসেছি। মুসাও (আ.) যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁকেও আমাকে অনুসরণ করতে হতো।"
>
> [মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদীস নং ১৭৭]

এই হাদীস অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলামের উৎস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। দর্শন তো দূরের কথা, অন্য ধর্মের কোনো গ্রন্থকেও প্রাইমারি সোর্স হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

ইসলামে দর্শনের পরিসর

তাহলে আগের সেই কথা আবার এসে যায়— ইসলামে দর্শন চর্চার সুযোগ কিংবা পরিসর কী? বুদ্ধিগত জ্ঞানকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে যেমন বুদ্ধিবাদ চর্চা হয়ে আসছে, অভিজ্ঞতাকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে যেমন অভিজ্ঞতাবাদের সব তত্ত্ব চর্চা হয়ে আসছে; তেমনিভাবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অনুকূলে ইসলামী দর্শন চর্চা সম্ভব। এর বাইরে 'ইসলাম'-এর বিষয় নিয়ে দর্শন চর্চা হতে পারে। তবে তা ইসলামসম্মত নয়। যদিও তা জানাটা ইসলামের ভেতরকার অবস্থান থেকে (ইসলামী) দর্শন চর্চার জন্য অপরিহার্য। উল্লেখ্য, অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মতো মূল শাখাসমূহ ব্যতিরেকে দর্শনের অপরাপর সব শাখা 'philosophy of something' প্যাটার্নে পরিচিত, পঠিত ও চর্চিত হয়। যেমন, philosophy of language ইত্যাদি। এভাবে ইসলামী দর্শনও দর্শনেরই একটি শাখা বিশেষ। দর্শনের প্রচলিত বিষয়বস্তুর কোনোটিই ইসলামী দর্শনের আওতাবহির্ভূত নয়।

ইসলাম সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহ তথা কোরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত মূল পরিভাষা হচ্ছে ‘দ্বীন’। দ্বীন অভিন্ন ও অবিভাজ্য। বাংলায় সাধারণত দ্বীনকে ‘ধর্ম’ হিসেবে অনুবাদ করা হয়, আর ইংরেজিতে religion। ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা– এগুলো আমাদের বলা বা উপস্থাপনাগত ব্যাপার। ইসলামের ভেতর থেকে ইসলাম একটি দ্বীন। কেউ মানুক বা না মানুক কিংবা আংশিক মানুক, অথবা ‘আদ্-দ্বীন’-এর কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কোনো ককটেল বানাক, সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপার। দ্বীন হিসেবে ইসলাম প্রথমত ধর্ম, এরপর দর্শন বা আর যা কিছু। ইসলামের দিক থেকে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মোকাবেলায় দার্শনিক ব্যাখ্যা তাই গ্রহণযোগ্য নয়। উপরে উল্লিখিত কোরআন এবং হাদীসের উদ্বৃতিসমূহ এ বিষয়কে নিশ্চিত করে। অবশ্য ইসলামের উপর যারা স্বীয় মর্জি-মোতাবেক একটি ব্যাখ্যা চাপিয়ে দর্শনের নামে একে লেজিটিমেট করতে চাইবেন, তারা উপরোল্লিখিত সুস্পষ্ট ও স্বব্যাখ্যাত সূত্রগুলোসহ এ ধরনের তাবৎ দলীল-প্রমাণকে নিছক ‘ধর্মতাত্ত্বিক’ হিসেবে নাকচ করে দেয়ার ‘অধিকার’ (?) রাখেন!

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রচেষ্টা কি আদৌ নিরপেক্ষ?

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়ের কথা যারা বলেছেন, তারা ধর্মের উপর দর্শনকে চাপিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে ধর্মকে নাকচ করেছেন। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ স্পষ্টত ধর্মবিরোধী। অজ্ঞেয়বাদ ও নির্বিকারবাদ যেমন মূলত নাস্তিকতাবাদ, তেমনি যারা ধর্মকে ফিলোসোফাইজ করতে চান, ধর্মের রেফারেন্সমুক্ত ইন্টারপ্রিটেশন দাঁড় করাতে চান তারা আদতে ধর্মেরই গোড়া কাটার লোক। ধর্মের সমর্থনে যদি দর্শন হতে না পারে, তাহলে আল-গাজ্জালীকে দার্শনিক গণ্য করাটা আগাগোড়াই ভুল। স্মরণ করা যেতে পারে, মুসলিম দর্শনের দুনিয়াজোড়া সব পাঠক-পণ্ডিতই মনে করেন, আবু হামিদ আল-গাযালী হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক।

যাহোক, ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রচেষ্টার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে ইবনে রুশদের নামটি সবার উপরে ভেসে উঠে। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের অনুসারী। অ্যারিস্টটল দার্শনিক আলোচনা অনুধাবনের সক্ষমতা-অক্ষমতার নিরিখে মানুষকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। অ্যারিস্টটলের শিক্ষক প্লেটো তার কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। বিশিষ্ট peripatetic (pro-Greek) দার্শনিক হিসেবে ইবনে রুশদও নাগরিকদেরকে জ্ঞানগত তারতম্যের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

১। আলঙ্কারিক (rhetoric) পদ্ধতি— জনসাধারণের পদ্ধতি
২। যুক্তিসিদ্ধ (dialectical) পদ্ধতি— ধর্মতাত্ত্বিকদের পদ্ধতি
৩। প্রতিপাদক (demonstrative) পদ্ধতি— দার্শনিকদের পদ্ধতি।

'দার্শনিকদের জন্য আলাদা ও সর্বোচ্চ মর্যাদা'— এই পদ্ধতির দলীল হিসেবে তিনি উপরে উদ্বৃত সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতকে একটি মৌলিক পরিবর্তনসহ উল্লেখ করেন। উক্ত আয়াতে 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না' এরপর একটি ওয়াকফে লা'যেম (অত্যাবশ্যকীয় বিরতি চিহ্ন) রয়েছে। দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত কোরআনের সকল কপিতেই এটি রয়েছে। কিন্তু ইবনে রুশদের প্রস্তাবনায় এই ওয়াকফে লা'যেম চিহ্নটি হবে 'আর যারা গভীর জ্ঞানী' এর পরে। তাতে করে আয়াতটির পাঠ দাঁড়ায় এমন: 'আল্লাহ এবং যারা গভীর জ্ঞানী, তারা ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।'

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিকল্প হিসেবে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে ইবনে রুশদের এই ব্যাখ্যাও মেনে নিতে হয়! মানুষের মধ্যে জ্ঞানগত পার্থক্য কি নাই? যদি থাকে তাহলে একে ভিত্তি ধরে মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কয় ধরনের হতে পারে? এসব প্রশ্ন তৈরি হওয়া যতটা স্বাভাবিক, এর উত্তরও ততটাই সহজ। জ্ঞানগত দিক থেকে মানুষে মানুষে বেশকম হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এ বিষয়টি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও এর ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীবিন্যাসকরণ ভুল।

জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষেকে তিন বা চার ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা চার, পাঁচ, ছয়, সাত ইত্যাদি অনেক ভাগেই ভাগ (category) করা সম্ভব। তবে এই বিভাজন ও প্রত্যেক গ্রুপের নিজেদের মতো করে টেক্সট ব্যাখ্যার বৈধতা থাকলে ইসলাম বা অনুরূপ তাৎপর্যপূর্ণ কোনো বিষয়েরই স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে না। এ বিষয়ে অর্থাৎ ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যের সাথে ব্যাখ্যার বৈপরিত্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের জ্ঞানগত পার্থক্যকে ইসলাম বাস্তবসম্মত মনে করে। কোরআন ও হাদীসের প্রচুর রেফারেন্স রয়েছে যাতে জ্ঞান, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানীর উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানগত দিক থেকে মানুষ দুই ধরনের: যারা জানে আর যারা জানে না। যারা জানে না, তাদের দায়িত্ব হলো যারা জানে তাদের কাছ হতে জেনে নেয়া। কে জানে আর কে জানে না, তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। অতএব, এমনও হয় কিংবা হতে পারে— কেউ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্যদের তুলনায় বেশি জানে। অথচ একই ব্যক্তি অন্য কোনো বিষয়ে কম জানে।

অতএব, কে বেশি জানে আর কে কম জানে তা জানার কোনো বিষয় ও প্রেক্ষাপট নিরপেক্ষ পদ্ধতি নাই। মানুষের জ্ঞানগত মর্যাদা নিরূপণের বিষয়ে ইসলাম অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ (objective)। যিনি (বেশি) জানেন তিনি স্বীয় জ্ঞানের দাবি অনুসারে কাজ করবেন বা করতে চাইবেন। সংশ্লিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতিই প্রমাণ করবে, তার উক্ত দাবি সঠিক কিনা বা কতটুকু সঠিক। আলেমে দ্বীন, ফকীহ, মুজতাহিদ ইত্যাদি মর্যাদাপূর্ণ শব্দাবলীর মাধ্যমে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচনার অধিকার (authority) বুঝায় না। এগুলো বরং কিছু ব্যক্তির জ্ঞানগত আধিক্য ও পরিশুদ্ধিকে নির্দেশ করে মাত্র।

অধ্যায় ৩

ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তার স্বাধীনতার সামাজিক প্রেক্ষিত

অন্যান্য মতাদর্শের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে ইসলামের ইতিবাচক অনন্যতা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

ইসলাম একটা মতাদর্শ। কোরআনে একে দ্বীন বলা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে জীবনব্যবস্থা। এমন এক জীবনব্যবস্থা যার মধ্যে দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও যুদ্ধ সংক্রান্ত মূলনীতিসহ রয়েছে মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত সব বিষয়।

ইসলামকে যারা সামগ্রিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে দাবি করেন তারা মনে করেন, ইসলাম এমন একটা ধর্ম যার মধ্যে আছে রাজনীতিসহ সবকিছু। আমি এ ধরনের অবাস্তব দাবির বিরোধিতা করি। এ নিয়ে আমার বিস্তারিত লেখা আছে। আজ সংক্ষেপে অন্য একটা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করবো। সেটি হলো অন্যান্য মতবাদ ও আদর্শের সাথে ইসলামের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সম্পর্ক।

ইসলামপন্থীরা সাধারণত মনে করেন, ইসলাম এমন একটা ধর্ম বা আদর্শ যার সাথে অন্যান্য ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শের কোনো মিল নাই। তাদের ধারণা, এই ধরনের নেতিবাচক তথা exclusionist অর্থেই ইসলাম অনন্য। ইসলামকে আমিও অনন্য মনে করি। তবে আমার ধারণা, অন্যান্য মত ও পথের সাথে এর কমবেশি মিল-অমিল দুটোই রয়েছে। অপরাপর প্রত্যেকটা মতবাদের রয়েছে কিছু সদর্থক দিক, কিছু নঞর্থক দিক। ইসলামের অনন্যতা এখানেই যে এটি অন্যান্য মতাদর্শের সদর্থক দিকগুলোকে যথাযথভাবে ধারণ করে। সাথে সাথে অনন্য সাধারণ ব্যঞ্জনায়

সেসব মতবাদ ও আদর্শের অসামঞ্জস্য ও ত্রুটিসমূহকে সংশোধন করে। অর্থাৎ, নঞর্থক দিকগুলোকে খণ্ডন ও বর্জন করে। এ ধরনের গ্রহণ, সংশোধন ও বর্জনের অতিরিক্ত হিসেবে, এমন বিশেষ কিছু সদর্থক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে যা অন্য কোনোটার মধ্যে পাওয়া যায় না। আমার বিবেচনায়, ইসলামের অনন্যতা এইখানে।

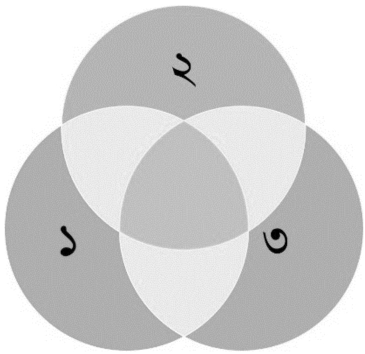

আমরা জানি, একাধিক বৃত্ত যখন একটি অপরটির সাথে জড়িয়ে থাকে, তখন সেই বৃত্তগুলোর প্রত্যেকটি অপরগুলোর কিছু অংশ ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ, কিছু অংশ হয় অভিন্ন। আবার কিছু স্বাতন্ত্র্যও থাকে। উপরের চিত্রে আমরা এমনটিই দেখছি।

প্রতিক্রিয়াশীল মন-মানসিকতার লোকেরা অর্ধেক পানিভর্তি গ্লাসের খালি অংশটুকুই বেশি দেখে। একইভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন অনুসারীরা স্বীয় আদর্শের সাথে 'অপর আদর্শের' যেটুকু বেমিল, সেটুকুই বেশি চোখে পড়ে। যার ফলে অভিন্ন অংশের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক, অন্তত ওয়ার্কিং রিলেশন গড়ে তোলার সম্ভাবনা তাদের কাছে বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। তাই ঐক্যের পরিবর্তে পরস্পরকে নির্মূলকরণকেই তারা একমাত্র কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে। অগত্যা একসাথে থাকতে বাধ্য হলেও পরস্পরকে তারা ঘৃণা ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

'অপরের' প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণার ভিত্তিমূলের উপর কোনো আদর্শের টেকসই সৌধ নির্মাণ অসম্ভব। সব মানুষের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসাই হলো যে কোনো মানবিক সমাজের ভিত্তি।

এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমার এ কথাগুলো অংকের সূত্র বা জ্যামিতির আকারের মতো সত্য। যে কোনো আদর্শের দিক থেকে আপনি এই 'মতাদর্শগত বৃত্ত-সূত্রকে' মিলিয়ে দেখতে পারেন। আমারও ইচ্ছা আছে ইসলামের সাথে বর্তমান

জমানায় প্রচলিত ধর্ম, মত ও আদর্শসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরার, যাতে করে হাতেকলমে সবাই বিষয়টা ভালো করে বুঝে নিতে পারে। যারা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ও নেতিবাচক মানসিকতার কারণে বুদ্ধিবিকল, তাদের কথা ভেবে লাভ নাই। চিন্তাশীলদের জন্য এসব কথাবার্তা।

‘ভালোভাবে’ লিখবো— এই ‘ফেতনার’ কবলে পড়ে এতদিনেও অত্যন্ত মৌলিক এই লেখাটা লেখা হয়ে ওঠে নাই। এ জন্য প্রায় সময়েই আফসোস হয়। ভাবলাম, যা-ই হোক, মূল কথাটুকু লিখে দেই। আসলে প্রত্যেকটা আদর্শের আছে একটা তাত্ত্বিক দিক। একটা কর্মপরিকল্পনার দিক। এর সাথে আছে এর অনুসারীগণ কর্তৃক একে বাস্তবায়নের ইতিহাস। এসব কিছু নিয়েই একটা আদর্শ। কোনো কোনো মতবাদ ও আদর্শের ক্ষেত্রে তত্ত্বটা এক নম্বর জিনিস। আবার কোনো কোনো আদর্শের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনাটাই মুখ্য। তত্ত্বটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংশ্লিষ্ট মতবাদ বা আদর্শটিকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এর অনুসারীদের হাতে ভালোমন্দ মিলিয়ে যে ইতিহাস ও বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, আদর্শবিশেষকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। অবুঝ ও অত্যুৎসাহী অনুসারীদের হাতে আদর্শের অপব্যবহারের বিষয়টি সব আদর্শের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। আদর্শকে তত্ত্ব ও কর্মপরিকল্পনার মূল প্রস্তাবনার পরিবর্তে, অর্থাৎ এর তাত্ত্বিক সুসামঞ্জস্যতার পরিবর্তে নিছক ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে মূল্যায়ন করার প্রচলিত প্র্যাকটিস, আমার দৃষ্টিতে, ভ্রান্ত ও বিভেদমূলক।

ইসলামের দিক থেকে যদি বলি, ইসলামের সাথে ‘মানব রচিত’ সকল মত, পথ, তত্ত্ব ও আদর্শের রয়েছে অনস্বীকার্য কমন গ্রাউন্ড বা সাযুজ্যতা। সেটি তত্ত্ব ও কর্মপরিকল্পনা, উভয় ক্ষেত্রেই। একটা তত্ত্ব বা আদর্শ গড়ে উঠার প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, উপাদান, পর্যায় ও যুক্তিধারার সাথে অন্য একটা পার্টিকুলার তত্ত্ব বা আদর্শ নির্মাণের প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, উপাদান, পর্যায় ও যুক্তিধারার বেশ খানিকটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আগানোর এক পর্যায়ে একটা এক দিকে মোড় নিয়েছে, অন্যটা আরেক দিকে বাঁক নিয়েছে। অবশ্য কোনো দুটি আদর্শ অভিন্ন প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, উপাদান, পর্যায় ও যুক্তিধারাসম্পন্ন নয়। এসব ফ্যাক্টরের ভিন্নতার কারণে একই মতবাদ ও আদর্শেরও ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য গড়ে উঠে।

দুটি ভিন্ন উপসংহার মানে রচনা দুটি শুরু থেকে উপসংহারের আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এমন নয়। এমনকি, উপসংহারের ভিন্নতা মানেও এই নয় যে এর সব বিশেষ খণ্ডাংশগুলোও স্বতন্ত্র। এমনকি একই কথাবার্তা বা বাক্যাংশের ভিন্নতর

অ্যারেঞ্জমেন্টের কারণে শেষ পর্যন্ত মর্মার্থ ভিন্নতরও হয়ে যেতে পারে।

এসব নিছকই তাত্ত্বিক কথা। ইসলামের সাথে এক একটা আদর্শের স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনা না করলে সব পাঠকের কাছে আমার এ কথাগুলো পুরোপুরি ক্লিয়ার হবে না। বুঝতে পারছি। তারপরও কখন নাই হয়ে যাই, বলা তো যায় না। এই অনুভূতির ফলে বলে রাখার জন্যই এটুকু বলা।

ইসলাম, সুবিচার ও রাজনীতি

আহমদ বিন সাদ হামদান আল-গামিদী

অনুবাদ: আসিফ সিবগাত ভূঞা

যেখানে সুবিচার, সেটাই আল্লাহর বিধান (حيث كان العدل ثم شرع الله)

সুবিচার (আদল)**:** প্রত্যেককে প্রাপ্য অনুযায়ী বুঝিয়ে দেয়া এবং তা থেকে কিছু না কমানো। কোনো নিকটজনকে স্বজনপ্রীতি দেখানো যাবে না, আর দূরের কারও প্রতি জুলুম করা যাবে না।

আমাদের রব আযযা ওয়া জাল্ল সুবিচার করতে আদেশ করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। বিপরীতটাকেও — অর্থাৎ জুলুম করা বা অত্যাচার-নিপীড়ন করা — নিষেধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন সুবিচার, ভালো আচরণ ও নিকটাত্মীয়দের দান করার ব্যাপারে এবং নিষেধ করেন অনৈতিকতা, মন্দ চরিত্র ও সীমলংঘন করাকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণে রাখো।"
>
> [সূরা নাহল: ৯০]

ড. আহমদ বিন আল-গামিদী "তাজদীদুল ফিকহুস সিয়াসী ফীল মুজতামায়াল ইসলামী" গ্রন্থে রাজনীতির ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক চারটি ইসলামিক মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে তৃতীয় মূলনীতিটি এখানে অনূদিত হলো।

মানুষের মাঝে সবার আগে যাদের উপর সুবিচারের দায়িত্ব, তারা হলেন মানুষের অধিপতি ও নেতারা, যাদের হাতে জাতির নেতৃত্ব সমর্পিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন যে তোমরা আমানতসমূহ এর প্রাপকদের বুঝিয়ে দেবে এবং যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন সুবিচার করবে। কত উত্তম যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।"
>
> [সূরা নিসা: ৫৮]

সুবিচারকারী অধিপতিদের কর্তৃত্বে সমাজ নিরাপদ ও শান্তিতে থাকে, ফলে জীবন স্থিতিশীলভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অপরদিকে অত্যাচারী শাসকদের অধীনে সমাজ থাকে ভয় বিহ্বল, ফলে জীবন হয় পর্যুদস্ত এবং অগ্রগতি নস্যাৎ হয়ে যায়।

পশ্চিমা দেশগুলোর জীবনযাত্রার সাথে মুসলিম দেশগুলোর জীবনযাত্রার তুলনা করলে আমরা দেখবো, পশ্চিমা দেশগুলোতে জীবন অনেক অগ্রগামী ও উন্নত। অপরদিকে মুসলিম দেশগুলোতে জনজীবন পিছিয়ে পড়েছে এবং হোঁচট খাচ্ছে। অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে এই মুসলিম দেশগুলোকে এখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। কারণ, তাদের দেশে রয়েছে সুবিচার এবং মুসলিম দেশগুলোতে জুলুম।

আল্লাহ সুবহানাহু সুবিচারের আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু সুবিচার হাসিলের কোনো নির্দিষ্ট পথ বা মাধ্যম বাতলে দেননি। এ থেকে বোঝা যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপায় ও পদ্ধতিসমূহ সুনির্দিষ্ট নয়।

যারা ধর্মের বাস্তবতাকে ঠিকমতো জানেন না তাদের মনে একটা ধারণা কাজ করে যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতির ব্যাপারে ধর্মের সুনির্দিষ্ট দলীল বা প্রমাণ থাকতে হবে। এই দলীল ঠিক করে দেবে কীভাবে সুবিচার কায়েম করা যায় এবং এভাবে ছাড়া সুবিচার প্রতিষ্ঠার আর সকল পদ্ধতিই নিষিদ্ধ। তারা মনে করছেন, শরীয়ার সকল লক্ষ্য ও সেসব লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমগুলো শরীয়ার নির্দিষ্ট বিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত (তাওকীফি)। এই ধারণা মাথায় নিয়ে তারা উম্মতের জন্য সে জিনিসগুলোকে সংকুচিত করে দিয়েছেন, যা আদতে ছিলো বিস্তৃত। এই সংকীর্ণ ধারণার অশুভ প্রভাব পড়েছে সুবিচার প্রতিষ্ঠার কাজে।

শরীয়ার বাস্তবতার ব্যাপারে জ্ঞানের এই ঘাটতি আসলে নতুন কিছু নয়। হাজার

বছরও আগেও উম্মতের কতিপয় ফুকাহার (ইসলামী আইনবেত্তা) চিন্তার মাঝে বুঝাপড়ার এই সীমাবদ্ধতা দেখতে পাওয়া যায়।

ঠিক এরকম একটি বিষয়ে ইমাম ইবনে আকীল [৪০১ – ৪৯৩ হি.] ও তাঁর সময়ের কয়েকজন ফুকাহার মাঝে আমরা বিতর্ক হতে দেখি। বিতর্কের বিষয়বস্তু হলো— কোনো প্রদেশের গভর্নর কীভাবে তার এলাকায় সুবিচার কায়েম করবেন। ওই ফুকাহাদের ধারণা ছিলো— সুবিচার কায়েমের পদ্ধতি অবশ্যই শরীয়ার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হতে হবে এবং এর পেছনে শরীয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকতে হবে।

তাদের এই ধারণাকে ইবনে আকীল নাকচ করে দেন এবং বলেন: যে কোনো পদ্ধতি — যা দিয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং শরীয়া যাকে নিষেধ করেনি — শরীয়া সমর্থিত; যদিওবা সে ব্যাপারে শরীয়তে স্পষ্ট কোনো ভাষ্য নাও থাকে।

ইবনুল কায়্যিম এই বিতর্কটি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে আকীলের মতকে সমর্থন জানিয়েছেন।

ইবনুল কায়্যিম [৭৯১ – ৮৫১ হি.] শরীয়ার বিধানগুলোকে কীভাবে বুঝতে হবে তা নিয়ে এক জায়গায় কথা বলছিলেন। কট্টরপন্থী অনেক আলেমের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়েও শরীয়ার বিধানগুলো যে আসলে আরো বেশি প্রশস্ত, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন:

"ইবনে আকীল বললেন: রাজনীতি (সিয়াসাহ) করাটা তো অবধারিত, কোনো নেতা (ইমাম) তা থেকে মুক্ত নন। তখন আরেকজন বললেন: শরীয়া যেটাকে সম্মতি দিয়েছে সেটা ছাড়া কোনো রাজনীতি হতে পারে না।

তখন ইবনে আকীল বলেন: রাজনীতি হলো সেসব কাজ যার মাধ্যমে মানুষ কল্যাণের সবচেয়ে কাছে থাকে এবং অন্যায়-অবিচার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে; যদিও সেটার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) স্পষ্ট বিধান নাও দিয়ে যান এবং এ ব্যাপারে কোনো ওহী নাযিল নাও হয়ে থাকে। সুতরাং, তুমি যে কথাটা বললে যে শরীয়া যেটাকে সম্মতি দিয়েছে সেটা ছাড়া কোনো রাজনীতি হতে পারে না — এই কথা দিয়ে যদি তুমি এটা বুঝিয়ে থাকো যে শরীয়ার ভাষ্য বা টেক্সটকে লঙ্ঘন করা যাবে না, তাহলে ঠিক আছে।

কিন্তু তোমার কথার মানে যদি এটা হয়ে থাকে যে শরীয়া যেভাবে বলেছে সেভাবেই রাজনীতি হতে হবে, তাহলে এটা ভুল এবং এর মাধ্যমে সাহাবীদের ভুল প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। কেননা, খুলাফায়ে রাশিদীনদের কাছ থেকে এমন অনেক অনেক

মৃত্যুদণ্ড ও শাস্তির বিধান আমরা পাই, যা ইতিহাস ও জীবনী নিয়ে গবেষণাকারী আলেমগণ অস্বীকার করেন না। আর সব বাদ দিলেও কোরআনের কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্তটির কথা অন্তত উল্লেখ করা যায়, যা তারা কেবল কল্যাণের কথা চিন্তা করেই করেছেন। একইভাবে আলী (রা.) কর্তৃক কতিপয় যিন্দিক বা ধর্মদ্রোহীকে পুড়িয়ে মারা, বা উমর (রা.) কর্তৃক নাসর বিন হাজ্জাজকে নির্বাসিত করার কথাও বলা যায়।"

ইবন আকীলের এই বক্তব্য উল্লেখ করে ইবনুল কায়্যিম বলেন: "এটা (রাজনীতি সংক্রান্ত চিন্তা) হলো এমন এক জায়গা যেখানে পা হড়কে যায়, চিন্তাভাবনা বিপথে চলে যায়। এ এক সংকীর্ণ জায়গা, কঠিন এক লড়াই। বহু লোক এতে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তারা সীমালঙ্ঘন করেছে এবং অধিকারসমূহকে খর্ব করেছে। পাপী লোকদের তারা অনাচারের সাহস যুগিয়েছে। তাদের এই সংকীর্ণ চিন্তার ফলে শরীয়া হয়ে পড়েছে সীমিত যা বান্দাদের কোনো কল্যাণে আসে না। অন্যের উপর নির্ভর করে চলতে হয় এই শরীয়াকে। এভাবে তারা নিজেদের জন্যই সত্যকে জানা এবং তাকে বাস্তবায়ন করার সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং নাকচ করে দিয়েছে। যদিও তারা এবং অন্যরা জানে যে বাস্তবতাটা আসলে কী। কিন্তু তারপরেও তারা সেই সত্যকে অস্বীকার করছে এই মনে করে যে তা শরীয়ার মূলনীতির বিরুদ্ধে যায়।

আল্লাহর শপথ, আল্লাহর রাসূল (সা.) যে শরীয়া আমাদের দিয়েছেন তার সাথে এর কোনো বিরোধ নেই, বিরোধ হচ্ছে তারা যেভাবে শরীয়াকে বুঝেছে ও চিন্তা করেছে তার সাথে। তাদের এ ভুলের কারণ হলো শরীয়াকে বোঝার ব্যাপারে তাদের সীমাবদ্ধতা এবং একইসাথে বাস্তবতাকে বোঝার ব্যাপারেও সীমাবদ্ধতা। এই ভুলের উপর থেকেই তারা একটাকে আরেকটার উপর প্রয়োগ করে বসেছে।

রাজনৈতিক হর্তাকর্তারা যখন এই ব্যাপার দেখলো এবং বুঝলো যে এই আলেমরা শরীয়াকে যেভাবে বুঝেছে সেভাবেই মানুষকে চলতে হবে, তখনই তারা সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক দুর্ভিসন্ধি থেকে এক বিরাট অকল্যাণ ও অরাজকতা বিস্তার করলো। এতে পরিস্থিতি হয়ে গেল সঙ্গীন, সমস্যার সমাধান হয়ে পড়লো অসম্ভব। ফলে আলেমদের পক্ষে শরীয়ার জ্ঞান দিয়ে মানুষকে এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার করে আনা সম্ভবপর রইলো না।

এই কট্টর গোষ্ঠীর আলেমদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো আরেক গোষ্ঠী, যারা আবার অতি ছাড় দেয়ার পক্ষে। ফলে তারা এমনসব জিনিসের বৈধতা দেয়া শুরু করলো, যার বৈধতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) বিধান নাকচ করে দিয়েছে। আল্লাহ

তার নবীর (সা.) কাছে ও তার কিতাবের মাধ্যমে যে শরীয়া পাঠিয়েছেন, তা বোঝার ব্যাপারে এই উভয় দলই ভুল করেছে। আল্লাহ তাঁর রাসূলদের (আ.) ও কিতাবসমূহকে এজন্যই পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ সেই সুবিচার ও ভারসাম্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে, যা দিয়ে সকল আসমান ও জমিন দাঁড়াতে পারছে। অতএব, যেখানেই সুবিচারের চিহ্ন মিলবে সেখানেই আল্লাহর শরীয়া ও দ্বীন।”[১]

এই দুই বিরাট আলেমের এই চিন্তা থেকে এটাই সাব্যস্ত হলো যে শরীয়ার কিছু লক্ষ্য (মাকাসিদ) রয়েছে। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো ‘সুবিচার কায়েম করা’। তাই যেখানেই সুবিচার পাওয়া যাবে সেখানেই আল্লাহর শরীয়া বা বিধান নিহিত, সে ব্যাপারে যদি কোরআন-হাদীসের স্পষ্ট টেক্সট বা ভাষ্য নাও থাকে।

একই সাথে তারা এও ব্যক্ত করলেন যে এমন অনেক আলেম রয়েছেন যারা শরীয়াকে সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। ফলে এমন সব ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত তাদের নিকট থেকে এসেছে, যা শরীয়ার লক্ষ্যসমূহের বিরুদ্ধে যায়। যদিও তারা ভেবেছেন, তাদের এই সিদ্ধান্ত আল্লাহর শরীয়া মোতাবেকই হয়েছে। ফলে শরীয়ার নাম করেই তারা শরীয়াকে লঙ্ঘন করেছেন।

প্রত্যেক যুগেই উম্মতকে এই সমস্যার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। সব কালেই আপনি এমন কাউকে পাবেন যার কোরআন-হাদীসের বুঝজ্ঞান শরীয়ার এই লক্ষ্যগুলোর বিপরীত। তারপর সে ব্যক্তি এমন ফতোয়া দিয়েছেন যা শরীয়াকে বিকৃত করে এবং মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে আসতে বাঁধা দেয়। অথচ তিনি মনে করছেন তিনি দ্বীনকে খুব সাহায্য করলেন। উম্মত আজ পর্যন্ত সেই সমস্যায় ধুঁকছে যেমনটা ইবনুল কায়্যিম বললেন: “ফলে আলেমদের পক্ষে শরীয়ার জ্ঞান দিয়ে মানুষকে এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার করে আনা সম্ভবপর রইলো না।”

ইবনে আকীলের কথা অনুযায়ী— উম্মতের রাজনীতির প্রতিটি ইস্যুতে কোরআন-হাদীসের ভাষ্য থাকতে হবে, এমন নয় মোটেও। কেননা রাজনীতি হলো এমন এক পার্থিব বিষয়, যা প্রতিটি নতুন উদ্ভুত পরিস্থিতির সাথে বদলায়। এতে যে জিনিসটা দরকার তা হলো মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এটি সেসব উদ্দেশ্যের মাঝেই পড়ে যায়, যা দ্বীন নিজেই নিয়ে এসেছে এবং এরপর এটি অর্জনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব ঠিক করে দেয়নি, যা দিয়ে সুবিচার কায়েম হবে। কেননা মানুষের জীবনধারা পরিবর্তনশীল। তাই মানুষ কোন উপায়ে সুবিচার কায়েমের এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবে, সে ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া

[১] ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (৪/২০৩); আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ (১২)।

হয়েছে। যে পথেই এই লক্ষ্য অর্জিত হোক না কেন সেটাই আল্লাহর বিধান— সেটা নিয়ে যদি কোরআনের কোনো আয়াত নাও থাকে বা কোনো হাদীস নাও পাওয়া যায়। আমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার এই সফল পদ্ধতিকে রাজনীতি বা অন্য যে কোনো নামে ডাকতে পারি— নামটা বড় কথা নয়, কী বোঝানো হচ্ছে সেটাই আসল। এজন্যই ইবনে আকীল বলেছেন: "রাজনীতি হলো সেসব কাজ যার মাধ্যমে মানুষ কল্যাণের সবচেয়ে কাছে থাকে এবং অন্যায়-অবিচার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে— যদি সেটার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) স্পষ্ট বিধান নাও দিয়ে যান এবং এ ব্যাপারে কোনো ওহী নাযিল নাও হয়ে থাকে।"

কিন্তু বহু আলেমই এই বাস্তবতাটা বোঝেন না এবং সেসব চিন্তাভাবনা বা ইজতিহাদকে নাকচ করে দেন, যে বিষয়ে সরাসরি কোনো কোরআন-হাদীসের ভাষ্য আসেনি। তাদের ধারণা প্রতিটি ইস্যুতেই কোরআন-হাদীসের একটি নির্দিষ্ট ভাষ্য থাকা লাগবে। এই ধারণা থেকেই আল্লাহর দ্বীনে আসার পথে বাঁধা তৈরি করে ফেলা হয়, যেমনটি ইবনুল কায়্যিম বললেন: "বহু লোক এতে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তারা সীমালঙ্ঘন করেছে এবং অধিকারসমূহকে খর্ব করেছে। পাপী লোকদের তারা অনাচারের সাহস যুগিয়েছে। তাদের এই সংকীর্ণ চিন্তার ফলে শরীয়া হয়ে পড়েছে সীমিত, যা বান্দাদের কোনো কল্যাণে আসে না। অন্যের উপর নির্ভর করে চলতে হয় এই শরীয়াকে।"

এর পেছনে কারণটা হলো আল্লাহর শরীয়াকে বোঝার মধ্যে ঘাটতি থাকা, যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে করছেন তিনি আল্লাহর শরীয়াকে খুব ভালোই বোঝেন।

ইবনুল কায়্যিম এই সুবিচারপূর্ণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন: "আল্লাহর শপথ, আল্লাহর রাসূল (সা.) যে শরীয়া আমাদের দিয়েছেন তার সাথে এর কোনো বিরোধ নেই, বিরোধ হচ্ছে তারা যেভাবে শরীয়াকে বুঝেছে ও চিন্তা করেছে তার সাথে।"

তারপর তিনি বলেছেন: "তাদের এ ভুলের কারণ হলো শরীয়াকে বোঝার ব্যাপারে তাদের সীমাবদ্ধতা এবং একইসাথে বাস্তবতাকে বোঝার ব্যাপারেও সীমাবদ্ধতা। এই ভুলের উপর থেকেই তারা একটাকে আরেকটার উপর প্রয়োগ করে বসেছে।"

আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, হে ইবনুল কায়্যিম! আজকের যুগের বহু মুফতির কাণ্ডজ্ঞান যদি আপনি দেখতেন!

পাপ ও অপরাধ নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

অনিরুদ্ধ অনিক নামে একজন ‘ইসলামিক থিয়লজিতে পাপ ও অপরাধ’[১] শিরোনামে একটি আর্টিকেল লিখেছেন। এই আর্টিকেলটিতে তিনি দেখিয়েছেন, যেগুলো হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক, সেগুলো পাপের বিষয়। আর যেগুলো হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক, সেগুলো অপরাধের বিষয় হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহর হক যদি নষ্ট করা হয়, তাহলে পাপ হবে। আর যদি বান্দার হক নষ্ট করা হয়, তাহলে সেটা অপরাধ হবে। আল্লাহর হক যখন নষ্ট করা হয়, তখন অনুশোচনার মাধ্যমে আমরা তওবা করে সেটার রেমেডি পেতে পারি। আর বান্দার হক নষ্ট করা হলে আইনের মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, একটি ঘটনা একই সাথে অপরাধ এবং পাপ দুটিই হতে পারে।

তারপর তিনি লিখেছেন, একজন মানুষ নামায আদায় করলো কি না, রোযা রাখলো কি না, এগুলো আদায় না করলে যে পাপ হয়, থিওলজি অনুসারে তা বিচারের দায় কেবল আল্লাহর এবং তা হবে পরকালে। মানুষ বড়জোর তাকে উপদেশ দিতে পারে। দুনিয়ার কোনো বান্দার ক্ষমতা নেই এ পাপের বিচার করার। মতাদর্শিক সন্ত্রাসীরা মূলত এ কাজটি করার চেষ্টা করে। যেটি প্রকারান্তরে দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফতের ভুল বা সংকীর্ণ অর্থ বুঝ নিয়ে God play তথা আল্লাহর উপর আল্লাহগিরি করার মতো ব্যাপার (নাউজুবিল্লাহ)।

---

[১] দেখুন: https://www.facebook.com/notes/1114879141911915/

তারপর তিনি মানুষের পারসোনাল প্রাইভেসি নিয়ে লিখেছেন, পারসোনাল বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়ে কথা বলা ইসলামের থিওলজিবিরুদ্ধ। এখানে হযরত উমরের (রা.) একটা ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে— একজন ব্যক্তি তার নিজের ঘরে একটা অপরাধ করছিলো। সেটা দেখে উমর (রা.) তার বিচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিটি উল্টো উমরকে (রা.) দোষারূপ করে বসলো যে তিনি তার প্রাইভেসি নষ্ট করেছেন।

তারপর তিনি লিখেছেন, কোনো মুসলিমের অধিকার থাকতে পারে না কোরআন পড়তে না পারার কারণে কোনো নন-মুসলিমকে গলা কেটে হত্যা করার। তারপর লিখেছেন, সন্তানের মাথার মোরাল গ্যাপের জায়গাটাকে কেউ যেন ধর্মের নাম দিয়ে, অধর্ম দিয়ে... সেজন্য শৈশবেই তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দিন।

এই হচ্ছে সাদামাটাভাবে আর্টিকেলটির মূলকথা। এখানে দেখানো হয়েছে, আসলে পাপ ও অপরাধ দুটি আলাদা জিনিস।

পাপের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এবং অপরাধের সম্পর্ক বান্দার সাথে— সাদামাটাভাবে এটুকু ঠিকই আছে। কিন্তু সমস্যা হলো যখন আমরা বলি, এটি হচ্ছে পাপ এবং এটি হলো অপরাধ। এভাবে যখন আমরা অনেকটা সাদাকালো বাইনারির মতো ব্যাপারটাকে দেখি, তখনই সমস্যা। এক্ষেত্রে সেক্যুলার প্যারাডাইমের অবস্থান হলো— ব্যক্তির অনৈতিক কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজকে এফেক্ট না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে ব্যক্তির কোনো অনুচিত কাজ যদি সমাজ বা রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন সমাজ বা রাষ্ট্রের আইন সেখানে প্রযোজ্য হবে।

এ বিষয়ে একজন আগ্রহী শ্রোতার সাথে কথা বলেছিলাম। তার সাথে আমার কথোপকথনটি নিম্নরূপ—

আমি: আপনার কি মনে হয়, সেক্যুলার প্যারাডাইমে পাপ বলে কিছু আছে? ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে পাপ বা পাপবোধ থাকবে কেন?

শ্রোতা: ধর্মটা তো বিশ্বাসের ব্যাপার। ওরা যেটা বিশ্বাস করছে, সেটাও তো ওদের একটা ধর্মই...

আমি: সেক্যুলারিজম একটা ধর্ম, নাকি? সেক্যুলারিজম...

শ্রোতা: না, মানে, ওটা তো ওদের একটা বিশ্বাস। আমরা যেমন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস রাখছি, কেউ কেউ যেমন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস রাখছে, তেমনি ওটাও তো

ওদের একটা বিশ্বাস। তো, ওখানেও তো ভালো-খারাপের ধারণা থাকবে।

আমি: হ্যাঁ, ভালো-খারাপের ধারণা তো থাকবেই। কিন্তু যখন আমরা পাপ ধারণাটির (sin) কথা বলি, তখন সেটি তো...

শ্রোতা: পাপ তো কেবল পরকালের সাথে রিলেটেড।

আমি: এ জন্য সেক্যুলার সমাজে পাপের ধারণা থাকার কথা নয়। তাই না? তবে সেক্যুলার সমাজে নৈতিকতার ধারণা থাকবে। নৈতিকতাকে যখন সমাজ বা রাষ্ট্রশক্তি কোয়ান্টিফাই করে যে এই পরিমাণ আচরণ হলে তা নৈতিক হবে বা না হলে তা অনৈতিক হবে; অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কোয়ান্টিটির বাইরে গেলে সমাজ সেটিকে আইন হিসেবে দেখে। নৈতিকতার সবগুলো বিষয় তো সাধারণত আইনের বিষয় নয়। যদিও একদৃষ্টিতে আইনের বিষয়গুলো এক ধরনের নৈতিকতারও ব্যাপার। তবে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে ফারাক আছে, এক ধরনের কনফ্লিক্টও আছে।

তাহলে সেক্যুলার সমাজে আইন ও নৈতিকতার ধারণা থাকবে, তবে পাপের ধারণা থাকবে না। পাপের ধারণা থাকবে নন-সেক্যুলার সমাজে। আমরা একটি ইসলামী সমাজ বা ধর্মীয় সমাজের কথাই ধরি, যেখানে পাপ হচ্ছে আল্লাহর দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, আর অপরাধ হলো সমাজের দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। যদি তাই হয়, তাহলে সেক্যুলার সমাজে পাপের ধারণা থাকার কথা নয়। রাষ্ট্র ইনভলভ হবে অপরাধের সাথে, পাপের সাথে নয়। তাহলে কেউ নামায না পড়লে তা পাপ হিসেবে গণ্য হবে, অপরাধ হিসেবে নয়। আবার কেউ যদি যাকাত আদায় না করে, তাহলে তা একইসাথে পাপ ও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে...

শ্রোতা: আচ্ছা, স্যার! একেক দেশে তো একেক রকম নিয়ম। যেমন: আমাদের দেশে নামায না পড়লে সরকার হস্তক্ষেপ করছে না, কিন্তু সৌদি আরবে করছে। তাহলে ওই দেশে পাপীদের ক্ষেত্রে কেন সরকার হস্তক্ষেপ করছে?

আমি: হ্যাঁ, এই আর্টিকেলে লেখক সেটিই বলার চেষ্টা করেছেন যে পাপের বিষয়গুলো তো আল্লাহ পরকালে বিচার করবেন এবং পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন। সেজন্য পাপের বিষয়গুলো নিয়ে রাষ্ট্রের কনসার্ন হওয়া বা কাউকে শাস্তির আওতায় আনা অথবা বাধ্য করা আদৌ উচিত নয়। তাতে করে কী হলো? যে ইবাদতটি আমার আল্লাহর ভয়ে করার কথা, সেটি আমি সরকারের ভয়ে করছি। এতে করে মূল ব্যাপারটিই কম্প্রোমাইজ হয়ে গেলো। সে জন্য রাষ্ট্রের দিক থেকে পাপের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য বলা হচ্ছে। রাষ্ট্র শুধু অপরাধের বিষয়গুলো দেখবে।

আর অপরাধের বিষয় হচ্ছে যেগুলো হক্কুল ইবাদ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক নষ্ট করা কি পাপের কাজ নয়? দুনিয়াতে কিন্তু সব পাপের শাস্তি হচ্ছে না। যে পাপগুলো আমাদের সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, শুধু সেগুলোরই শাস্তি হচ্ছে।

এটুকু পর্যন্ত আলোচনা করলে আমাদের কাছে মনে হয় যেন আর্টিকেলের বক্তব্য ঠিকই আছে। এখানে যাদেরকে চরমপন্থী বলা হচ্ছে, তারা কী করছে? তারা পাপের বিষয়গুলোকে অপরাধ হিসেবে ধরছে এবং সমাজের উপর তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। এটি হচ্ছে এই আর্টিকেলের বক্তব্য।

প্রাথমিকভাবে এ কথাগুলোকে আমার কাছে ঠিকই বলে মনে হয় আরকি। কিন্তু আমি যে বলেছিলাম এই আর্টিকেলের ক্রিটিক করবো সেটি হচ্ছে: আমরা যদি একটা সেক্যুলার সমাজ ব্যবস্থার দিক থেকে দেখি, যেখানে পাপের ধারণার পরিবর্তে থাকবে নৈতিক চেতনা। তুমি যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ বিলিয়ে দাও, যেভাবে বিল গেটস তার উদ্বৃত্ত সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, সেটা ভালো। কিন্তু না দিলে? সে যদি বলে, আমি শুধু সরকারকে ট্যাক্স দেবো, এর বাইরে আর কোনো কিছু দেবো না। তাহলে বুঝা গেলো, আইন তাকে বাধ্য করছে না। কিন্তু নৈতিকতার দৃষ্টিতে, আমরা বলছি, তার জন্য এটি ঠিক নয়। কারণ, এত সম্পদ দিয়ে সে কী করবে? তাই না?

সে জন্য সেক্যুলার সমাজব্যবস্থার মধ্যে পাপের ধারণা থাকবে না। কারণ, এখানে তো সমাজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষভাবে। তাহলে ধর্ম যেখানে নাই, সেখানে ঈশ্বর বা খোদার কাছে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গও থাকবে না। তবে নৈতিকতার প্রসঙ্গ থাকবে। নৈতিকতা ও আইনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, বৈপরিত্য, সমন্বয়, সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকবে। তাহলে রাষ্ট্র বা সরকার কনসার্ন হবে তার লিগ্যাল আসপেক্ট থেকে, মোরাল আসপেক্ট থেকে নয়। রাষ্ট্র মোরাল আসপেক্ট ডেভেলপ করার জন্য কন্ট্রিবিউট করবে, কিন্তু কেউ যদি হাই-লেভেল মোরালে না চলে লো-লেভেল মোরাল মেনে চলে, তাহলে তাকে সরকার কোনো শাস্তির সম্মুখীন করবে না।

কিন্তু একটা ধর্মভিত্তিক সমাজ বা আমরা যদি একটা ইসলামী সমাজের কথা বলি, সেখানে কিন্তু পাপের ধারণা থাকবে। পাপ ও অপরাধ উভয় ধারণাই থাকবে। তাহলে সেক্যুলার প্যারাডাইমের মধ্যে প্রাইভেট ও পাবলিকের যে ডিস্টিংশন, সেটি ইসলামী প্যারাডাইম বা ইসলামী সমাজের মধ্যে কতটুকু প্রযোজ্য?

প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে মনে হয়, ইসলামী সমাজের মধ্যেও এগুলো

প্রযোজ্য। এই আর্টিকেলে হযরত উমরের (রা.) যে ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি একজনের ঘরের ভেতরে ঢুকে তাকে মদপান করতে দেখলেন এবং তাকে শাস্তির আদেশ দিলেন। তখন সেই ব্যক্তিটি বললো, অনুমতি ছাড়া আমার ঘরের ভেতর আপনি ঢুকলেন কেন? আমার ঘরে ঢুকে আমি কী করছি, তা দেখে আপনি অন্যায় করেছেন। তখন উমর (রা.) ওই ব্যক্তির কথাগুলো মেনে নেন।

এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাইভেট-পাবলিক একটা ডিফারেন্স আছে। কেউ অনেক বেশি ইবাদত করলো, কেউ তেমন ইবাদত করলো না। আবার কেউ আসলে রোযা রাখলো না, কিন্তু প্রকাশ্যে খাওয়া-দাওয়াও করলো না, রোযাদারের মতোই চলাফেরা করলো। এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে সে গুনাহগার হবে, কিন্তু আইন তাকে কিছু বলবে না। পাবলিক-প্রাইভেটের মধ্যে এই যে পার্থক্য, এটি ইসলামের অনেক বিষয়েও প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এই আর্টিকেলে যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছে, অর্থাৎ হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে হলো পাপ-পুণ্যের ব্যাপার, আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে হলো আইনের ব্যাপার।

কিন্তু এখানে সমস্যা হলো, ইসলামিক প্যারাডাইম তথা ইসলামী চিন্তাভাবনায় জীবনের ধারণা সেক্যুলার ধারণা থেকে ভিন্ন। ইসলামিক প্যারাডাইমে জীবন হলো নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক একটি ব্যাপার। এই জগতে আসার আগেও আমরা ছিলাম রুহ হিসেবে এবং এই জগতের পরবর্তী জগৎ— আলমে বরযখ (মৃত্যু পরবর্তী জগৎ), তারপর ইয়াওমুল কিয়ামাহ (কেয়ামত দিবস), তারপর জান্নাত বা জাহান্নামের চিরন্তন ঠিকানা। এই প্যারাডাইমটা তো সেক্যুলার সমাজে নাই।

তারপর ধরেন, সামাজিক উন্নয়ন প্রসঙ্গ। অপরাধের শাস্তি দেয়া হয় সামাজিক শৃংখলা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক উন্নয়নের ধারণাটাও একটু ডিফারেন্ট। কারণ, মানুষ শুধুমাত্র খেয়ে-পরে বেঁচে থাকলেই তো হলো না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, ভালো মুসলমানও হতে হবে। আমরা যদি মুসলমানদের কথা ধরি আর কি। যদিও রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলমান ছাড়া অন্য নাগরিকরাও থাকবে।

তাহলে মানুষের উন্নয়নের ইসলামী ধারণা অন্যান্য ধারণা থেকে ভিন্ন। কিন্তু তারমানে এই নয়— সে খেতে পারুক বা না পারুক, উপোস থাকুক, পরনের কাপড় থাকুক বা না থাকুক, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকুক বা না থাকুক; সে শুধু নামায-রোযা করবে এবং উন্নত আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হবে— এটিও নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের এই ধরনের বাইনারি ইসলামে খুব একটা কার্যকরী নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী প্যারাডাইমে সমাজ, ব্যক্তি বা জীবন সম্পর্কিত ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। সেই হিশাবে এখানে উন্নয়নের ধারণাও ভিন্ন।

ইসলামী প্যারাডাইমে আল্লাহর সাথে কৃত অপরাধকে আমরা পাপ বলছি। আর বান্দার সাথে কৃত অপরাধকে অপরাধ বলছি।

অপরাধ নিয়ে সমাজ কনসার্ন হয়। কিন্তু সমাজ কি সব ধরনের অপরাধ নিয়ে কনসার্ন হয়? সেক্যুলার সমাজের কথা যদি ধরেন, সেখানে সমাজ কী করে? সেখানে কতগুলো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয় যে এটি এটি হলে তা অপরাধ, কিংবা এটি এটি হলে তা অপরাধ হবে না। তাই না? তাহলে সেক্যুলার সমাজে কোনো অপরাধকে কীসের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়? একটি সামাজিক নৈতিকতা তথা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নৈতিকতার আলোকে অপরাধ চিহ্নিত করা হয়।

তাহলে এই নৈতিক চেতনা আমাকে মানতেই হবে কেন? আমার তো এর সাথে দ্বিমত থাকতে পারে। আমি মনে করতে পারি, হোমো সেক্সুয়ালিটি খারাপ। কিন্তু সমাজের বাদবাকি লোকেরা মনে করছে হোমো সেক্সুয়ালিটি খারাপ নয়। তাই এটি আপনাকে মানতে হবে। একেবারে আপনার ঘাড়ের উপর এসে পড়ার আগ পর্যন্ত আপনি এটার প্রতিবাদ করতে পারবেন না। তাহলে সমাজের একজন সদস্য হিসেবে আমার মতামতটি সমাজের কাছে সেক্রিফাইস হয়ে যাচ্ছে না?

ইনফ্যাক্ট, আমরা সমাজটা গড়ে তুলি, পাবলিক ইন্টারেস্টগুলো গড়ে তুলি সে জন্যই। প্রত্যেকে যদি সবসময় তার পারসোনাল ইন্টারেস্ট নিয়েই থাকে, তাহলে তো আর সমাজ গঠিত হবে না। সমাজ মানে হলো একটি সেক্রিফাইসের ব্যাপার, মেনে নেয়ার ব্যাপার। আমরা যদি শুধু নিজেরটা নিয়েই থাকি, তাহলে সমাজের কার্যকারিতা থাকে না। অতএব, সমাজের স্বার্থটা আমাদের মানতে হয়। কিন্তু আমরা কী মানবো, তা কে ঠিক করবে?

আমি সমাজের সদস্য হলে সমাজের কথাকে মানতে হবে। সমাজ কারা তৈরি করে? সবাই মিলে তৈরি করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি সেক্যুলার সমাজে অন্য আরেকটি সেক্যুলার সমাজের বিবেচিত অপরাধকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয় না বা একই মাত্রার অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে না। অর্থাৎ সেক্যুলার সমাজগুলোতেও অপরাধের বিষয়গুলো সমান নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি ও সমাজের এই যে পার্থক্য, সেটির অবস্থান সেক্যুলার সমাজে। সেক্যুলার বা ইসলামী সমাজ, যাই হোক না কেন, সবগুলো অপরাধই কি রাষ্ট্র দেখতে পায়? যেমন, আইন তো কাজ করে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। সাক্ষ্যটা

কীসের? সত্যতার। মানে, ঘটনার বাস্তবতার আর কি। কিন্তু সাক্ষ্য ও বাস্তবতা বা সত্যতা কি এক? আমরা কিন্তু দেখি, সাক্ষ্য ও সত্যতা ডিফার করে। তাই না? তাহলে আইন যেভাবে প্রয়োগ করা হয়, অপরাধকে যেভাবে দেখা হয়, এর ভিত্তিতে অপরাধী যে সত্যিই অপরাধী, তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। যদিও আমরা আইনের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করি।

তাহলে আমরা যে বলি, এটা হলো পাপ; এর মানে হলো এটি অনৈতিক ও অন্যায়। তাই না? আল্লাহর দৃষ্টিতে পাপের মানে হচ্ছে নৈতিকতার খেলাপ। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে যে পার্থক্য, সেটি তো আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আল্লাহর দিক থেকে সবই নৈতিকতার ব্যাপার। আল্লাহর দৃষ্টিতে, আপনি ভালো কাজ করলে পুণ্য হবে, খারাপ কাজ করলে পাপ হবে। তাই আল্লাহর কাছে পাপ ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য নাই। তাহলে আল্লাহ যেটিকে ভালো বলছেন, সেটিকে প্রয়োগ করাই তো সমাজের কাজ। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে সমাজ তা প্রয়োগ করবে? এই প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আইন বা শাস্তির প্রসঙ্গ তো আপেক্ষিক ব্যাপার।

তাহলে কোনো একটা পাপ কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না কেন? যেমন, কেউ নামায পড়ছে না। এ জন্য রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্রে যদি নামায পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলমান দাবি করে, তাহলে সে নামায পড়বে। আর যদি নামায না পড়ে, তাহলে সে নিজেকে মুসলমান দাবি করবে না। ব্যাপারটা তো এমন নয়— নিজেকে মুসলমান দাবি না করলে কেউ রাষ্ট্রে থাকতেই পারবে না। ধরুন, কেউ মুসলমান হলো, কিন্তু ইসলামকে মানলো না; সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তাকে কিছু করতে পারবে কিনা? এই আর্টিকেলের বক্তব্য অনুসারে কর্তৃপক্ষ তাকে কিছু করতে পারবে না। তাই যদি হয়, তাহলে তো অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে। যেমন, যাকাত। কেউ যদি বলে, আমি জনকল্যাণ করবো, কিন্তু যাকাত যেভাবে হিসাব-নিকাশ করে দিতে হয়, সেভাবে দেবো না। এমনিতেই দেবো। তাহলে তো সেটা যাকাত হবে না। তখন সে বলতে পারে, পাবলিক ইন্টারেস্টের কারণে আমি আমার ইনকামের ৫ পার্সেন্ট দিচ্ছি। এই ৫ পার্সেন্ট যে সে দিলো, তাতে সমাজের উপকার হলো, কিন্তু শরীয়ত পালন তো হলো না। এ রকম পরিস্থিতিতে ইসলামী কর্তৃপক্ষ কি তাকে বাধ্য করতে পারবে? এভাবে নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যদি বাধ্য করতে না পারে, তাহলে অন্য ক্ষেত্রগুলোতে কেন পারবে?

শ্রোতা: অন্য ক্ষেত্রগুলো বলতে?

আমি: মানে, সমাজের আরো যত বিষয়গুলো আছে আর কি। ধরুন, কেউ যদি

লিভিং টুগেদার করে উইথ রেজিস্ট্রেশন ইন দ্যা রেজিস্ট্রি অফিস। অর্থাৎ, বিয়ে ছাড়াই শুধু রেজিস্ট্রি করলো। আসলে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এক ধরনের আকদ কায়েম হয়, মানে সম্মতিটা প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকদ ও রেজিস্ট্রেশন কিন্তু এক জিনিস নয়। দুটি আলাদা ব্যাপার। এভাবে ইসলামের সবগুলো বিষয়কেই যদি কেউ তার নিজের মতো করে মানে, যেখানে মুসলমানরাই ইসলাম মানার ক্ষেত্রে বাধ্য নয়, সেটি কীভাবে ইসলামী সমাজ হয়? এটা খুব ভ্যালিড একটা প্রশ্ন নয় কি?

মনে করেন, যাদের টাকা পয়সা আছে, অর্থাৎ হজ্ব করার সামর্থ্য আছে, তারা হজ্ব করবে। এটা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। এখন কোনো ধনী মুসলমান যদি হজ্ব করতে না যায় এবং আরজ আলী মাতুব্বুরের মতো যদি সে বলে যে আমি হজ্ব করবো কেন, কুরবানী করবো কেন? এসব অর্থ বরং আমি সাধারণ গরীব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করে অন্যভাবে দেখলে, তার এই কাজটা তো বরং আরো ভালো। একজনের হজ্ব করার কয়েক লাখ টাকার খরচ দিয়ে একজন স্টুডেন্টের ৩/৪ বছরের পড়াশোনার খরচ অনায়াসেই চালানো যায়। তাহলে সামর্থ্যহীন একজন ছাত্রকে পড়ালেখার আর্থিক যোগান দেয়া ভালো, নাকি সেখান থেকে ঘুরে আসা ভালো, যার কোনো প্রোডাক্টিভিটি নাই? এমনিতে কিছু প্রোডাক্টিভিটি তো থাকেই। আমরা যদি এখানে একটা গানবাজনার অনুষ্ঠান করি, সেখানে কিছু লোক চানাচুর বেচবে, কিছু টিকেট বিক্রি হবে, কিছু লোক গাড়িতে করে আসবে, ফলে গাড়িওয়ালারা ভাড়া পাবে। মানুষ যখনই নড়াচড়া করে, তখনই সেখানে একটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তৈরি হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা উপযোগিতাও তৈরি হয়। কিন্তু আসলে প্রোডাক্টিভিটি বলতে যে উৎপাদনের ব্যাপারটা বুঝায়, এটি তো সেটি নয়। যদি তা না হয়, সেক্ষেত্রে কেউ যদি কোরবানী না দিয়ে বা হজ্বের টাকা দিয়ে জনকল্যাণ করতে চায়, সেটি তো প্রোডাক্টিভিটি হিসেবে বেটার। যদিও হজ্ব বা কোরবানীর একটি অর্থনৈতিক দিক আছে। ইনফ্যাক্ট, মানুষ এমন এক অর্থনৈতিক জীব, এর ইকোনোমিক আসপেক্ট ছাড়া কোনো কিছু হতেই পারে না। যখনই মানুষ কোনো কিছু করে, তখনই একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার ঘটে।

তাহলে একটি ইসলামী সমাজে শরীয়ত মানা বা না মানার ব্যাপারে মুসলমানরা যদি পুরোপুরি স্বাধীন হয়, তাহলে গোড়াতেই ওই প্রশ্নটা চলে আসে— ইসলামটা কেন? সেটিই মানার আর দরকার কী? আমরা নিজেরাই তো নিজেদের ভালোমন্দ নির্ধারণ করতে পারি। যখন আমাদের গরম লাগে, তখন আমরা বুঝি একটু ঠাণ্ডা হওয়া উচিত। আবার যখন আমাদের ঠাণ্ডা লাগে, তখন বুঝি এখন আমাদের একটু

উষ্ণতা দরকার। তাহলে আমাদের শৈত্য বা উষ্ণতার যে চাহিদা, তা তো আমরা সবাই বুঝি। ভালো এবং মন্দের নৈতিকতার ধারণাও তো সে রকমই। সব মানুষের জন্য খাবার, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা তথা কীভাবে মানুষের কল্যাণ হয়, সেটি তো আমরা বুঝি। মোটাদাগে মানুষের যেসব কল্যাণ তথা মৌলিক অধিকারের ব্যাপারগুলো বুঝার জন্য তো আমাদের কাছে আসমান থেকে ওহী নাযিল করার প্রয়োজন নাই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা পাপ ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য করছি, সেই ভিত্তিটা কিন্তু আল্টিমেটলি আমাদেরকে ইসলামী প্যারাডাইম থেকে সরিয়ে সেক্যুলার প্যারাডাইমে নিয়ে যায়। কারণ, আমরা আমাদের ভালোমন্দ নিজেরা নির্ধারণ করতে পারছি। ওয়েলবিং বা ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কী, আমরা তা বুঝি। তাই যদি হয়, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে– সব মানুষ কি খাবার, বাসস্থানসহ অন্যান্য সব সুবিধা পেয়েছে? পায়নি। সব মানুষ যদি সব সুবিধা না পেয়ে থাকে, তাহলে আসুন সেটার জন্য কাজ করি, পরিশ্রম করি, কষ্ট করি। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চলুন প্রয়োজনে লড়াই করি। এখানে ধর্ম আসবে কেন? ধর্ম তো একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ধর্ম একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর সামাজিক বিষয়গুলো হলো ধর্মনিরপেক্ষ। তো, এটা হচ্ছে আল্টিমেটলি একটা ধর্মনিরপেক্ষ প্যারাডাইম। কেউ সেই প্যারাডাইমের পক্ষে থাকতেই পারে। অন্য একটি আলোচনায় আমি দেখিয়েছি, ইসলামী সমাজ বলতে আমরা প্রচলিত অর্থে যা বুঝে থাকি, আসলে তা নয়। ইসলামী সমাজটা ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের কাছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, আর ইসলামের পক্ষের লোকদের কাছে সেটি হলো একটি ইসলামী সমাজ। এটা কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নটি নিয়ে আমি অন্য সময় আলোচনা করেছি, প্রয়োজনে পরে আবার করতে পারবো।

তাহলে পাপ হলো ব্যক্তিগত, আর অপরাধ হলো সামাজিক– এই ধারণাটি আল্টিমেটলি সেদিকেই নিয়ে যায় যে ধর্ম হলো ব্যক্তিগত, আর সমাজ হলো ধর্মনিরপেক্ষ, যেখানে ধর্ম কোনোভাবেই সমাজকে প্রভাবিত করতে পারবে না, সমাজের মধ্যে ধর্মের কোনো প্রভাব থাকবে না। এই জিনিটা কিন্তু আসলে ইসলামী সমাজকে আর কমপ্লাই করে না। মানে ধর্ম সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এটাও একটা এক্সট্রিম; আর ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চয়েসের মধ্যে থাকবে, এটি হলো আরেকটি এক্সট্রিম।

তাহলে কেউ হজ্ব না করে জনকল্যাণ করতে চাইলে পাপ হওয়ার কথা, অপরাধ

নয়। কেউ যদি কোরবানীর নিয়ম না মেনেই কোরবানী করে, ধরুন বিসমিল্লাহ না বলেই জবাই করে, অথবা জবাই-ই করলো না, তাতে অসুবিধা কী?

সমাজে তো অমুসলিমরাও নাগরিক হিসেবে থাকে। ইসলামী সমাজ মানে তো আর নেসেসারিলি মুসলিম মেজরিটি সমাজ নয়। যদিও পপুলার একটি মিথ হলো, ইসলামী সমাজ মানে মুসলিম মেজরিটি সমাজ, বা মুসলিমদের সমাজ, অথবা মুসলমানরা সেখানে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, বাকিরা সেখানে কাইন্ড অব সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন। এটি আসলে ভেরি রং কনসেপ্ট। কারণ, প্রফেট মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় যে সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, সেখানে তো মুসলমানরা খুব অল্পসংখ্যক ছিলো। হিজরতের পর মদীনায় আনসার-মুহাজির মিলিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা এক দশমাংশেরও কম ছিলো। মোট জনসংখ্যার সর্বোচ্চ এক দশমাংশ মুসলমান ছিলো। অবশ্য পরবর্তীতে খুব দ্রুত তা বাড়তে থাকে। তাহলে মুসলিম সোসাইটি বলতে not society or a state which is for the Muslims only, or not that Muslims are the first-class citizen and rest of all others are second class citizen. তা যদি হয়, তাহলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকরাও সবকিছু সমানভাবে পাবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মুসলমানরা ধর্মীয় চেতনা থেকে যে কাজগুলো করবে (যেমন: হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক), সে কাজগুলোই কিন্ত অন্যরা ব্যক্তিগত, সামষ্টিক বা সামাজিক চেতনা থেকে করবে। যেমন: মুসলমানরা নামায পড়ে। তাহলে অন্যরা কী করবে? অন্যরা মেডিটেশন করবে। তাহলে ইসলামী সমাজে কী অমুসলিম সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে মেডিটেশন করতে হবে? না, নট দ্যাট। কিন্তু যারা মেডিটেশন করবে না, তারা নিজেদেরকে সাইকোলজিক্যালি কুল অ্যান্ড কা'ম রাখবে, ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, হুইচ ইজ অ্যা কাইন্ড অব মেডিটেশন। এমন তো বলতে হয় না যে হ্যাঁ, আমি মেডিটেশন করছি। কাজের ফাঁকে আপনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, এটাও এক ধরনের মেডিটেশন। হতে পারে আপনি জানেনেই না যে এটা একটি মেডিটেটিভ প্রসেস। তাই না?

তাহলে যারা ইবাদত করে না, তারাও কোনো না কোনোভাবে ইবাদতের সামাজিক তাৎপর্য হাসিল করে। কথার কথা, যারা ভাত খায় না, তারা রুটি খায়। শরীর তো দুটি থেকে একই ধরনের পুষ্টি গ্রহণ করে। তাই না? মুসলিম সমাজে আমরা রোযা রাখি। কিন্তু যারা রাখে না, তারা কী করবে? তারা কি সকাল-বিকাল খেতেই থাকবে? না, তারাও কিন্তু এক ধরনের ফাস্টিং করে... এবং সে জন্য সকাল বেলার নাস্তার নামই হলো ব্রেকফাস্ট। সারারাত আমরা না খেয়ে থাকি, সকালবেলায়

আমরা এক ধরনের ইফতারি করি, সামথিং লাইক দিস। ফাস্টিংকে ব্রেক করা হয়। তাহলে ফাস্টিং ইজ অ্যা মাস্ট। তাই না? লোকেরা কি শুধু খেতে থাকবে, খেতে খেতে মোটা হয়ে মারা যাবে? একটি ভালো রাষ্ট্রের জন্য ওবেসিটি ইজ নট অ্যা গুড থিং। ওবেসিটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রথম পদ্ধতিই হলো খাবার নিয়ন্ত্রণ করা। তাই না?

তো, এখন আমরা যেভাবে বছরে একমাস সকাল-সন্ধ্যা রোযা রাখি, এছাড়াও কিন্তু মুসলমানরা রোযা রাখতে পারে বা রাখেও। শারীরিক অসুবিধার কারণে মুসলিম মহিলাদের (যারা সংখ্যায় মুসলমানদের প্রায় অর্ধেক) যেসব রোযা রমযান মাসে ছুটে যায়, সেগুলো তারা অন্য সময় পূরণ করে। অর্থাৎ, রমযানের বাইরেও তারা বাধ্যতামূলকভাবে রোযা রাখে। এটি আপনি আজকে রাখবেন না কালকে রাখবেন, সেটি ভিন্ন কথা; কিন্তু আপনাকে তো রাখতেই হচ্ছে। তারমানে, মুসলমানরাও যে একেবারে শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়েই ফাস্টিং করে, সেটিও নয়। আবার ধরেন নফল রোযার কথা। আপনি নফলের নিয়তে রোযা রাখলেন...। আমাদের এক কলিগ ব্যাচেলর ডরমেটরিতে থাকতেন। তিনি করতেন কী, সকালবেলা নফল রোযার নিয়ত করে ফেলতেন। পরে বাইরে কোথাও ভালো খাবার-দাবার পেলে তা ভেঙ্গে ফেলতেন। হা হা হা। নফল রোযার ক্ষেত্রে কিন্তু এটি করা যায়।

শ্রোতা: ফরয রোযার ক্ষেত্রে কি সকাল বেলায়ও নিয়ত করা যায়?

আমি: অবশ্যই। নিয়ত করা মানে কী? শুধুমাত্র নিয়তের কথাগুলো উচ্চারণ করা তো আর নিয়ত করা বুঝায় না।

শ্রোতা: মানে, ইচ্ছাটা থাকা?

আমি: হ্যাঁ, সেটাই। নামায ও রোযার প্রসঙ্গ বললাম। এবার হজ্বের কথা ধরেন। আমরা মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্ব করি। মদীনায় যাওয়া তো হজ্বের অংশ নয়। এটি এক ধরনের ট্যুর। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন, তোমরা জমিনে ঘুরে বেড়াও। আমার নিদর্শন ইত্যাদি দেখো। তাহলে অন্যান্য নাগরিকরাও ট্যুর করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে ওই ধর্মীয় চেতনা থাকবে না। তারা একজাক্টলি মক্কাতেই যাবে, এমন নয়। আমরাও তো একজাক্টলি মক্কাতে যাই, এমন তো না। মক্কাতে যারা যায়, তারা মদীনা থেকেও ঘুরে আসে। হজ্ব করার সময় ফ্লাইট যদি অন্য কোথাও থামে, সেখানেও তারা ঘুরাফেরা করে।

শ্রোতা: অনেকে তো শপিংও করে নিয়ে আসে।

আমি: হ্যাঁ, এবং সেটি জায়েয। আমি বলতে চাচ্ছি, একটি ইসলামী সমাজে মুসলমানরা ধর্মীয় চেতনা থেকে যা কিছু করে, সেটি হক্কুল্লাহ হোক বা হক্কুল ইবাদ হোক, অন্যান্য নাগরিকও কিন্তু সে কাজগুলো করে। সে কাজগুলো তারা তাদের মতো করে করে। যেমন: আমরা যাকাত দেই। যাকাত হলো শতকরা আড়াই শতাংশ। অন্যান্য ধনীরা কি গরীবদের জন্য ব্যয় করবে না?

এই যে সিএসআর (করপোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি), এই টার্মটা কিন্তু কোনো ইসলামী টার্ম নয়। এটি ওয়েস্টার্ন করপোরেট কালচার থেকে উদ্ভুত হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের ইনকামের একটা অংশ সমাজের জন্য ব্যয় করে। কোনো কোনো রাষ্ট্র আছে, আমি গ্রেট ব্রিটেনের কথা জানি, যারা তাদের টোটাল জাতীয় ইনকামের এক বা দুই শতাংশ তৃতীয় বিশ্বের জন্য ব্যয় করে। তারা যে নানা ধরনের সাহায্য-সহায়তা করে, সেগুলো কিন্তু ওই ফান্ড থেকে করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যার সম্পদ নেই বা ঘাটতি আছে, তার জন্য সম্পদশালীরা ব্যয় করে।

যাকাত হলো একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট। আড়াই শতাংশের পরিবর্তে এটি তিন শতাংশ হলেও কোনো অসুবিধা নেই, ক্ষেত্রবিশেষে এক বা দুই শতাংশ হলেও কোনো অসুবিধা নেই। এটি ১০ শতাংশও হতে পারে। যা হোক, এই আড়াই শতাংশ যাকাত দেয়ার পর বাকি সাড়ে ৯৭ শতাংশ অর্থ একজন মুসলমান কী কাজে ব্যয় করবে? আমি অনেক আলেমের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। তাদের ধারণা হলো, যাকাত আদায়ের পর বাকি অর্থ সে যে কোনো জায়েয কাজে ব্যবহার করতে পারবে। এটি তার অধিকার। কিন্তু এ কথাটি ঠিক নয়। রাষ্ট্র চাইলে এখান থেকে আরো শতকরা ১০-২০ টাকা বা যে কোনো পরিমাণ অর্থ কেটে রাখতে পারে। কথাটা বুঝার চেষ্টা করেন, যাকাতের টাকা তো গরীবদেরকে দেয়া হবে। তাহলে সরকার চলবে কীভাবে? রাস্তাঘাট কীভাবে হবে?

শ্রোতা: সরকারী ফান্ড থেকে।

আমি: সরকারী ফান্ড কোত্থেকে আসবে?

শ্রোতা: ট্যাক্স থেকে।

আমি: সেটাই তো বলছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যাকাত হলো ধর্মীয় ট্যাক্স বা ধনীর উপর গরীবের ট্যাক্স। তাহলে ধনীর উপর সরকারের ট্যাক্স কোথায়? ওটার কোনো পরিমাণ তো কোরআন-হাদীসে নির্ধারণ করা নেই। একে ফরযও করা হয়নি, হারামও করা হয়নি। তারমানে এটি মুবাহ। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আপনি একে

আরোপও করতে পারেন, প্রয়োজন না থাকলে এটি সম্পূর্ণ বাদও দিতে পারেন। যদি তাই হয়, তাহলে যাকাতের বিষয়টাও কিন্তু অন্যান্য নাগরিকরা তাদের মতো করে করবে।

তারপর বিয়ের ব্যাপারটিই দেখেন। আমাদের সবকিছুরই তো আল্লাহ সাক্ষী আছেন। তারপরও বিবাহযোগ্য নরনারী ন্যূনতম সাক্ষী বা শর্তগুলো পালন করার মাধ্যমে পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং পারিবারিক জীবনযাপন করে। এরমধ্যেও যে ধর্মীয় চেতনা কাজ করে, সেটি তো একটি হক্কুল ইবাদ। রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকরা এটি কীভাবে ফলো করবে? তারা কি যে কেউ, যে কারো সাথে, যে কোনো সময় সম্পর্ক করবে, কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না— এমন? অর্থাৎ, ধর্মীয় বন্ধনের বাইরে যারা জীবনযাপন করবে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ হোক, তারা কি অবাধ জীবনযাপন করবে? নিশ্চয় নয়। তারা একটি পারিবারিক জীবনযাপন করবে। এ জন্য তারা একটি বৈবাহিক সম্পর্ক তথা সামাজিক স্বীকৃতি বা সমাজের অবগতির মাধ্যমে তা করবে।

তাহলে আমরা এমন কোন হক্কুল ইবাদ কি খুঁজে পাই, যা শুধু মুসলমানদের ব্যাপার? যেমন: যুদ্ধ। মুসলমানরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করবে। কিন্তু দেশ আক্রান্ত হলে অমুসলিম নাগরিকরা কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? না, তারাও কিন্তু লড়াই করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা যত কাজই ধর্মীয় চেতনা থেকে করি, এই সবগুলো কাজই রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকরা ধর্মীয় চেতনা ছাড়াই করবে, করতে তারা কোনো না কোনোভাবে বাধ্য। কারণ, মানুষ হিসেবে আমাদের সবাইকেই খেতে হয়। শুধু মুসলমানরা খায়, বাকিরা বাতাস খায়, তা নয়।

আমাদের শারীরিক ও মানসিক কিছু মৌলিক দিক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যই সমান। আমি বলতে চাচ্ছি, হক্কুল্লাহ হিসেবে আমরা যা কিছু করি, তা তো আমাদের নিজস্ব পাপ-পুণ্যের ব্যাপার। আর হক্কুল ইবাদকে পাপ-পুণ্য হিসেবে বিবেচনার সাথে সাথে আমরা আইন ও নৈতিকতার ব্যাপার হিসেবেও ধরতে পারি। একজন মুসলমানের কাছে ইবাদতের বিষয়গুলো যদি ব্যক্তিগত হয়, আর মুয়ামালাতের বিষয়গুলো যদি সামাজিক হয়...।

শ্রোতা: মুয়ামালাত বলতে কী বুঝায়?

আমি: মুয়ামালাত হলো হক্কুল ইবাদ। মানে সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলো। এটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো লেনদেন। পারস্পরিক ইন্টার‍্যাকশনের যে ব্যাপারটা, সেটাই আর কি।

হক্কুল ইবাদ বা মুয়ামালাতের বিষয়গুলো একজন মুসলমান ব্যক্তিগত হিসেবে পালন করতে অসুবিধা কী? একই কাজ তো ধর্মীয় চেতনা ও পদ্ধতি বাদ দিয়ে অমুসলিম নাগরিকরাও করছে। তাহলে একজন মুসলমান কেন ধর্মীয় চেতনা ও পদ্ধতি বাদ দিয়ে এসব কাজ করতে পারবে না?

শ্রোতা: তাহলে যেমন ধরেন, হজ। হজ্ব, যাকাত— এগুলোর তো একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ইসলামে আছে।

আমি: শুধু নিয়ম নয়, এগুলোর মধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট বা নিয়তের ব্যাপার আছে। এটাও মাস্ট। নিয়ত ও কাজের পদ্ধতি, দুটোই কিন্তু ইসলাম মোতাবেক হতে হবে।

শ্রোতা: তাছাড়া এগুলো তো আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত। আপনি যদি এগুলো ইসলাম মোতাবেক না করেন, তাহলে তো পাপ হবে।

আমি: হ্যাঁ, পাপ হবে। কিন্তু রাষ্ট্র কেন সে ব্যাপারে আমাকে কনসার্ন করবে?

শ্রোতা: হজ্ব ও যাকাতের বেলায় তো রাষ্ট্র কনসার্ন করছে না।

আমি: তাহলে ধনীরা হজ্ব না করলেও রাষ্ট্র তাদেরকে কিছু বলবে না। আচ্ছা, তারা যদি কোরবানী না করে? কেউ যদি এমনিতে আড়াই শতাংশের বেশি সিএসআর করে, কিন্তু যাকাত না দেয়, এই আর্টিকেলের লেখক অনিরুদ্ধ অনিকের বক্তব্য অনুসারে, রাষ্ট্র তাকে কি বাধা দিতে পারবে? পারবে না। তাহলে একজন মুসলমান নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাধীন। ইসলাম যেভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করতে বলে, সে যদি সেটা করতে অস্বীকার করে; তবে এমনিতে সাধারণ নাগরিকরা দেশের নিরাপত্তার জন্য যেভাবে কাজ করে, সেভাবে সে কাজ করবে। এতে সমস্যা কী? অন্যান্য নাগরিকরাও তো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাসহ মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলো নিচ্ছে। তাদেরও এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা আছে। তাদের এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। দেশের প্রতিরক্ষার মধ্যেও তাদের এক ধরনের অংশগ্রহণ আছে। অর্থনীতির মধ্যেও তাদের অবদান আছে। জনকল্যাণে তাদের কন্ট্রিবিউশন আছে। তাই না? রাষ্ট্রের অপরাপর নাগরিকরা এই সুবিধাগুলো পাচ্ছে এবং তারা এই কাজগুলো করছে। তাহলে একজন মুসলিম নাগরিক করতে পারবে না কেন?

এখন আমরা যদি মনে করি, তার করতে না পারার কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, তারমানে সে করতে পারবে। রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকই যদি ইসলামী শরীয়াহকে শরীয়াহ হিসেবে মানতে বাধ্য না হয়, তাহলে এখন আমরা কোন

পর্যায়ে চলে আসলাম? আমরা এ পর্যায়ে আসলাম যে ধর্মটা হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর সমাজটা হচ্ছে একটা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপার।

তাহলে ধর্মটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। ফলে আপনি চাইলে এটি করতে পারেন। সমাজ আপনাকে সেটি এলাউ করছে। এটি এমন সেক্যুলারিজম নয়, যেখানে আপনি ধর্ম মানতে পারবেন না।

এই যে আপনি বোরকা ও স্কার্ফ পরেছেন, এটি কেন করছেন? আপনি হয়তো মনে করছেন— আল্লাহ তায়ালা পর্দা করার হুকুম দিয়েছেন, সেজন্য আমি তা পালন করছি। এই হুকুম পালন করতে গিয়ে আপনার অনেক ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। অন্যদিকে, কেউ মনে করতে পারে— রোদ, ধূলাবালি অথবা আনএক্সপেক্টেড এটেনশন ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য আমি বোরকা বা হিজাব পরছি। এমনটি কেউ মনে করতে পারে না? একই কাজ ভিন্ন ভিন্নভাবে করতে পারে।

তাহলে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় দায়দায়িত্ব পালন করতে পারবে, রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। রাষ্ট্র যদি তাদের কোনো ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে ইসলামটা সেখানে থাকবে কেন? এটি অহেতুক একটি লেজুড়ের মতো হয়ে পড়বে না? এটা একটা রিডানডেন্সি হলো না? যে জিনিসটা ছাড়াই আপনার সবকিছু চলে, সে জিনিসটা থাকার দরকারটা কি? তাই না?

তারমানে আমরা ইসলামিক প্যারাডাইম থেকে শিফট করে সেক্যুলার প্যারাডাইমে চলে আসলাম। অথচ প্রথমে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম, ইসলামিক প্যারাডাইম ও সেক্যুলার প্যারাডাইম আলাদা দুটি বিষয়। তাহলে প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে মুসলিম চিন্তাবিদ, ফকীহ ও মুসলিম দার্শনিকরা ইসলামী রাষ্ট্রের যে চিত্র, চরিত্র, প্রকল্প তৈরি করেছেন, সে অনুযায়ী কিন্তু রাষ্ট্র মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবেও নিয়ন্ত্রণ করবে, উদ্বুদ্ধ করবে। তবে সব বিষয়ে রাষ্ট্র তার নিজস্ব আইন নিয়ে হাজির হবে না এবং রাষ্ট্রের আইনও কিন্তু এক রকম নয়। যেমন: যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের বিভিন্ন মাত্রা আইনে দেয়া থাকে। সে অনুযায়ী একজন বিচারক সর্বোচ্চ শাস্তিও দিতে পারেন, আবার সর্বনিম্ন শাস্তিও দিতে পারেন।

তাহলে নৈতিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে সেক্যুলার রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্র সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে না। যে বিষয়গুলোকে ফিক্স করে দেয়া আছে, সেগুলোকে রাষ্ট্র সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সে রকম। নৈতিকতার যে বিষয়গুলো মোর পারসোনাল, মোর মোরাল, সেগুলো হবে লেস লিগ্যাল, লেস লেজিসলেটিভ। এর আইনগত দিকটা যথাসম্ভব কম হবে। নৈতিকতা যেখানে

বাড়বে, আইনগত ব্যাপার সেখানে কমবে। আর আইনগত বিষয় যেখানে যত বেশি বাড়তি হবে, নৈতিকতার অবকাশ সেখানে তত কমতে থাকবে। আইন যত শক্ত হবে, স্বাধীনতা তত সীমিত হবে। আর স্বাধীনতা বা বিকল্প বেছে নেয়ার ব্যাপার যত বেশি হবে, আইনটা তত ফ্লেক্সিবল হবে। এবং টোটালি ফ্রি একটা সিচুয়েশনে কিন্তু কোনো আইন থাকবে না। আর যেখানে আইন প্রয়োগযোগ্য সেখানে আইনের কোনো অন্যথা বা আদার অপশন হতে পারে না। আইনের প্রয়োগযোগ্যতা যেখানে বলবৎ সেখানে আইন ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ থাকবে না। Either you do it, or don't do it. If you do it, it's OK. Or, if you don't do it, you will be punished. এটিই হলো আইনের অভিন্ন ভাষা।

তাহলে মানুষের পাপ কাজ নিয়ে যখন ইসলামী রাষ্ট্র কনসার্ন হবে, তখন এসব বিষয়কে সে ধরনের ব্যাপার মনে করা হবে না, যেগুলোর জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। যেমন: ব্যভিচার বা জিনার নির্ধারিত শাস্তি আছে। চুরির একটা শাস্তি আছে। এখন কেউ চুরি করলো, কিন্তু ধরা পড়লো না, তখন কী হবে? রাষ্ট্র কাকে শাস্তি দেবে?

শ্রোতা: কাউকে দিবে না।

আমি: কাউকে দিবে না। তাই তো? কিন্তু অপরাধ তো সংঘটিত হয়েছে। সে ব্যাপারে রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা করছে? কোনো ব্যবস্থা করেনি। আসলে করতে পারেনি। মনে করেন, কেউ নিহত হলো। হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাহলে কাকে শাস্তি দেবে? দেবে না। তাই না? কেন দেবে না? কারণ, রাষ্ট্র দিতে পারছে না। তাহলে একটি অপরাধ হয়েছে, কিন্তু অপরাধটিকে রাষ্ট্র ট্রেস করতে পারেনি।

তেমনি পাপের বিষয়গুলোও, যেগুলো আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো রাষ্ট্র ট্রেস করতে পারে না। হত্যা করাও একটা পাপ, মিথ্যা কথা বলাও একটি পাপ। এখন কিছু মিথ্যা কথা আছে, যেগুলো বললে চুক্তি ভঙ্গ হয়। রাষ্ট্র সেগুলো ধরে থাকে। আবার কিছু মিথ্যা আছে, যেগুলো বলার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ হয় না, বা হলেও রাষ্ট্র তা ধরতে পারলো না, কিংবা আমি যে মিথ্যা বলেছি তা প্রমাণ করা গেলো না। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিন্তু ধরলো না। তাহলে মানুষের ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ইতাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে পাপগুলোকে রাষ্ট্র আইডেন্টিফাই করতে পারে না, সেগুলোকে আমরা পাপ বলছি; আর যে পাপগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে, সেগুলোকে অপরাধ বলছি। তাহলে আদতে পাপ ও অপরাধের এই বাইনারিটা

আর থাকে না।

শ্রোতা: সেক্যুলার প্যারাডাইমে যেমনটা বলা হয়, ধর্মটা হলো ব্যক্তিগত, আর রাষ্ট্রটা হলো সবার। তাহলে ইসলামী প্যারাডাইমে ফাইনালি ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ালো?

আমি: ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে যদি আমরা চিন্তা করি— এটি হলো মুসলমানদের রাষ্ট্র। ইসলাম অনুসারীরাই সেখানে মূলত নাগরিক। বাকিরা হলো তাদের জিম্মি বা আশ্রিত, তারা আসলে সমান নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত নয়। ইসলামী রাষ্ট্রকে যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি, তাহলে সেখানে ধর্ম আর ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে থাকছে না। এখানে রাষ্ট্রটাই হলো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র।

শ্রোতা: মুহাম্মদের (সা.) সময় কি এমন ছিলো?

আমি: না। আমরা যদি মনে করি, ইসলামী রাষ্ট্রটা হলো মুসলমানদের রাষ্ট্র, তাহলে রাষ্ট্রের ধরন এক রকম হবে। আর যদি মনে করি, ইসলামী রাষ্ট্র হলো এমন রাষ্ট্র, যেটি শুধু মুসলমানদের নয়, তবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র। তাহলেও সেটি এক ধরনের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে। আর আমরা যদি মনে করি, ইসলামী রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রও নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্র হলো এমন রাষ্ট্র, যেখানে রাষ্ট্র সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। তাহলে এটি প্রথম দুই প্রকারের ধর্মীয় রাষ্ট্রের মতো হবে না। ধর্মীয় রাষ্ট্র যদি না হয়, তাহলে ধর্মীয় বনাম ধর্মনিরপেক্ষ, এহেন বাইনারির হিসেবে এটি এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই হবে।

এ জন্য এই কথাটা খুব প্রাসঙ্গিক যে ইসলামী রাষ্ট্রের একক কোনো মডেল নেই, যেটি ফলো করলে তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে। কথাটা সহজে বুঝানোর জন্য পোশাকের কথা বলা যেতে পারে। নারীদের পোশাক বা পুরুষদের পোশাক, যে ধরনেরই হোক না কেন, পোশাকের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণ হলেই হলো। তাহলে একজন পুরুষ হিসেবে আমি যদি শুধু একটা থ্রি-কোয়ার্টার পরে থাকতাম, তাহলেই বোধহয় ভালো হতো। নাকি?

শ্রোতা: না।

আমি: কেন নয়?

শ্রোতা: ওটা ইনডিসেন্ট।

আমি: কিন্তু ওটা তো রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করছে।

শ্রোতা: তা সত্ত্বেও সেটা ইনফরমাল।

আমি: ফরমাল রিকোয়ারমেন্ট তো সেটা ফিলাপ করছে। তাহলে সেটা ফরমাল হবে না কেন?

শ্রোতা: কিন্তু সমাজ সেটি মেনে নিচ্ছে না। মানে, ওভাবে...

আমি: সমাজের চিন্তাটা বাদ দেন, আমরা যদি আইডিয়েল চিন্তা করি— একজন পুরুষ মানুষ যদি কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে পোশাক পরে, আর বাদবাকি কোনো কিছু না পরে, তাহলে তো তার পোশাক পরার দায়িত্ব পালন হচ্ছে। আপনি এটাকে ইনফরমাল, ইনডিসেন্ট বলছেন কেন?

আচ্ছা, আমরা যদি নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে আসি, তাহলে আলোচনাটা আরো একটু সুন্দরভাবে করতে পারবো। নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে এক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট, ঘরের ভেতর পারিবারিক পরিবেশে আরেক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট। আবার যেখানে কোনো পুরুষ নাই, শুধু নারীরাই রয়েছে, সেখানে রিকোয়ারমেন্ট আরো শিথিল।

ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সে রকম। ইসলামী রাষ্ট্র এমন কোনো সিঙ্গেল এন্টিটি নয় যে এই এই নিয়মকানুনগুলো সর্বোচ্চভাবে বজায় থাকলে সেটা ইসলামী রাষ্ট্র হবে, অন্যথায় নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা আরেকদিন বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম— শরীয়াহ বাস্তবায়নে ক্রমধারার অপরিহার্যতা নিয়ে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর পরই যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে এমন অনেক নিয়মকানুন ছিলো না, যেগুলো পরে এসেছে। তৎসত্ত্বেও সেটি কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রই ছিলো।

তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়। ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র নয়। ইসলামী রাষ্ট্র হলো সেটি, যেখানে ইসলামের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো প্রতিফলিত হয়। এখন ইসলামের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তো একটিমাত্র জিনিস নয় যে এটি নিলাম, তাই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে গেলো, কিংবা এটি নিলাম না, তাই এটি সম্পূর্ণ বাদ গেলো। ইসলামের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক নীতিমালাগুলো তো অনেক হায়ারার্কিকাল। হিজরতের পর মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় যে ১০ বছর বেঁচেছিলেন, সেই সময়টার কথা যদি বলি, প্রথম হিজরীর ইসলামী রাষ্ট্র, পঞ্চম হিজরীর ইসলামী রাষ্ট্র এবং দশম হিজরীর ইসলামী রাষ্ট্রের চেহারা কিন্তু এক নয়। তাই না? তাহলে কোন সময়কালটা আসলে ইসলামী রাষ্ট্র হবে?

এই বিষয়ে আমার এক লেখায় একটি স্কেল তৈরি করে আমি দেখিয়েছি— যেখানে ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে বাধাবিঘ্নহীনভাবে মানা যায় এবং সামাজিক বিষয়গুলোতে ইসলামের সবচেয়ে ভালো অপশনটা মানা না গেলেও লোয়েস্ট অপশন দিয়ে চলা যায়, সেটিকে যদি আমরা সিভিল ডেমোক্রেটিক স্টেট ধরি, যে স্টেটটা টলারেন্ট, ইনক্লুসিভ, ওইটাও এক ধরনের ইসলামী রাষ্ট্র। তবে এটি খুব লোয়ার লেভেলের ইসলামী রাষ্ট্র। যেমন, একজন পুরুষ হিসেবে আমি যদি শুধুমাত্র একটি থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট পরে বসে থাকি, এটি আমার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টকে ফুলফিল করে, কিন্তু আমার জন্য এটি ডিসেন্ট হতো না। একইভাবে, ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনগুলো যত ভালোভাবে পালন করা যাবে, এগুলো সমাজে যত ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সেই রাষ্ট্রটা তত উন্নতমানের ইসলামী রাষ্ট্র।

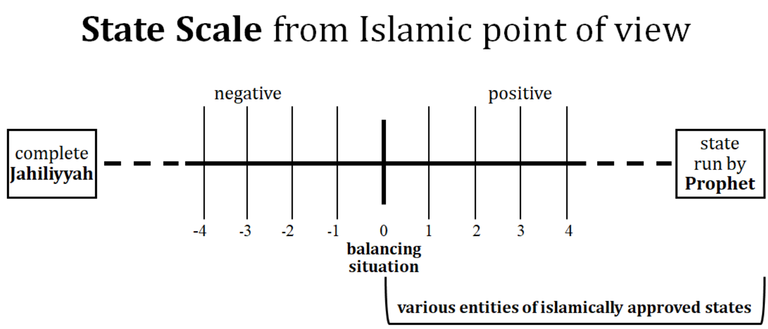

তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র কিন্তু একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তবে এটি যে অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রচলিত রাষ্ট্রগুলোর সাথে এর একটি পার্থক্য হলো, মুসলমানরা ওই রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে বসবাসের মাধ্যমে সবকিছু করবে আল্লাহর নিয়তে এবং যথাসম্ভব আল্লাহর ইবাদতের ফরমেটে। যথাসম্ভব বললাম এই জন্য যে মনে করেন, যাকাত আদায়কারী কোনো প্রতিষ্ঠান ওই রাষ্ট্রে নেই। একটি সিভিল ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের কথাই ধরেন। একটি ইনক্লুসিভ রাষ্ট্র। মুসলমানরা সেখানে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেবে, রাষ্ট্র তাতে বাধা দিচ্ছে না।

রাষ্ট্র যদি বলে, তুমি এভাবে হিসাব করে আড়াই শতাংশ কাউকে দিতে পারবে না, তাহলে তো এটি আর ইনক্লুসিভ, টলারেন্ট স্টেট হলো না। সেই তো এগ্রেসিভ একটি রাষ্ট্রই হলো। তুরস্কে বলেছে না যে তুমি মাথায় কাপড় দিতে পারবে না। কেন, কেউ রোদ থেকে বাঁচার জন্যও তো মাথায় কাপড় দিতে পারে। অথবা, কেউ আল্লাহর ইবাদতের নিয়তে পর্দা করেছে, কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলে সে

বলতে পারে যে এটি আমার পার্সোনাল লিবার্টি। এবং আই ফিল বেটার ইন দ্যাট। সেটা সে বলতেই পারে। এবং সেটি ইসলামের দৃষ্টিতেও কোনো সমস্যা নয়।

তাহলে যে নিয়মগুলো একজন মুসলমান সমাজে পালন করতে পারছে, সেগুলো সে করলো। এবং সবকিছুই সে ইবাদতের নিয়তে করলো। সমাজে যেগুলো খুব একটা স্ট্রাকচারাল ফরমেটে নাই, সেগুলো সে পার্সোনালি করলো, যথাসম্ভবভাবে করলো। তাহলে ইসলামী বিষয়গুলো ইসলাম যেভাবে করতে বলেছে, ঠিক সেভাবে মুসলমানরা যত বেশি পালন করতে পারবে, সেটি হচ্ছে তত বেশি ইসলামী রাষ্ট্র। কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি মাত্র একজন মুসলমান থাকে এবং ইসলামের সকল নিয়মকে সে যদি স্বাধীনভাবে মানতে পারে, তাহলে সেটি ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমাদের মধ্যে একটা ব্যাপক মিসকনসেপ্ট আছে। কথাগুলো শুনে আপনিও অবাক হয়ে যাচ্ছেন যে কথাগুলো কত র‍্যাডিক্যাল! এবং আমার মতো লোক না বললে অন্যরা তো ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখাতো যে কী কথা বলছে!

আর কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানরা যদি মেজরিটি হয়, তাহলে মাইনরিটিরা সেখানে মুসলমানদের সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। রাষ্ট্র অমুসিলমদের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব ফলাবে না। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় বা নৈতিক মান বজায় রাখার চেষ্টা করবে। তাহলে ধর্মীয় মানটাও কিন্তু এক ধরনের নৈতিক মান। নৈতিকতার জন্য রাষ্ট্র শাস্তি দেবে না। কিন্তু নৈতিকতা গড়ে তোলার জন্য কি রাষ্ট্র কন্ট্রিবিউট করবে না? নৈতিকতা গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র এক ধরনের মেকানিজম ফরম্যাট করবে না?

কথার কথা, বাচ্চাদেরকে স্কুলে আমরা কেন শেখাই? স্বাধীনভাবে কোনো কিছু শেখার যোগ্য নয় বলেই তো তারা বাচ্চা। এখন এই বাচ্চা বয়সে আমরা যদি তাদেরকে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিষয়গুলো না বলি, তাহলে বড় হয়ে সে কিন্তু সেগুলো অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। ফলে সমাজে সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না। সভ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে না।

বাচ্চারা কি ধর্ম বুঝে, বিজ্ঞান বুঝে, বা অন্য কিছু? কিছুই বুঝে না। বিজ্ঞানের নিয়মগুলো ধর্মের নিয়মগুলোর মতোই কি সে মুখস্ত করে না? সে কি এগুলো টেস্ট করে করে দেখেছে? কথার কথা আর কি। তো, তাকে যদি ধর্ম শিক্ষা না দেয়া যায়, তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষা কেন দেয়া হবে? আপনি মনে করছেন, বিজ্ঞানটা উপকারী, ধর্মটা অপকারী। এটা আপনার মনে করার বিষয়। আমি মনে করতে পারি, ধর্মটা উপকারী, একইসাথে বিজ্ঞানটাও উপকারী। ধর্মের পাশাপাশি বিজ্ঞানও থাকা উচিত, এটা আমি মনে করতে পারি।

তাহলে মুসলমানরা মেজরিটি হলেও মাইনরিটিরা সমান অধিকার পাবে। ওই নাগরিকদেরকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের সমাজে মূল গণ্ডগোলটা পাকিয়েছে এখানে যে আমরা মুসলামান বিবেচনা করি আদমশুমারির গণনা দেখে। যেহেতু তারা মুসলিম নাম ধারণ করে, কিছু ইসলামী সংস্কৃতিও পালন করে, তাই তারা মুসলমান। কিন্তু ইসলাম তো আসলে সেই ধরনের বিষয় নয়। তাহলে কি মুসলিম রাষ্ট্রে খ্রিষ্টানদের ব্যাপ্টিজম করার মতো...

শ্রোতা: ব্যাপ্টিজম মানে?

আমি: ব্যাপ্টিজম মানে হলো, একটু বড় হওয়ার পর একজন খ্রিষ্টানকে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তার মাথার চুল কামিয়ে দিয়ে মাথায় পবিত্র জল ঢালা হয়। এ সময় মন্ত্রপাঠ করা হয়। এর ফলে এখন থেকে সে খ্রিষ্টান হয়ে গেলো। এই হলো ব্যাপ্টিজম। মুসলমানদের মধ্যে তো এ ধরনের কোনো ব্যাপ্টিজম নাই।

তাহলে কি ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে এমন একটি ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে লোকজন ডিক্লারেশন দিবে যে হ্যাঁ, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম? আপনার কাছে কোনটা প্লজিবল মনে হয়? এগুলোর প্রত্যেকটাকেই আপনার কাছে পিকিউলার বলে মনে হবে।

জন্মগতভাবে মুসলমানদেরকে মুসলিম হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হচ্ছে না বলে যদি মনে করেন, তাহলে খ্রিস্টানদের মতো এক সময় কোথাও গিয়ে সে একটা ডিক্লারেশন দেবে– হ্যাঁ, এখন থেকে আমি মুসলমান, ইসলাম গ্রহণ করলাম। আপনি তাকে এই যুক্তিতে ধর্মীয় নৈতিকতা শেখানোর জন্য বাধ্য করবেন, যেহেতু সে ইসলামের অনুসারী। সে যদি ইসলামের অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে কেন সে ইসলামের অনুসরণ করবে না? কিন্তু সে কখন থেকে ইসলামের অনুসারী হলো? কখন সে বললো যে, হ্যাঁ, আমি এখন থেকে ইসলামের অনুসারী?

তাহলে, তার ঘোষণা দেয়া যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, জন্মগত পরিচয়ও যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য পন্থা কী? আপনার কাছে কী মনে হয়?

আমার কাছে মনে হয়, ধর্মগ্রহণ করা বা না করার অবাধ স্বাধীনতা থাকা উচিত। কেউ যেন চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে, বা কোনো সুবিধা পাওয়ার জন্য, বা কোনো অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য ধর্মের অনুসারী না হয়। সেক্ষেত্রে ব্যাপ্টিজম বা রেজিস্ট্রেশন জাতীয় কিছু না করে বরং একটা সামাজিক আবহ বা সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার। কেউ চাইলে এটি মানবে বা মানবে না। তবে যারা সেটি মানবে, রাষ্ট্র তাদেরকে সেটি মানার জন্য বাধ্য করবে। এখানে এসে দেখা যাচ্ছে, অপরাধ

ও পাপের পার্থক্যটি আর থাকছে না।

সমস্যা হলো, রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্য করার অর্থকে আমরা ধরে নিচ্ছি, সৌদি আরবের মতো সবাই নামাযের সময় লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং পেটানো শুরু করবে। এই আর্টিকেলে যেটাকে বলা হয়েছে 'মোরাল পুলিশিং'। আসলে ব্যাপারটা সে রকম নয়। রাষ্ট্র যে আমাদেরকে বাধ্য করে, সেটি কীভাবে করে? রাষ্ট্র আমাদেরকে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে যেতে বলে। আমরা তো বাম পাশ দিয়েও যাই। রাষ্ট্র আমাদেরকে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে বলে। আমরা তো রাস্তার উপর দিয়েও হাঁটি। রাষ্ট্রের নিয়ম তো আমরা কতই ভঙ্গ করছি। এখন কেউ বলতে পারে, বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে যেখানে আইনের বাস্তবায়ন নেই, সেখানে হয়তো আপনি তা করতে পারছেন। কিন্তু বাকি জায়গায় গেলে খবর আছে।

আসলে কোথাও কিন্তু রাষ্ট্র মানুষকে সর্বাংশে নিয়ন্ত্রণ করে না, করতে পারেও না, বা করতে চায়ও না। রাষ্ট্র যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন কিন্তু রাষ্ট্র বিচারকদেরকে বা যারা আইন প্রয়োগ করবে, তাদেরকে একাধিক অপশন দিয়ে রাখে। আমাদের দেশের আইনের কথাই ধরেন। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের একটি বিরাট স্বাধীনতা থাকে যে তারা কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবে। তাদের একটি বিবেচনাবোধ বা স্বাধীনতা থাকে। আবার একটি ফরমাল শুনানির মাধ্যমে বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে গেলে, তখনও কিন্তু বিচারকের এক ধরনের বিশেষ ক্ষমতা থাকে। তাহলে রাষ্ট্র আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রের মতো করে। রাষ্ট্রও তো সব অপরাধ ধরতে পারে না।

তাহলে মূল কথা হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ ও অপরাধের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু এইসব লেখার মধ্যে ওয়েস্টার্ন প্যারাডাইমের আলোকে যে রকম পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে, ব্যাপারটা আসলে তেমন নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আদতে পাপ ও অপরাধের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। সকল ভালো হচ্ছে পুণ্য, আর সকল খারাপ হচ্ছে পাপ। সকল পাপই হচ্ছে অপরাধ, আর সকল অপরাধই হচ্ছে পাপ। তবে আমরা যখন পাপ বলি, তখন আমরা সেই ধরনের অপরাধকে বুঝিয়ে থাকি যেটির বিচার শুধু আল্লাহ করবেন। আর অপরাধ বলতে বুঝিয়ে থাকি, যার বিচার বান্দাহগণও করতে পারে বা করে বা করার কথা। কিন্তু ওয়েস্টার্ন প্যারাডাইমে 'পাপ' নামক অপরাধকে নিছকই ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, বিয়েশাদি— সবকিছু যদি ব্যক্তিগত হয়, তাহলে ধর্মটাই থাকার দরকার কী?

আসল জিনিসটা হলো নৈতিকতা ও আইনের মধ্যকার ব্যাপারটি। নৈতিকতার সব

বিষয় আইনে থাকে না। আর নৈতিকতা সংক্রান্ত ইসলামের ধারণা কিন্তু জগতের বিস্তৃতির সাথে সম্পর্কিত।

সেক্যুলার প্যারাডাইমে জগৎটা হলো আমরা যতটুকু দেখি ততটুকু। এখানে জীবনটা হলো আমরা যতটুকু বেঁচে আছি ততটুকু। আর ইসলামী প্যারাডাইমে জগতের ধারণা হলো— আল্লাহর সৃষ্টি অনেক বড়। আল্লাহ আমাদের জন্য অনেক মাখলুকাত তৈরি করে রেখেছেন। এবং এরমধ্যে মানুষ হলো সেরা। মানুষের এই জীবনটা হলো একটা কন্টিনিউশন। দুইটা প্যারাডাইমের মধ্যে ধারণাগত এ রকম বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তাই তাদের 'প্রাইভেট-পাবলিক ডিস্টিংশনের' ধারণাটি এখানে হুবহু প্রযোজ্য হবে না। এটা হলো মূল ব্যাপার।

"কথা বলতে দিতে হবে, চাই
প্রশ্ন করার অধিকার।"

— মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

অন্যান্য কমিউনিটির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক

জামাল বাদাবী

অনুবাদ: আইয়ুব আলী

আজকের খুতবার বিষয় হচ্ছে অন্যান্য কমিউনিটির সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক। এ আলোচনায় দুটি বিষয়ের উপর আমরা দৃষ্টিপাত করবো। এই সম্পর্কের ভিত্তি কী? (১) এটা কি কারো দাবি কিংবা কাজের উপর নির্ভরশীল? নাকি, (২) এ বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর দিকেই আমরা ফিরে যাবো? এ জন্য প্রাথমিকভাবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। তারপর এগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত জানতে হবে। শেষোক্তটিকে আমি 'ইসলামী বিশ্বজনীন মূল্যবোধ' হিসেবে বলতে চাই। এটা অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার। এই সম্পর্ক নিয়ে ইসলামে কোনো অসঙ্গতি নেই। শুধু মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কোরআনে যেমন বক্তব্য রয়েছে, তেমনি সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যেও বক্তব্য রয়েছে। 'ইয়া আইয়ুহান নাস' (হে মানুষ!) কিংবা 'হে আদমের সন্তানেরা!'– কোরআনের এ জাতীয় সম্বোধনগুলো প্রত্যেক কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তিনটি মৌলিক বিশ্বাস

শুরুতে আমি ইসলামের তিনটি মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

১। তাওহীদ

তাওহীদ বলতে একেশ্বরবাদের চেয়েও বেশি কিছু বুঝায়। তাওহীদের ধারণা

এটি ড. জামাল বাদাবীর একটি খুতবার অনুবাদ। ২০১৫ সালের ২৭ মার্চ বৃটেনের ইস্ট লন্ডন মসজিদে তিনি খুতবাটি প্রদান করেন। দেখুন: https://youtu.be/QLHYvtiDTak

অনুযায়ী— বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহর এককত্বকেই বুঝায়। তাই আল্লাহ তায়ালাই আমাদের উপাসনা ও পূর্ণ আনুগত্য সমর্পণের একমাত্র প্রাপ্য সত্তা। আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই। অর্থাৎ 'আসমা ওয়াস সিফাত' তথা আল্লাহর গুণাবলি ও চমৎকার নামসমূহ এমন কোনো সত্তার অংশ নয়, যা নিজেই অন্য কোনো রূপ বা প্রতিমূর্তি হিসেবে বিবেচিত। এ কারণেই তাওহীদের ধারণা একেশ্বরবাদের ধারণাকে ছাড়িয়ে যায়। এ ধারণা অনুযায়ী, আল্লাহ একজন। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি ও চমৎকার নামসমূহের দিকে তাকালে আমরা দেখবো, তিনি হচ্ছেন চূড়ান্ত হুকুমদাতা ও পরমসত্তা। তাই কে কী বললো বা দাবি করলো তা বিবেচ্য নয়। কারণ, পরম সত্তা আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে বলে দিয়েছেন— কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল; কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি হচ্ছে— তাঁর পরম প্রজ্ঞার প্রতি গভীর আস্থা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা ও জান্নাতের আকাঙ্খা; পাশাপাশি তাঁর অবাধ্যতাকে পরিহার করা, যা পরকালে মানুষকে চূড়ান্ত ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এগুলো বিশাল ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপার কিংবা নিছক বিমূর্ত কিছু কথাবার্তা। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। মুসলমানরা যখন অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা করে তখন এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। ধন-সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও একজন সত্যিকারের মুসলমান অহংকারী ও উদ্ধত হয়ে ওঠে না, মানুষের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অন্যায়ে লিপ্ত হয় না। কারণ সে জানে, পরকালে এসব কৃতকর্মের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

২। নবুয়ত

যুগে যুগে আগত নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেরিত বাণীর প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি। নবুয়তের ধারণা এবং পূর্বেকার নবী-রাসূলগণের নিকট প্রেরিত বাণীর মূলকথা একই। আমরা শুধু সে অংশগুলোর উপর গুরুত্ব দেবো, যেগুলো এখনো অবিকৃত রয়েছে। আল্লাহর সে সমস্ত বাণীর কোন অংশগুলো অবিকৃত, তা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে কোরআন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য অন্য কোনো কিছু বিবেচনার মানদণ্ড হিসেবে কোরআনকে গ্রহণ করার জন্য বলেছেন। তিনি বলেছেন,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থসমূহের

সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

[সূরা মায়েদা: ৪৮]

পূর্বে নাযিলকৃত ওহীর যে অংশটুকু অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিত রয়েছে সেগুলোকে অনুমোদন দিতেই কোরআন এসেছে। তাই কোরআন হচ্ছে 'মোহাইমিন' তথা চূড়ান্ত ফয়সালাকারী বা মানদণ্ড। এ কারণে একে 'আল ফোরকান'ও বলা হয়। যার অর্থ হচ্ছে, বিকৃত ও অবিকৃত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার মানদণ্ড।

তাই একজন প্রকৃত মুসলমান কখনোই পূর্বে নাযিলকৃত সব ওহীকে নির্বিচারে গ্রহণ বা বর্জন করে না। কোরআন যে ব্যাপারে একমত পোষণ করে, মুসলমানরা তা গ্রহণ করে। যেহেতু তা কোরআনের মর্মবাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এর তাৎপর্য হলো এই— এখানে একাধিক স্রষ্টার মধ্যে প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব নেই, কারণ, স্রষ্টা তো একজনই। কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা ভিন্ন বিশ্বাস ধারণ করলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য নবী-রাসূল বা তাঁদের উম্মতদের বিপক্ষেও আমাদের কোনো অবস্থান নেই। সত্যিকার অর্থে এটি বরং বিদ্যমান মুসলিম কমিউনিটিকে আরো বৃহত্তর ঈমানদার কমিউনিটি তথা সমাজে উন্নীত করার পথ প্রশস্ত করে। কারণ, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ শুধু তাদেরই নয়, আমাদেরও। কোরআনের ভাষ্য হচ্ছে,

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।

[সূরা বাকারা: ২৮৫]

৩। আখেরাতে ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা

আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই তার কথা ও কাজ তথা সবকিছুর জন্য আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ। কেউ মনে করতে পারে, কোনো ব্যাপারে সে দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। খুন-খারাবির মতো অপরাধ করেও কেউ কেউ রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা ও শাস্তি থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

এই মৌলিক বিশ্বাসেরও একটা বাস্তব প্রয়োগ রয়েছে। সেটি হলো— যদি কোনো মুসলমান বা মুসলিম গোষ্ঠী দুঃখজনকভাবে আল্লাহ বা ইসলামের নামে অন্যদেরকে হয়রানী, দুর্ব্যবহার, কোরআনের শিক্ষার বিপরীতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্যকরণ

কিংবা বর্বরভাবে হত্যা করে; তাহলে পরকালে তাদের জন্য নিকৃষ্ট পরিণতি অপেক্ষা করছে। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী বলেছেন— পরকাল, জবাবদিহিতা, শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাসের ধারণাগুলো নিরেট তত্ত্বকথা কিংবা খোদার প্রতি অন্ধবিশ্বাস মাত্র নয়। তাঁর মতে, এটি হচ্ছে একজন মুসলমানের যাবতীয় নৈতিকতা ও নৈতিক আচার-আচরণের ভিত্তি। ইচ্ছা করলে কোনো ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস না করে আল্লাহর অবাধ্যতাকে উপভোগ করতে পারে।

যাইহোক, এবার মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। অন্যান্য কমিউনিটির সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের কথা পরিস্কার করতে গিয়ে আমরা এইসব মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসগুলো ছাড়াও আরো কিছু সহজ বিষয় তুলে ধরতে পারি, যাতে সব ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যায়। তাই আমরা কোরআন-সুন্নাহ ও প্রিয় নবীর (সা.) জীবনী থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করবো। এগুলো অন্য কারো মতামত নয়।

সার্বজনীন ইসলামী মূল্যবোধ

আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, কোরআনে দুই ধরনের সম্বোধন রয়েছে। ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে 'ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু' (হে ঈমানদারগণ!) বলে। তারমানে কি অন্যান্য মানুষকে বাদ দেয়া হয়েছে? না। খেয়াল করলে দেখতে পাবেন— নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদির মতো মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় বিষয়ে যখন কথা বলা হয়েছে তখনই কেবল 'হে ঈমানদারগণ' সম্বোধন করা হয়েছে। যারা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আগেই এসব বিষয়ে নির্দেশ দেয়ার যৌক্তিকতা নেই। বরং এসব নির্দেশনা তাদের জন্য, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

একইসাথে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে দেয়া বক্তব্যও কোরআনে রয়েছে। সে কারণেই আমরা একে সার্বজনীন মূল্যবোধ বলছি। এ মূল্যবোধগুলো একইসাথে ইসলামী ও সার্বজনীন। কোরআনে যখন বলা হয় 'ইয়া আইয়ুন নাস' (হে মানুষ!), তখন কি শুধু মুসলমান কিংবা আসমানী কিতাবধারীদের কথাই বলা হয়? 'আইয়ুহান নাস' মানে হলো সমগ্র মানবজাতি। আবার বলা হয়েছে, 'ইয়া বনী আদম' অর্থাৎ হে আদমের সন্তানেরা! কেউই আদমের সন্তান হিসেবে নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহর অনুগত কিংবা অবাধ্য তথা বিশ্বাস যাই হোক না কেন, সমগ্র মানবজাতিই আদমের সন্তান। এই কথাগুলো বিবেচনায় রেখে কোরআনের বক্তব্যের আলোকে এখানে কিছু মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

১। মানবিক মর্যাদার সার্বজনীনতা

এই মূল্যবোধগুলোর প্রথমটি হলো মানবিক মর্যাদার সার্বজনীনতা। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

> নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।
> [সূরা বনী ইসরাইল: ৭০]

এর অর্থ দাঁড়ায়, মুসলিম-অমুসলিম যে কাউকে ভীতি প্রদর্শন বা অপদস্ত করা কিংবা কোনো ধরনের অমানবিক আচরণ করা নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এ ধরনের কাজ কোনো ঈমানদার ব্যক্তির আচরণ হতে পারে না। কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই যারা এসব করে, তারা আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। যে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, পরবর্তী কোনো এক সময়ে সে ঈমানদার হতেও তো পারে! কেউ কোনো অন্যায় করে থাকলে উপযুক্ত শাস্তি তার প্রাপ্য, কিন্তু কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানবিক মর্যাদার অবনমন করা যাবে না।

২। মানব জীবনের অলঙ্ঘনীয়তা (Sanctity)

মানব জীবনের গুরুত্ব নিয়ে কোরআনে একাধিক আয়াত রয়েছে। এ আয়াতগুলো শুধু মুসলমান নয়, সবার জন্যই প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের মূল্য ও এর পবিত্রতা রয়েছে। একে সম্মান করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে সূরা মায়েদার একটা আয়াতের কথা বলা যায়। কোরআনের এই আয়াতের শিক্ষা পূর্ববর্তী ইসরাইলী নবীদের কাছেও নাযিল হয়েছিল। কোরআন বলছে,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

> এ কারণেই বনী ইসরাঈলের জন্য আমি যে বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছি তা হলো, কেউ যদি কোনো মানুষ হত্যার প্রতিশোধ ছাড়া কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করলো। আবার কেউ যদি কারো জীবন রক্ষা করে সে যেন সব মানুষেরই জীবন রক্ষা করলো। আমার রাসূলগণ তো তাদের

> কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলো। তারপরও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে চলেছে।
>
> [সূরা মায়েদা: ৩২]

এই প্রসঙ্গে এর পূর্বের কয়েকটি আয়াতে আদমের (আ.) দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের কথা বলা হয়েছে।[১] এই দুই ভাইয়ের মধ্যকার রক্তপাতের ঘটনাই হলো পৃথিবীর প্রথম নরহত্যার ঘটনা। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজো একইভাবে মুসলমানরা পরস্পরকে হত্যা করছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুতির ফলেই এমনটা ঘটছে। কিসাসের বিধান অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত নয়, এমন কাউকে কেউ হত্যা করলে হত্যাকারীকে অবশ্যই পূর্বপরিকল্পিত হত্যার দায়ে শাস্তি পেতে হবে। নিহত ব্যক্তিটি মুসলিম কিংবা অমুসলিম যে-ই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। কোরআনের বিধান মতে, নিহতের অভিভাবকরা চাইলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এর ফলে সে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তারা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন কিংবা নাও নিতে পারেন।

কিসাসের বিধানটি ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। আধুনিক পশ্চিমা আইনেও এর ছাপ পাওয়া যায়। কোনো অপরাধী যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাকে একটা সুযোগ দেয়ার বিধান এসব আইনেও রয়েছে।

---

[১] "ওদেরকে আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিল) ঘটনা ঠিকঠিকভাবে শুনিয়ে দাও। যখন তারা (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) একটি করে কুরবানী করেছিলো। তাদের একজনের কুরবানী কবুল হলো, অন্যজনের হলো না। তখন দ্বিতীয়জন (প্রথমজনকে) বললো, 'আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।' প্রথমজন বললো, 'আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন।'

'তুমি আমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠালেও আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠাবো না। আমি বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি।'

'আমি চাই, আমার ও তোমার পাপের ভার তুমি একাই বহন করে জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর সেটাই জালেমদের শাস্তি।'

অবশেষে প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা ভাইকে মেরে ফেলা তার জন্য সহজ করে দিলো এবং তাকে হত্যা করে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। হত্যাকারী তার ভাইয়ের মৃতদেহ কীভাবে লুকাবে তাকে তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য কাকটি মাটি খুঁড়তে লাগলো। এটা দেখে সে বলল, 'হায়রে! আমি কি আমার ভাইয়ের মৃতদেহটি লুকাতে এই কাকটির মতোও বুদ্ধি খাটাতে পারলাম না?' এরপর নিজের কৃতকর্মের জন্য সে অনুতপ্ত হলো।" (সূরা মায়েদা: ২৭-৩১)

অন্যদিকে, স্বৈরশাসকরা তাদের নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী রাজনৈতিক দলকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'ফাসাদ'[১] শব্দটির মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। বিরোধীদের প্রতিবাদ দেখলেই তারা বলে ওঠে, এই তো তারা ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) করছে। আসলে এ ধরনের ব্যাখ্যা কোরআনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। অথচ ফাসাদপূর্ণ কাজ কোনগুলো, তা কোরআনে স্পষ্টভাবেই বলা আছে। এসব কাজ 'হিরাবা'[২] হিসেবে গণ্য। যেমন: সন্ত্রাসী কার্যক্রম, ডাকাতি, মানুষ খুন ইত্যাদি। অপরাধের মাত্রা অনুসারে এসব অপরাধীকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিদানের কথা বলা আছে।

যারা শান্তিপূর্ণভাবে ভিন্নমত প্রকাশ করে, জালিম শাসককে জালিম হিসেবে অভিহিত করে, ন্যায়বিচারের আহ্বান জানায়; তাদেরকে হয়রানী বা নির্মূল করার জন্য 'ফাসাদ' শব্দের অপব্যবহার একটা বিকৃতি মাত্র। এসব 'ভিন্ন মতাবলম্বীদের' মধ্যে কেউ নিহত হলে তারা শ্রেষ্ঠ শহীদদের একজন হিসেবেই গণ্য হবেন। যেহেতু মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হচ্ছেন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা এবং সেই ব্যক্তি যে জালিম শাসকের মুখোমুখি হয়।" এ ধরনের ব্যক্তি ট্যাংক, মিসাইল বা কোনো প্রকার অস্ত্র নিয়ে নয়, বরং নিরস্ত্র অবস্থায় শাসকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোরআন-হাদীস অনুযায়ী তার কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয়— সেই সত্য কথাগুলো বলে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের শাসকেরা একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে। এমনকি এসব শাসকের বিরুদ্ধে কেউ একটা আর্টিকেল লিখলেও তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়।

বর্তমানে ইসলামের নামে মুসলিম ও অমুসলিমদের সাথে যেসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে চলছে, তা বুঝতে হলে এ ব্যাপারগুলো মনে রাখা খুবই জরুরি। মুসলিম নামের জুলুমবাজরা হাজার হাজার নিরপরাধ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে মোটেও দ্বিধা করছে না। তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে, জেলে আটক রাখা হচ্ছে। এভাবে তাদের ও তাদের প্রিয়জনদের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।

৩। মানুষের সমতা

তৃতীয় মূল্যবোধটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নিকট সকল মানুষ সমান। যদিও

---

[১] 'ফাসাদ'-এর শাব্দিক অর্থ বিশৃঙ্খলা বা অনর্থ সৃষ্টি করা। কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এটি 'ফ্যাসাদ' হিসেবে চালু রয়েছে। — অনুবাদ সম্পাদক

[২] 'হিরাবা' হলো ইসলামী দণ্ডবিধি। প্রকাশ্য ডাকাতি, খুন, সশস্ত্রপন্থায় জোরপূর্বক সম্পত্তি দখল, সরকারী সুযোগ-সুবিধা ধ্বংস করা ইত্যাদি অপরাধ এর আওতাভুক্ত। — অনুবাদ সম্পাদক

পরকালে ঈমানদার ও অন্যান্যদের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে। অবিশ্বাসীদের জন্য পরকালে কী পরিণতি রয়েছে, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তা স্পষ্ট। কিন্তু আমরা মানুষকে বিচার করার কেউ নই। কেন তারা এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করছে? কারণ, সমতা শুধু মুসলমান কিংবা বিশ্বাসীদের জন্য নয়, সকলের জন্য। মানুষ যে সৃষ্টির সেরা জীব, তা শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে সম্বোধন করে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহান নাস (হে মানুষ সকল!)। এখানে কি শুধু মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে? না। বরং ইসলামী বিশ্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে 'আন নাস' তথা সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

> হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।
>
> [সূরা হুজরাত: ১৩]

এ আয়াতের বক্তব্য অত্যন্ত পরিস্কার। যারা প্রচুর অর্থ, অস্ত্র, ক্ষমতা, কৌশল ইত্যাদির অধিকারী হয়ে অহংকারী বা উদ্ধত হয়ে পড়ে এবং এগুলোর অপব্যবহার করে, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সকল মানুষের সমতার নীতিকে অমান্য করে; তখন তারা আসলে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন, "অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়।"

এ থেকে বুঝা যায়, কোরআন ও হাদীসের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। যারা নিজেদেরকে 'আহলে কোরআন' তথা 'কোরআনের অনুসারী' বলে দাবি করে কিন্তু হাদীসকে অস্বীকার করে, তারা কখনোই 'আহলে কোরআন' হতে পারে না। কারণ, স্বয়ং কোরআনেই সুন্নাহকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

> আর যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিরোধ লেগে যায় তাহলে

তা মীমাংসার ভার আল্লাহর ও রাসূলের উপর ছেড়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

[সূরা নিসা: ৫৯]

এ বিষয়ে আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে। কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত বক্তব্যকে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা খুবই ভয়ংকর। এর ফলে ইসলামের কোনো না কোনো মূলনীতি লঙ্ঘিত হয়ে যেতে পারে।

৪। ধর্মীয় স্বাধীনতা

যদিও এটি সরাসরি আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল বলে কোরআনে বলা হয়েছে, তথাপি মানুষকে পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম বা দর্শন বাছাই করার অধিকার দেয়া হয়েছে। আমরা জুমার দিনে যে সূরাটি সচরাচর পাঠ করি, সেই সূরা কাহাফে আল্লাহ বলেছেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।

[সূরা কাহাফ: ২৯]

অর্থাৎ কেউ চাইলে আল্লাহর সত্য বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, আবার তা অমান্যও করতে পারে। কোনো ক্ষেত্রেই জবরদস্তি করা যাবে না। ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিবে। তবে সত্য অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে। এসব ব্যাপারে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। অতএব, যে তাগুতকে অমান্য করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, যে দৃঢ়তম রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো, যা কখনও ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।

[সূরা বাকারা: ২৫৬]

এটি কোরআনের একটি মুহকাম তথা সুস্পষ্ট আয়াত। তাই এর ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। এটি কোরআনের একটি সার্বজনীন ধারণা। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মহানবীকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

> যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (জেনে রাখো) আমি তোমাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কর্তব্য কেবল প্রচার করে যাওয়া।
> [সূরা আশ-শুরা: ৪৮]

এর মানে হচ্ছে, কেউ ইসলাম তথা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও তাদেরকে কেউ আসামী সাব্যস্ত করতে পারে না। স্বয়ং নবীর (সা.) ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য! তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? ইসলাম সম্পর্কে যে কিছুই জানে না অথবা ইসলাম সম্পর্কে যার সঠিক বুঝজ্ঞান নেই, তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা বা হত্যা করার কোনো সুযোগ কি কারো আছে? অবশ্যই না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে-আপনাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাননি। তিনি কোরআনে কী বলেছেন দেখুন:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ- لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

> অতএব, (হে নবী!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তো তাদের জিম্মাদার নন।
> [সূরা গাশিয়াহ: ২১-২২]

কোরআনে এ রকম অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যেখানে মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে। কারো বিশ্বাসকে ভুল মনে করলেও আপনি নিজেই তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারেন না, এটা আপনার দায়িত্ব নয়। বরং তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আপনাকে কোরআনের নির্দেশনাই মেনে চলতে হবে। শুধু অন্য ধর্মে বিশ্বাস করাই নয়, বরং সেই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালনের অধিকারকেও কোরআন সম্মান করে; যতক্ষণ পর্যন্ত তা অন্যের অধিকার লঙ্ঘন না করে। কোরআনে বলা হয়েছে,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

> আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে শায়েস্তা না

করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে মঠ, চার্চ, সিনাগগ ও মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো; যেখানে বেশি বেশি পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়।

[সূরা হজ্ব: ৪০]

এই আয়াতের শিক্ষা হলো, কোনো ধরনের ধর্মীয় নিপীড়ন চালানো নিকৃষ্ট কাজ। মুসলমান হোক কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী হোক, প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। এটি মানুষের শুদ্ধ আত্মপরিচয়কে নির্ণয় করে। সে কারণে এই আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ যদি অত্যাচারীদেরকে দমন না করতেন, তাহলে যেসব উপসনালয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় সেগুলো ধ্বংস হয়ে যেত।

এখন দেখুন, বর্তমানে কী ঘটছে। কিছু কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি এমনকি ভিন্ন মতাবলম্বীদের মসজিদগুলোতে পর্যন্ত বোমা মারছে। এসব কর্মকাণ্ড আল্লাহ সমর্থন করেন না, এমনকি অন্য ধর্মের উপসনালয় ধ্বংসের ব্যাপার হলেও। এ কারণে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের ইতিহাস হচ্ছে উপাসনালয়গুলোর পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করার ইতিহাস। এমনকি ইবাদতের ধরনের পার্থক্য কিংবা ভিন্ন কোনো ধর্মের উপাসনালয়ের ক্ষেত্রেও তারা নিরাপত্তা দিয়েছেন।

৫। ধর্মীয় ভিন্নতার বাস্তবতা

ধর্মীয় ভিন্নতার বাস্তবতাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তারমানে সব ধর্ম একই রকমের নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, লোকজন নানা ধর্মে বিভক্ত। এই পরিস্থিতিতে আপনি দাওয়াতী কাজ করতে পারেন, তথ্য আদান-প্রদান করতে পারেন। কিন্তু কেউ এ কথা বলতে পারে না, 'আমি আমার মর্জি মতো সমাজকে পরিশুদ্ধ করবো।' কেউ কেউ এ ধরনের কাজের দলীল হিসেবে কোরআনের নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّـهِ

ফেতনা-ফাসাদ দূর হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো।

[সূরা বাকারা: ১৯৩]

কিংবা,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّـهِ

> আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফেতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।
>
> [সূরা আনফাল: ৩৯]

তারা বলতে চান, এসব আয়াতে অন্যদের অধিকার হরণের কথা বলা হয়েছে। এটাই বাস্তবতা। তাই আমাদের অন্য কিছু করার নেই।

অথচ, এ ধরনের ব্যাখ্যার বিপরীতে কোরআনে অন্তত দুটি আয়াত রয়েছে:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

> তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি সব মানুষকে অবশ্যই এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তাতেও তারা মতভেদ করতেই থাকবে।
>
> [সূরা হুদ: ১১৮]

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

> আর তোমার প্রভু যদি চাইতেন তাহলে তো পৃথিবীর সবাই একসাথেই ঈমান আনতো। এখন, তুমি কি ঈমান আনার জন্য মানুষকে জবরদস্তি করবে?
>
> [সূরা ইউনুস: ৯৯]

এটা ঠিক, আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম হচ্ছে সত্য ধর্ম। এটাই ছিল মহানবীর (সা.) দাওয়াতের মূলকথা। এটিই শুদ্ধ ধর্ম, যেটি সুসংরক্ষিত এবং ক্রমাগতভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে। কিন্তু তারমানে এই নয় যে পৃথিবীতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোনো স্থান নেই। আল্লাহর ইচ্ছার ফলেই ধর্মের এই বৈচিত্র্যতা বিদ্যমান। অন্যদের দায়দায়িত্ব একান্তই তাদের ব্যক্তিগত। আমাদের কর্তব্য হলো, সবার সাথে ন্যায্য আচরণ করা।

৬। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

অন্য ধর্মাবলম্বীদের জীবনযাপন বা উপাসনা কিংবা মুসলিম কর্তৃত্বের অধীন উপাসনালয় রক্ষা করার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেই মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে মহান বক্তব্য

ইসলামের রয়েছে, তাও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ব্যাপারে কোরআনে কমপক্ষে দুটি আয়াত রয়েছে। সূরা নিসার প্রথম দিকে এ সংক্রান্ত একটি আয়াত রয়েছে, যা বিয়ের অনুষ্ঠানেও সাধারণত পাঠ করা হয়। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

> হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত নারী-পুরুষ। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাকো এবং রক্তের সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।

[সূরা নিসা: ১]

এখানে ‘ইয়া আইয়ুহান নাস’ তথা ‘হে মানবজাতি’ সম্বোধন করার মাধ্যমে শুধু মুসলমানদেরকেই আহ্বান করা হচ্ছে না, বরং সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বক্তব্য দিচ্ছেন। বক্তব্যের শুরুতেই সমগ্র মানবজাতিকে বলা হচ্ছে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ শুধু মুসলমানদের বলা হচ্ছে না যে— যাও, লোকদের বলো, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে। এমনকি ইসলামের কাছাকাছি কোনো ধর্মের (যেমন: ইহুদী ধর্ম) কাউকেও বিশেষভাবে বলা হচ্ছে না। আবার এই বক্তব্যকে মানবজাতির প্রতি এক ধরনের হুমকি হিসেবেও বিবেচনা করার সুযোগ নেই। কারণ, যিনি সবচেয়ে বড় মুত্তাকী সেই মুহাম্মদকেও (সা.) কোরআনে তাকওয়া অর্জন করার জন্য বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

> হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন।

[সূরা আহযাব: ১]

এই আয়াত আমাদেরকে বিনয়ী হতে শিক্ষা দেয়। স্বয়ং নবী (সা.), যিনি শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী, তাঁকেও যদি এ ব্যাপারে কোরআনে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়; তাহলে

“তোমরা ভয় করো তোমাদের পালনকর্তাকে, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন...” এই আহ্বানে আমাদের বিব্রত হওয়ার কী আছে!

এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আরেকটি আয়াত রয়েছে, যা একটু আগেও আমি বলেছি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ-

> হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।
>
> [সূরা হুজরাত: ১৩]

আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ভাগ করেছেন। এর কারণ কী হতে পারে? কোনো জাতি বা গোত্র নিজেদেরকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করার জন্য? নাকি, অন্যদের উপর নিজেদের অন্যায় শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য? এর কোনোটার জন্যই আল্লাহ এটি করেননি। আসলে এই বিভাজন না হলে আমরা অন্যকে চিনতাম না, আমাদেরকেও অন্যরা চিনত না। একে অপরকে চেনা তথা পারস্পরিক স্বীকৃতির জন্য আল্লাহ এটি করেছেন। এবং তিনি বলে দিয়েছেন, আল্লাহভীতির উপরই নির্ভর করবে মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব।

আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, কোরআনের এই আয়াতে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য ধর্ম ও মতাদর্শের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থেকে অতি সংক্ষেপে যে চমৎকার বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা অন্য কোনো ধর্ম বা দর্শন দিতে পারেনি।

উপরোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করার সময় আমি এমন একটি ফুলের তোড়ার কথা কল্পনা করি, যার ফুলগুলো লাল, সাদা, গোলাপীসহ বিভিন্ন রঙের। এককভাবে প্রত্যেকটি ফুলই সুন্দর, কিন্তু সবগুলো ফুল মিলে তৈরি হওয়া তোড়াটির সৌন্দর্যই বেশি। বহু রঙের বৈচিত্র্য থাকায় এতে বিরক্তি আসে না। ঠিক এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মানুষ, ফুল, পশুপাখিসহ যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যেও বৈচিত্র্যতা দিয়েছেন। এমনকি কোরআনে ভিন্ন ভিন্ন রঙের পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে,

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ— সাদা, লাল ও নিকষ কালো।

[সূরা ফাতির: ২৭]

৭। ন্যায়বিচার

শুধু মুসলমানদের সাথেই নয়, সকলের সাথেই ন্যায়বিচার করতে হবে। এ ব্যাপারে কোরআনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত রয়েছে। প্রথমটিতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّـهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য প্রদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। তাদের কেউ যদি ধনী বা দরিদ্র হয়, তবুও তাদের ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আল্লাহই অধিক শুভাকাঙ্খী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত।

[সূরা নিসা: ১৩৫]

যা সত্য, বিচার করতে গিয়ে তার পক্ষেই থাকতে হবে। কার ব্যাকগ্রাউন্ড কী, কে কোন ধর্মের অনুসারী— বিচারের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো কিছুকে বিবেচনায় নেয়া যাবে না। এ সংক্রান্ত অপর আয়াতটি আরো চমৎকার। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ভিত্তিক সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে তাদের ব্যাপারে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো, এটাই

> খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।
>
> [সূরা মায়েদা: ৮]

এ রকম অসাধারণ বক্তব্য দুনিয়ার আর কোথায় আছে? লোকজন তো বরং বলে থাকে— শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, যত পারো হত্যা করো, ভূলুণ্ঠিত করে দাও। যদিও কোরআনে কোনো কোনো সময় ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একইসাথে মীমাংসার দরজা খোলা রাখার কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> এটা অসম্ভব কিছু নয়, আল্লাহ তোমাদের এবং যাদের সাথে আজ তোমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মাঝে একদিন সুসম্পর্ক তৈরি করে দেবেন; আল্লাহ তো সবই করতে পারেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
>
> [সূরা মুমতাহিনা: ৭]

এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তোমরা যারা এখন পরস্পরের শত্রু, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ মুওয়াদ্দাহ তথা গভীর আন্তরিকতার সম্পর্ক তৈরি করে দিবেন। এটা নিছক ভালোবাসা নয়, তার থেকেও বেশি কিছু। আমাদের প্রিয় নবীর (সা.) জীবনে এ রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে। তিনি তায়েফবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আঘাতের জবাবে তাদেরকে মমতায় সিক্ত করেছেন। মৃত্যুদণ্ড যাদের প্রাপ্য ছিল, মক্কা বিজয়ের শুরুতেই তাদের ব্যাপারে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। এ রকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

আসল কথা হচ্ছে, ন্যায়বিচার করতে হবে। অর্থাৎ কোনো সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, শত্রুর সাথেও অবিচার না করা; এমনকি আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেও তা করা যাবে না। কেউ যদি এমন কোনো কাজের পক্ষে সাফাই গায়, যা কোরআন-হাদীসের শিক্ষার পরিপন্থী; তাহলে সে স্পষ্টত পথভ্রষ্ট।

৮। মধ্যপন্থা।

কোরআনে আমাদেরকে ‘গুলু’ তথা বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এটা উগ্রপন্থার পরিচায়ক। কোরআনে একে চরম মন্দ কাজ হিসেবে বিবেচনা করে বলা হয়েছে,

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।

[সূরা নিসা: ১৭১, সূরা মায়েদা: ৭৭]

এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ ব্যাপারে বর্ণিত একটি হাদীসে স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিবর্তে সদাসর্বদা ইবাদতে নিয়োজিত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনই ইবাদতে পরিণত হতে পারে, যদি কারো সৎ নিয়ত থাকে এবং আল্লাহ নির্দেশিত পথে চলে।

কোরআনে 'ওয়াসাতিয়া' তথা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ওয়াসাতিয়ার মানে ইসলাম অনুসরণের ব্যাপারে গাফলতি নয়। যদিও কেউ কেউ ভুলবশত এমনটা মনে করতে পারে। কেবলা সংক্রান্ত সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাহ করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবজাতির জন্য এবং রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।

[সূরা বাকারা: ১৪৩]

আমারদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাহ হিসেবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। এই আয়াতে বর্ণিত 'ওয়াসাতান' শব্দের অর্থ হচ্ছে— যথাযথ ভারসাম্যপূর্ণতা, বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শনের মাঝামাঝি অবস্থান, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ইত্যাদি। নিছক রাজনৈতিক অর্থে মধ্যপন্থা নয়, বরং ওয়াসাতিয়ার আলোকে মধ্যপন্থা। এর পেছনে যথার্থ কারণ রয়েছে। তাহলো আমরা যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াই, যেভাবে মহানবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট সাক্ষ্য হিসেবে প্রেরিত। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার।

৯। রহমত

নবম মূল্যবোধটি হচ্ছে রহমত তথা সকলের প্রতি দয়া করা। আমরা জানি, এটি আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির মধ্যে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি গুণ। আমরা ভালো

করে কোরআন পড়লে দেখতে পাবো, রহমত এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য শব্দ কোরআনে রয়েছে। এগুলোই হচ্ছে মহানবীর (সা.) দাওয়াতের মূলকথা। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।
[সূরা আম্বিয়া: ১০৭]

এই আয়াতে 'আলম' (বিশ্ব) শব্দের বহুবচন 'আলামীন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে জগৎ সম্পর্কে মানুষের যে গতানুগতিক ধারণা, শুধু সেগুলোই নয়; বরং মনুষ্য জগৎ, জ্বীনদের জগৎ (কারণ, তাদের কেউ কেউ কোরআন শোনার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলো), প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, পরিবেশ জগৎসহ সবার জন্যই রাসূল (সা.) রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

তাহলে স্রেফ ভিন্নমত পোষণ করার কারণে যখন মানুষকে নির্যাতন করা হয়, শিরচ্ছেদ বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়, তখন রহমতের কার্যকারিতার কী হবে? এটা খুবই গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ বিষয়টি হচ্ছে মুসলমানদের সাথে অন্যান্য কমিউনিটির সম্পর্কের মূলভিত্তি। এটা শুধু শান্তির সময়ে নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে এখন শুধু এটুকু বলে রাখি, কিছু লোক কোরআনের এ সংক্রান্ত কোনো কোনো আয়াতের অপব্যাখ্যা করে। তারা এসব আয়াতের ঐতিহাসিক এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনা না জেনে বা এ সম্পর্কে ভুল বুঝে জঘন্য সব কাজ করে বেড়ায়। তারা কোরআন থেকে নিজেদের সুবিধা মতো কিছু আয়াত বাছাই করে (cherry picking) সেগুলোর অপব্যবহার করে।

১০। সহাবস্থান ও সদাচরণ

কেউ মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চাইলে সেক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, আমাদেরকে যথোচিত ভূমিকা পালন করতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

> যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ কখনো নিষেধ করেন না; অবশ্যই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।
>
> [সূরা মুমতাহিনা: ৮]

যুদ্ধ না করা এবং বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে না দেয়া— এটুকু কি খুব বেশি চাওয়া? এটা কি মুসলমানদের অবাস্তব কোনো চাহিদা? এটা কি প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য অধিকার নয়? এটা খুবই সহজ একটি দাবি যা সবার জন্যই জরুরি। তাহলে এ চাহিদাটুকু পূরণ হলে মুসলমানরা অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে? অবশ্যই 'সদাচারণ ও ন্যায্য আচরণ' করবে। উপরোক্ত আয়াতে এ সংক্রান্ত শব্দটি হলো 'তাবাররুহুম', যা সদাচরণ বা সহৃদয়তা থেকেও বেশি কিছু বুঝায়। এটা অনেকটা মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্কের মতোই সহৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক, যেখানে আছে সদাচারণ, সম্মান ও ভালোবাসা। এমনকি মা-বাবা অমুসলিম হলেও তাদেরকে ভালোবাসতে হবে। কারণ, মানুষ হিসেবে মা-বাবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকার সহজাত ব্যাপার থেকেই তাদেরকে আমরা ভালোবাসি। যদিও আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের হিসাব নিবেন।

তাই আমাদের উচিত 'কিস্ত' তথা ন্যায়বিচার করা। কোনো কোনো আলেমের মতে, 'কিস্ত' হচ্ছে 'আদল' বা ন্যায়বিচারের চেয়েও বেশি কিছু। 'আদল' হচ্ছে কাউকে তার প্রাপ্য যতটকু, ঠিক ততটুকু প্রদান করা; কমও নয়, বেশিও নয়। কিন্তু 'কিস্ত' হচ্ছে প্রাপ্যের চেয়েও বেশি কিছু দেয়া। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অমুসলিম প্রতিবেশীকে উপহার প্রদান করা। আলেমদের কারো কারো মতে, অমুসলিমদের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানানোও এর মধ্যে পড়ে। যেমন: ইস্টার সানডেতে শুভেচ্ছা জানানো। তবে শুভেচ্ছা জানানোর ক্ষেত্রে আমি নিরপেক্ষ কোনো শব্দ ব্যবহার করার পক্ষে। যেমন: হ্যাপি হলিডে। কারণ, হলি শব্দটি এখন আর পবিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এটা এখন অনেকটাই বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছে। কারো কারো মতে, এতে কোনো সমস্যা নেই। তাই বলে বিধর্মীদের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাসই সঠিক, এমনটি মনে করার অবকাশ নেই। এই ইস্যুতে পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকেই যথেষ্ট যুক্তি দিয়েছেন।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা যা জানলাম, ইসলামের এই বুঝজ্ঞান ও মূল্যবোধ বিবেচনায় রেখে বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? আমরা দেখি, কিছু ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের একটা ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে। তারা দাবি করে, কোরআন-সুন্নাহর আলোকেই তারা এসব করছে। অথচ এতক্ষণ আমি যা বলেছি, তা কোরআন-সুন্নাহর

আলোকেই বলেছি। এগুলো তারা ভুল প্রমাণ করুক। তারা প্রমাণ করুক যে আমি কোরআনের যেসব আয়াত উল্লেখ করেছি, সেগুলো আল্লাহর কথা নয়, কোরআনের কোনো সূরার আয়াত নয়!

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন। আমরা যেন অন্যান্য কমিউনিটির লোকজনসহ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারি, মহান আল্লাহ আমাদেরকে সে তওফিক দান করুন। আমীন।

আমাদের করণীয়

আয়োজক ভাইদের পক্ষ থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, আমি যেন বর্তমান সময়ে মুসলমানদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় তিনটি কাজের কথা বলি। আমি খুব সংক্ষেপে এ ব্যাপারে আমার ক্ষুদ্র মতামত ব্যক্তি করছি।

১। ঈমানকে শক্তিশালী করা

আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। কারণ, অন্তর থেকে অনুভব না করলে নিছক ইবাদত আমাদেরকে পরিবর্তন করতে পারবে না এবং আমরা আল্লাহর নৈকট্যও লাভ করতে পারবো না। অর্থাৎ, এই ইবাদত আমাদের কাজে আসবে না। হ্যাঁ, ইবাদত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু তা ঈমানের ভিত্তিতে হতে হবে। তাই প্রথমে আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। তাহলে আমরা যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবো।

২। ইসলামের সঠিক বুঝজ্ঞান অর্জন করা

আল্লাহ কোরআনে যা বলেছেন ঠিক সেভাবে অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভারসাম্যতা সহকারে ইসলামের সঠিক বুঝজ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে। কট্টরপন্থী হওয়া যাবে না। মধ্যপন্থা সংক্রান্ত ইসলামের ধারণাকে নিছক রাজনৈতিক অর্থে না নিয়ে যথার্থ অর্থে একে গ্রহণ করতে হবে। আমরা জানি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে উদ্ভূত খারেজি সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত ধর্মভীরু। নামায, রোযাসহ যে কোনো ইবাদতে অত্যন্ত তৎপর থাকা সত্ত্বেও ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে তারা গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, তীর যেমন ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়, তারাও তেমনি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। তাদের কাজকর্ম পুরোপুরি ইসলাম পরিপন্থী। যেসব মুসলমান খারেজিদের মনগড়া ব্যাখ্যা গ্রহণে অস্বীকার করতো, তাদের হত্যা করা খারেজিরা বৈধ মনে করতো।

৩। জ্ঞানকে বাস্তবে কাজে লাগানো

ঈমান এবং এর সঠিক বুঝজ্ঞানকে শুধু কেতাবী বিদ্যা মনে করা যাবে না। বরং এসবকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি অমুসলিম প্রতিবেশীদের সাথে অত্যন্ত সদয় আচরণ করতেন। অথচ এদের কেউ কেউ তাঁর বাড়ির সামনে ময়লা-আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলত। প্রতিবেশী মুসলিম নাকি অমুসলিম, সে প্রশ্ন না তুলে তাদের প্রতি সদয় হওয়ার ব্যাপারে কোরআনেও বলা হয়েছে।

আমরা যেন ইসলামের উত্তম আদর্শ হতে পারি, অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যেন উত্তম আদর্শ হতে পারি; আল্লাহ আমাদেরক সেই তওফিক দান করুন। আমীন।

ইমাম শাফেয়ী এবং ভিন্নমতের স্পেইস তৈরি

আসিফ সিবগাত ভূঞা

ইসলামের ডিসকোর্সগুলোতে আমরা পরমতসহিষ্ণুতা খুঁজে পাই না। সাধারণত দুটি প্রান্তিক অবস্থান দেখা যায়। নিজের পক্ষের কেউ যদি অন্য পক্ষকে ভিত্তিহীন কটু মন্তব্য করে নাস্তানাবুদও করে, সেটাতে আমরা দোষ খুঁজে পাই না। এক্ষেত্রে যে বলছে তার কথায় যে ভালো যুক্তি নেই সেদিকে তো আমাদের খেয়াল থাকেই না, বরং যে কটু কথা ব্যবহার করা হয়েছে সেটাকেও বেশ বীরত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আবার অন্য পক্ষের কেউ যদি খুব যৌক্তিকভাবে আমাদের সমালোচনা করে (কিছুটা কড়া কথা ব্যবহার করে হলেও), সেক্ষেত্রেও আমরা সেই যুক্তিকে পরখ করতে উদগ্রীব নই এবং সামান্য যে তীর্যক কথা তার সমালোচনায় পাওয়া গেছে সেটাতে খুব ফোকাস করি। স্পষ্টতই এটি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।

এই সমস্যার মূলে রয়েছে আমাদের প্রেসক্রিপটিভভাবে ফতোয়া দিয়ে ইসলাম বোঝার সমস্যা। সাধারণ জীবনে আমাদের ফতোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, প্রতিটি ইস্যুতে চুলচেরা জ্ঞানগত বিশ্লেষণের ক্ষমতা বেশিরভাগ মানুষই রাখে না। আর ক্ষমতা থাকলেও সব বিষয়ে গবেষণা করার মতো সময় থাকে না, ইন্সট্যান্ট ডিসিশন নিতে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে ফতোয়ার প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করে না।

সমস্যাটা হচ্ছে যখন ফতোয়া একটি চলতি সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে ইসলামকে সম্যকভাবে বোঝার মাধ্যম হয়ে যায়। এটাকে আমরা ফতোয়া মেন্টালিটি বলতে পারি। ফতোয়া মেন্টালিটির চরিত্রটা হলো যখন একজন মুসলিম

মনে করা শুরু করে যে একজন ব্যক্তি বা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দেয়া ইস্যুভিত্তিক একক মতগুলোই সঠিক মত। তার ধারণা— একটি একধারার সূত্র রয়েছে যেখান থেকে বা যেখানে পুরো ইসলামটাকে সম্পূর্ণ সঠিক ফর্মে উদ্ধার করা যাবে। তাই সে এই একটি নির্দিষ্ট ধারার বা সূত্রের সকল আলেম, প্রকাশনী, ভিডিও চ্যানেলের মেটেরিয়াল ইত্যাদি অনুসরণ করতে থাকে। এটা করার মাধ্যমে সে গোটা ইসলামের শোচনীয় রকম স্বল্প জিনিসই পায়। কিন্তু সে মনে করতে থাকে— তার সম্যক গবেষণা না থাকলেও এই যে একটি বিশ্বস্ত সূত্র সে পেয়ে গেছে, এটা দিয়েই গোটা ইসলামটা ধরে ফেলা যাচ্ছে। তার জানাটা শুধু সঠিকই নয়, সেটা সম্পূর্ণও বটে। শুধু সঠিক ইসলামই জানা আছে তাই নয়, মোটামুটি পুরো ইসলামটাই তার জানা। ইসলামের মূল কাঠামো তার আয়ত্তে। যদি অল্প কিছু বাদ থেকেও থাকে, ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অথচ একটি নির্দিষ্ট সূত্র বা ধারা — যার উপর তার আস্থা রয়েছে — সেখান থেকে ইসলাম পালনের জন্য তার যে প্রশ্নগুলো, সেগুলোর উত্তর জানতে কোনও সমস্যা ছিলো না। সেটা করাটাই লজিক্যাল। অধিকাংশ মানুষ তাই করবে। মূল সমস্যা এটা নয় যে আমরা সবার মতামত জেনে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে আসছি না, কারণ সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যাটা হলো— আমি যে আলেমের মত শুনছি, যে বই পড়ছি, যে ভিডিও লেকচার দেখছি; সেটা যে কেবল একজন বক্তা বা লেখক বা নিদেনপক্ষে একটি নির্দিষ্ট ঘরানা বা স্কুলের চিন্তা, তা যখন আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি না। সময় ও গবেষণাশক্তির ঘাটতির কারণে আমি সেটাকে অনুসরণ করতে পারি বটে, কিন্তু একইসাথে আমার মনে চেতনা কাজ করা দরকার যে আমার এই জানা কতটা সংকীর্ণ, সীমিত ও একপেশে। অন্য কোনো ঘরানার অনুসারীর জানাটা ঠিক হবার সম্ভাবনা যতটুকু, আমার জানাবুঝা ঠিক হবার সম্ভাবনা ততটুকুই। অথচ, বহু ঘরানার মাঝে মাত্র একটি ঘরানাকে আমি অনুসরণ করছি— এই কনশাসনেস আমার মাঝে থাকলেও আমি কেবল নিজেকেই ঠিক মনে করি। কারণ, আমার বদ্ধমূল ধারণা, আমি ও আমার বন্ধুরাই সঠিক ঘরানাকে বেছে নিতে পেরেছি।

ফলে একজন সালাফি/আহলে হাদীস মনে করছে, সে যেভাবে ইসলাম ফলো করছে সেটাই একেবারে কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হচ্ছে। যদিও সে নিজে খুব অল্পই কোরআন-হাদীস পড়েছে, এর ব্যাখ্যাও তার অল্পই জানা, এবং সেটা আসছেও মূলত অন্য কাউকে অনুসরণ করার মাধ্যমেই। একজন মাযহাবি মনে

করছে, তার মাযহাব অনুসরণের মাধ্যমে গোটা ইসলাম পালন হয়ে যাচ্ছে, অন্য সকল মাযহাব তার মাযহাবের মতো পোক্ত নয়। একজন জামাতি মনে করছে, ইসলামের রাজনীতিকে সে সবচেয়ে ভালো ধারণ করছে। যদিও ইসলামের রাজনৈতিক আলোচনা তার খুব কমই জানা, এবং এ ব্যাপারে সে একটি নির্দিষ্ট স্কুলের মেটেরিয়ালই অনুসরণ করে। একজন তাবলীগী মনে করে, তার তাবলীগই হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের (সা.) তাবলীগের সবচেয়ে পিউর ফর্ম, যদিও তার সব জানাশোনা তার নিজের গ্রুপেই ঘুরপাক খায়।

অথচ একজন ব্যক্তির সালাফি, মাযহাবি, জামাতি, তাবলীগী বা সুফি হওয়াতে কোনও সমস্যা ছিলো না প্রথম বিচারে। যে আলেমের বা যে স্কুলের ব্যাখ্যায় আপনি আস্থা পেয়েছেন সেটা অনুযায়ী আপনি আপনার ধর্মকে এক্সিকিউট করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গোল বাঁধে তখনই, যখন আপনি আপনার দুর্বলতাকে আপনার শক্তি ভাবা শুরু করেন। আপনি কেবলই একজন সালাফি বা সুফি বা জামাতি বা তাবলীগী— এটা কিন্তু আপনার ব্যক্তিদুর্বলতার কারণেই। আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণেই কিন্তু আপনি যে কোনও ইসলামিক প্রশ্নে নিজে সিদ্ধান্ত তৈরি করতে পারেন না, ফলে আপনি একটি গোষ্ঠীকে অনুসরণ করেন। এমনকি কাকে অনুসরণ করবেন, সেটাও কিন্তু ঠিক হয় আপনারই সিদ্ধান্তে; সেই আপনি, যার জ্ঞান ও বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই অনুসরণ করার পথে আপনি অদ্ভুতভাবে নিজের কোনও ঐশী শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে পান! যার কারণে আপনার মনে হতে থাকে যে কাকে অনুসরণ করবেন সে ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত নেয়া একেবারে ওহী নাযিল হওয়ার মতো ব্যাপার! একবার যখন সঠিক মুরশিদ আপনি বেছে নিয়েছেন, এখন মুরিদ হিসেবে আপনার আর চিন্তা নেই!

এই মনোভাব প্রকাশ পায় যখন আপনার জ্ঞান এত পরনির্ভরশীল হওয়ার পরও সেই জ্ঞান দিয়েই আপনি অন্য পরনির্ভরশীল কারও 'ভুল' — অর্থাৎ যেটা আপনার চোখে ভুল — সেটাকে দ্ব্যর্থবোধকভাবে ভুল প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন। যদিও আপনার নিজের অনুসৃত মতটাও যে ভুল হতে পারে সে চেতনা আপনার কাজ করে না। শুধু তাই নয়, আপনার নিজের মত ভুল হলে সেটা বোঝার ক্ষমতাই আপনার নাই।

এই সমস্যা তৈরির পেছনে অনুসারীরা যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী যাদের অনুসরণ করা হচ্ছে তারাও। যেসব আলেম বা ইসলামিক চিন্তাবিদদের মানুষ অনুসরণ করছে, তারা কিন্তু অন্তত জানেন— বেশিরভাগ ইস্যুতেই ইসলামের মতগুলো এত

সোজাসাপ্টা নয়। তারা নিজেরা গবেষণা করে একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন বটে, কিন্তু একই রকম তুমুল গবেষণা করেও আরেকজন সমমানের মেধাবী চিন্তাবিদ আরেকটি বিপরীত সিদ্ধান্তে এসেছেন। কিন্তু আমাদের সময়ে খুব কম আলেম বা স্কলারকেই আপনি অন্যের মতকে স্পেইস দিতে দেখবেন।

স্পেইস দেয়ার অর্থ এই নয় যে আপনি আপনার নিজের মত থেকে সরে আসবেন। আপনি যখন একবার গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্তে এসেছেন, সেটাতে কেবল আরেকজন আরেকটি মত দিচ্ছে বলে আপনাকে নিজের মত ছাড়তে হবে তা নয়। কিন্তু নিজের মতকে ফার্মলি জানানোর পাশাপাশি অন্যের মত দেয়ার অধিকার ও সেটাও যে সঠিক হবার একই অধিকার রাখে, এই ব্যাপারটা মাথায় রাখা এবং মানুষের কাছে তা স্পষ্ট করে দেয়াটাই হলো স্পেইস দেয়া।

এখনকার অনেক স্কলারের এরকম রেটোরিক্যাল 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' টাইপের মনোভাব দেখে মনে হতে পারে— আলেমরা বুঝি সবসময় এরকম যুদ্ধংদেহী ছিলেন, নিজের মতকেই শুধু ঠিক মনে করতেন, অন্যদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেন, নিজের ফতোয়ার বিপরীতে যাওয়া অন্যান্যরা কত অসৎ, খারাপ, বিপথে যাওয়া — সেটা মনে করিয়ে দিতেন।

এই উদ্দেশ্যে আমি ইমাম শাফেয়ীর একটি উপযুক্ত উক্তি উল্লেখ করছি এখানে। তিনি তাঁর 'আল-উম্ম' গ্রন্থে বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি মুতা[১] বিয়েকে বৈধ করে, বৈধ বলে ফতোয়া দেয় এবং নিজে মুতা বিয়ে করে, তার সাক্ষ্য দেয়ার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা যাবে না। একইভাবে যে ব্যক্তি নিজে সচ্ছল হয়েও কোনো ক্রীতদাসীকে বিয়ে করে ও সেই বিয়েকে বৈধ মনে করে, তার সাক্ষ্য দেয়ার অধিকারও কেড়ে নেয়া যাবে না। কেননা আমরা এমন মুফতি ও স্কলারদেরও পাই, যারা এসবকে হালাল করেছেন। একইভাবে হাতে হাতে এক দিনারের বদলে দুই দিনার বা এক দিরহামের বদলে দুই দিরহাম আদানপ্রদান করাকে যে হালাল মনে করে এবং এরকম লেনদেনে যুক্ত হয় (তার ব্যাপারেও

---

[১] মুতা বিয়ে হলো এক ধরনের ফিক্সড পিরিয়ড বিয়ে, যাতে বিয়েটি কতদিন ভ্যালিড থাকবে সে ব্যাপারে বিয়ের আকদে একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দেয়া হয়। ঐ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। এই বিয়েতে কোনও উত্তরাধিকার থাকে না। সুন্নি আলেমদের অধিকাংশই এই বিয়েকে হারাম মনে করেন।

একই কথা খাটে)। যে ব্যক্তি মনে করে স্ত্রীদের পেছন থেকে আসা যায় (অ্যানাল সেক্স) তার ব্যাপারেও একই কথা। এসবই কিন্তু আমাদের কাছে নিতান্ত অপছন্দনীয় ও অবৈধ (মাকরুহ মুহাররাম) যদিওবা কিছু মানুষ আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে— তাদের মতকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু তার মানে এই নয়— আমরা তাদের বলবো: আল্লাহ যা হারাম করেছেন তোমরা তাকে হালাল করছো এবং খুব গর্হিত কাজ করছো। কেননা তারাও আমাদেরকে একইভাবে অভিযুক্ত করতে পারে, যেভাবে আমরা তাদের করছি। তারাও আমাদের মতের অনুসারীকে বলতে পারে— আল্লাহ যা হালাল করেছেন সে তাকে হারাম করছে।"

[আল-উম্ম, ৬/২০৬]

এখানে যে কাজগুলোর কথা ইমাম শাফেয়ী বলেছেন— এসব শুধু তার কাছেই হারাম নয়, মোটামুটি সুন্নি মুসলিমদের প্রায় সবার কাছেই হারাম। কিছু কিছু কাজ কোরআন-হাদীস দিয়ে অ্যাপারেন্টলি অবৈধ ঘোষিত বলেই আমরা জানি। যেমন: হাতে হাতে এক টাকার বদলে দুই টাকার লেনদেনের যে উদাহরণ, তা হাদীস দিয়ে স্পষ্ট সুদ হিসেবে পরিচিত। অ্যানাল সেক্স কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। এবং ইমাম শাফেয়ী নিজেও এখানে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে এগুলো তার কাছে পরিষ্কার হারাম। কিন্তু তাই বলে অন্য ব্যক্তির মত দেয়ার বা ভিন্নভাবে চিন্তা করার যে স্কোপ রয়েছে, সেটাকে তিনি অস্বীকার করছেন না। এমনকি সেসব বিষয়েও, যেসব বিষয়ে আমাদের ধারণা হলো— এগুলোতে মতপার্থক্যের কোনও সুযোগ নেই। এবং এ ব্যাপারগুলোতে নিজের স্পষ্ট ধারণা থাকার পরও ইমাম শাফেয়ী কতটা প্রজ্ঞাবান যে নিজের মতে তিনি অটল থাকলেও, অন্যের মতকে এবং অন্যকে স্বীয় মতে অটল থাকার স্পেইস তিনি দিচ্ছেন। এটুকু অনুধাবনও তার মনে ঠিকই কাজ করছে যে তিনি যদি অন্যকে দোষারোপ করেন, তাহলে অন্যরাও ঠিক একইভাবে তাকে দোষারোপ করতে পারে।

অথচ আমাদের সময়ে বহু স্কলার বা তাদের অনুসারীদের এরকম বহু বিষয়ে স্পষ্ট ডিসমিসিভ কথা বলতে শোনা যায়, যেন এ ব্যাপারে কোনও দ্বিতীয় মত থাকতে পারে না। যারা অন্য মত দিচ্ছে তারা বক্র, পথভ্রষ্ট, কুটিল লোক, শয়তানের দোসর।

সক্রেটিসের 'নো দাইসেলফ' কথাটি খুবই দামি একটি কথা। কিন্তু যে মুসলিম অন্য মুসলিমের কথাই শুনতে পারে না, সে সক্রেটিসের কথা শুনবে এমনটা আশা না করাই ভালো।

ধর্মীয় চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

মো. জাকির হোসেন

রক্তমূল্যে কেনা বাংলার সবুজ-শ্যামল প্রান্তর ইসলাম ধর্মের নামে চালানো সন্ত্রাসে রক্তাক্ত হচ্ছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রিয় বাংলাদেশকে কৃত্রিমভাবে অস্থির, অশান্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। একজন সত্যিকারের মুসলিম কখনো অন্যের জন্য ভয়ের, ত্রাসের কারণ হতে পারে না। একজন সত্যিকারের মুসলিম সমাজের জন্য আশীর্বাদ, অভিশাপ নয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন,

> "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন সবচেয়ে উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।"
>
> [সূরা নাহল: ১২৫]

শান্তি, দয়া ও করুণার ধর্ম ইসলাম কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অনুমতি দেয় না। মহান আল্লাহ আল-কোরআনে একাধিকবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন মুসলমানদের আগে আক্রমণ না করতে, আগ্রাসন না চালাতে, শত্রু যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করেছে তার চেয়ে বেশি শক্তি প্রয়োগ না করতে। আল্লাহ বলেছেন,

> "ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি ও তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে

> আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।”
>
> [সূরা মুমতাহিনা: ৮]

শুধু মানুষের প্রতি নয়, একজন মুসলমানকে পশু-পাখির প্রতিও দয়াবান হতে বলা হয়েছে। এদের কষ্ট দিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

> “জনৈক মহিলাকে এ জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে যে সে একটি বিড়ালকে মৃত্যু পর্যন্ত আটকে রেখেছে। সে যখন বিড়ালকে আটকে রেখেছে খাবার ও পানীয় থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছে। মুক্ত হয়ে পোকামাকড় খাবে সে সুযোগ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।”

আরেক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন,

> “এক ব্যক্তি এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছে, এর প্রতিদানে আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।”

বোমাবাজি করা, আত্মঘাতী হয়ে নিরস্ত্র মানুষকে আতঙ্কিত করা, হত্যা-জখম করা, ঘরবাড়ি, সম্পদ, স্থাপনা ধ্বংস করা দয়া ও ক্ষমার ধর্ম ইসলামের চিরায়ত আদর্শের বিপরীত।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে ইসলামে কি অস্ত্র ধারণ করার, যুদ্ধ করার বিধান নেই?

অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু কখন কোন অবস্থায় প্রতিরোধ যুদ্ধ করা যাবে সে বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক ও অপব্যাখ্যা দিয়ে অনেককেই ইসলাম ধর্মের নামে সর্বনাশা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত করা হচ্ছে। ইসলামে কেন অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ কোরআনে বলেন,

> “আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই জমিন ফ্যাসাদপূর্ণ (বিপর্যয়পূর্ণ) হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল।”
>
> [সূরা বাকারা: ২৫১]

কোরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

> “আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গির্জা

(ইহুদীদের), উপাসনালয় ও মসজিদগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।"

[সূরা হজ্জ: ৪০]

কোন পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম অস্ত্র ধারণ করতে পারবে সে বিষয়ে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।"

[সূরা হজ্জ: ৩৯]

আল্লাহ আরো বলেন,

"এবং যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং সীমা অতিক্রম করো না; নিশ্চয়ই সীমা লঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন না।"

[সূরা বাকারা: ১৯০]

ইসলাম ধর্ম পালনে, আল্লাহর পথে চলতে যারা বাধা সৃষ্টি করে এবং যারা মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাধ করে। তাই এই অবস্থায় যুদ্ধ করার অনুমতি আছে। আল্লাহ কোরআনে বলেন,

"আর তাদের হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদের বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত ফেতনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।"

[সূরা বাকারা: ১৯১]

অমুসলিম ভূখণ্ডে মুসলমানরা নির্যাতিত-নিপীড়িত হলে তাদের সাহায্যে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি আছে। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে,

"আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন; এখানকার

> অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।"
>
> [সূরা নিসা: ৭৫]

সেসব অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে, যারা মোনাফেক (কপট), বিদ্রোহী, সন্ত্রাসী, যাকাত ও অন্যান্য কর পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়, প্রকাশ্যে ইসলামের আইন অবমাননা করে, শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও আদর্শিক ভিত্তির উপর হুমকি সৃষ্টি করে। আল্লাহ কোরআনে ইরশাদ করেন,

> "হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা দেখান। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা।"
>
> [সূরা তাহরীম: ৯]

যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। তবে মুসলমানদের আগ্রাসন চালাতে নিষেধ করা হয়েছে। আল-কোরআনে আল্লাহ বলেন,

> "আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সঙ্গে, যারা লড়াই করে তোমাদের সঙ্গে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"
>
> [সূরা বাকারা: ১৯০]

ধর্মের নামে আপনারা যারা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন, আত্মঘাতী হয়ে নিরপরাধ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা, সম্পদ ধ্বংস, সমাজে বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃষ্টির পথ বেছে নিয়েছেন, তাদের কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখার জন্য আমি নিবেদন করছি।

এক.

আপনাদের কাজের দ্বারা ইসলামের কী উপকার হচ্ছে? আপনাদের কর্মকাণ্ডে দেশে-বিদেশে টুপি-দাড়িওয়ালা মানুষ শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাসেরই শিকার হচ্ছে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে হামলা, অপমান, অবহেলা ও বিদ্রূপের শিকার হচ্ছে। আপনাদের বোমাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস আর আত্মহননের কারণে মসজিদে প্রবেশে

কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, সীমিত সময়ের জন্য মসজিদ খোলা থাকছে, ফলে মসজিদভিত্তিক ইসলামী জ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে গেছে।

দুই.

ধর্মের জন্য যদি সন্ত্রাস হয়ে থাকে, তবে ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ঘোষণা করেছেন,

> "দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হেদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে (সীমালঙ্ঘনকারী, আল্লাহদ্রোহী, বিপথগামী) অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"
>
> [সূরা বাকারা: ২৫৬]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেছেন,

> "এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তাহলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী সব মানুষকেই একসঙ্গে বিশ্বাসী বানিয়ে ফেলতে পারতেন। সুতরাং (হে মুহাম্মদ) আপনি কি তাহলে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য লোকদের জবরদস্তি করতে চান?"
>
> [সূরা ইউনুস: ৯৯]

তিন.

আপনারা কারো নির্দেশে আত্মঘাতী হচ্ছেন। কিন্তু আপনারা কি এ বিষয়ে রাসূলের (সা.) হাদীস শোনেননি?

> "রাসূলুল্লাহ (সা.) সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এক ব্যক্তিকে তার আমির নিযুক্ত করে দেন। সে একটি আগুন প্রজ্বলন করল এবং তাদের তাতে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দিল। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলো এবং অপর একদল বলল, আমরা (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) আগুন থেকেই আত্মরক্ষা করেছি (তাই আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না)। যথাসময়ে রাসূলুল্লাহর (সা.) দরবারে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তখন তিনি যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিল তাদের লক্ষ্য করে বললেন, তখন তোমরা যদি সত্যি সত্যি আগুনে ঝাঁপ দিতে, তবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে। পক্ষান্তরে অপর দলকে

> লক্ষ্য করে তিনি উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধুই সৎ কাজে।"

চার.

আপনারা যারা ইসলামের নামে চরমপন্থা তথা উগ্রতার পথ বেছে নিয়েছেন তাদের উদ্দেশে দুটি নির্বাচিত হাদীস উল্লেখ করছি,

> "যে ব্যক্তি কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবে আল্লাহও তার জন্য কাঠিন্য অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার মতো সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে, তবে সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে (সে জান্নাত দেখতে পাবে; কিন্তু সেই রক্ত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবে না)। কাজেই যদি কেউ পারে এ ধরনের রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষা করতে, তবে সে যেন আত্মরক্ষা করে।"

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

> "তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের নামাযের পাশে তোমাদের নামায তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের রোযার পাশে তোমাদের রোযা তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের নেক কর্মের পাশে তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা কোরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, তেমনিভাবে তারা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে।"

পাঁচ.

আপনার কারণে যাঁরা নিহত হলেন সেই নিহত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের যে হক (অধিকার) নষ্ট হলো, তাদের ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তার কাছে আপনারা কী জবাব দেবেন? আপনারা কি আল্লাহর হুঁশিয়ারি শোনেননি? কোনো বান্দার হক নষ্ট করা হলে স্বয়ং আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে তারা ক্ষমা করে। রাসূলের (সা.) হাদীস কি শোনেননি? অন্যের হক নষ্ট করলে, হকদারের হক ফিরিয়ে না দিয়ে, তার

থেকে ক্ষমা না নিয়ে মারা গেলে হক নষ্টকারীর নেক আমল হকদারকে দিয়ে নিজে যেতে হবে জাহান্নামে। হক নষ্টকারীর নেক আমল হকদারদের দাবির চেয়ে কম হলে হকদারদের গুনাহ হক নষ্টকারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। সারা জীবনের নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যাবতীয় নেক আমল হকদারকে দিয়ে নিজে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত, রিক্ত হয়ে জাহান্নামী হতে হবে।

ছয়.

আপনাদের বিবেচনায় বাংলাদেশে তাগুতের শাসন পরিচালিত হচ্ছে। যদি ধরে নিই আপনার বক্তব্য সত্য, তাহলে প্রশ্ন হলো রাসূল (সা.) যখন পৃথিবীতে আসেন তখন জাহেলি তথা অন্ধকারের যুগ ছিল, তাগুতের শাসন ছিল। আল্লাহর রাসূল (সা.) কি তাগুতের শাসন পরিবর্তনের জন্য জোর করে, নেতিবাচক পন্থায়, নৈরাজ্য ও ধ্বংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন? রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদের আত্মঘাতী হওয়ার, চোরাগোপ্তা হামলার শিক্ষা দিয়েছিলেন, নাকি সুন্দর ব্যবহার, উত্তম চরিত্র, আল্লাহর পথে আহ্বান, আত্মগঠন ও সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন? আপনারা তাহলে কার অনুসরণ করছেন? আল্লাহর আইন বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হলে তা শুধু আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের দেখানো পথেই করতে হবে। ইসলামের নামে কোনো শায়খের খামখেয়ালিপনা কিংবা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শবিরোধী পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন,

> "হে নবী, লোকদের বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান। তাদের বলুন আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো। এরপর বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না।"
>
> [সূরা ইমরান: ৩১-৩২]

কোরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

> "নিঃসন্দেহে রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। অবশ্য তাদের জন্য, যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ও পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে আশা রাখে এবং যারা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।"
>
> [সূরা আহযাব: ২১]

সাত.

জিহাদের আহ্বান কে করতে পারে?

যদি যে কেউ জিহাদের আহ্বান ও নেতৃত্ব দিতে পারত, তাহলে মুসলমানরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদের ডাক দিত, আর সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত বিশৃঙ্খলা, নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে যেত। ইসলামে বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই, বরং বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়কে কোরআনে হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইসলামে একমাত্র মনোনীত নেতাই জিহাদের আহ্বান ও নেতৃত্ব দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

> "রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

> "রাষ্ট্রপ্রধান ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তার আনুগত্যে জিহাদ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব।"

কেউ বিভ্রান্ত করেছে বলে অন্যায় করেছি— এমন কোনো ওজর শেষ বিচারের দিন গ্রহণ করা হবে না বলে কোরআনে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কাজেই সময় থাকতে বিভ্রান্তি ছেড়ে কোরআন-হাদীসের পথ অনুসরণ করুন, সব সন্ত্রাসী কাজ বর্জন করুন।

অধ্যায় ৪

জিহাদ, হুদুদ ও মুরতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে

শুরা ব্যবস্থা, উলিল আমর, নাগরিকত্বের ধারণা ও ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

শুরা ব্যবস্থা

আমরা জানি, আল্লাহ তায়ালা পারস্পরিক সব বিষয়ে পরস্পরের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছেন। এতে মনে হতে পারে, অধিকাংশের পরামর্শ তথা মেজরিটি অপিনিয়নকে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সীরাতে আমরা এর পক্ষে অনেক উদাহরণ দেখতেও পাই। অপরদিকে, কোরআনের মধ্যে যত জায়গায় ‘অধিকাংশ’ (আকছার) শব্দটা এসেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি রাসূলকে (সা.) আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন— ‘হে নবী, আপনি যদি অধিকাংশের কথা অনুসারে চলতে থাকেন তাহলে আপনি বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন।’

এই আপাত বিরোধের পেছনে সামঞ্জস্যতার বিষয়টা বুঝতে হবে। যেসব বিষয় নীতিগত ও মৌলিক সেসব বিষয়কে গুণগতভাবে দেখা হয়েছে। আর যেসব বিষয় প্রায়োগিক তথা বাস্তবায়নের বিষয়, বিশেষত মুয়ামালাত তথা সামাজিক সম্পর্কের বিষয়, সেসবকে প্রধানত পরিমাণগতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, গুণগত পরিমাপে ‘অধিকাংশ-নীতি’ অচল। যদিও তা পরিমাণগত পরিমাপের জন্য অপরিহার্য।

গণতন্ত্রকে একটা প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসাবে দেখলে তা ইসলামের শুরা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য প্যারাডাইমে গণতন্ত্রকে নিছক পদ্ধতি হিসাবে দেখা

হয় না। আমার পর্যবেক্ষণে, তারা গণতন্ত্রকে একটা পরিপূর্ণ আদর্শ হিসাবে গণ্য করে। কথাটা ইংরেজিতে বললে, গণতন্ত্রকে আমরা as a means হিসাবে নিচ্ছি, নাকি as an end হিসাবে নিচ্ছি, তা গুরুত্বপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে এই পার্থক্য গ্রাউন্ড লেভেলে তেমন চোখে না পড়লেও বাস্তবে হায়ার লেভেলে গিয়ে এটি ব্যাপক ফারাক তৈরি করে। ইসলামের সাথে যারা গণতন্ত্রের বিরোধ দেখতে পান তারা গণতন্ত্রকে as an end in itself হিসাবে দেখেন।

তো, গণতন্ত্রকে আপনি end হিসাবে দেখবেন, নাকি means হিসাবে দেখবেন, গণতন্ত্র স্বয়ং কিন্তু তা বলে দেয় না।

শুরা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কারা কারা সংশ্লিষ্ট পরামর্শ সভার সদস্য হবেন, কীভাবে তারা মতামত পেশ করছেন, তাদের মাঠ পর্যায়ের দায়বদ্ধতা তথা constituency আছে কিনা, গাছের শিকড় হতে ডালপালায় রস সঞ্চালনের মতো তৃণমূল তথা আমজনতার চাওয়া না-চাওয়ার বিষয়গুলো যথাযথভাবে উপরে পৌঁছার ব্যবস্থা আছে কিনা, এসব। বলা হয় যে the last member can turn-down the whole set।

যারা রসায়নবিদ্যার ব্যবহারিক ক্লাস করেছেন তারা এটি ভালো বুঝবেন। দেখা যায়, আর একটা মাত্র ফোঁটা বেশি ঢালার কারণে পুরো দ্রবণটির গুণগত মানে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। হেগেল যেটাকে পরিমাণের গুণে রূপান্তর হিসাবে বলেছেন। রাসেল যেটাকে মুরগীর উদারহণ হিসাবে বলেছেন। প্রতিদিন আমরা মুরগীকে খাওয়াই। একদিন আমরা মুরগীটাকেই খেয়ে ফেলি।

তাই, পরামর্শ সভায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের সমাহার না ঘটলে, তারা ভালো করে যুক্তি উপস্থাপন করার পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ না পেলে, পুরো শুরা ব্যবস্থাটাই ভেংগে পড়বে। শেষ পর্যন্ত উপরে উপরে শুরা ব্যবস্থা হিসাবে বহাল থাকলেও বা দাবি করা হলেও বাস্তবে তা ব্যক্তিবিশেষ বা বিশেষ কোনো সিন্ডিকেটের স্বৈরতন্ত্র হিসাবেই আবির্ভূত হবে। প্রচলিত সব ইসলামী সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এ মুহূর্তে গণহারে যা হচ্ছে।

উলিল আমর প্রসঙ্গে

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের (সা.) এবং তোমাদের মধ্যকার উলিল আমরের। তো, এই উলিল আমর কারা? উলিল আমর হচ্ছে যাদেরকে আমরা সিভিল সার্ভেন্ট বলি তারা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ। উলিল আমরের শাব্দিক মানে হচ্ছে কোনো সামষ্টিক বিষয়ে

হুকুমদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ। ইসলামসম্মত কোনো রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যারা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী তারা হলেন নাগরিকদের জন্য উলিল আমর।

যেমন, আল্লাহর রাসূল (সা.) ইন্তেকালের পরে যারা খলিফা হয়েছেন তারা ছিলেন উলিল আমর। খলিফার অধীনস্ত সকল স্টাফই হচ্ছেন উলিল আমর। এটি শুধু ভাষাগত পার্থক্যের ব্যাপার। যেমন, এখনকার রাষ্ট্রের একজন সর্বনিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। এই কথাটাই আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন এভাবে, যে আমাকে মানবে সে আল্লাহকে মানবে, যে আমার প্রতিনিধিকে মানবে সে আমাকে মানবে। অতএব, এটি পরিষ্কার, উলিল আমর তথা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জিম্মাদারী বা নেতৃত্ব হচ্ছে মূলত একটা প্রশাসনিক ব্যাপার (legal jurisdiction)।

প্রচলিত ইসলামী দলগুলো, বিশেষ করে রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা দাবি করে, তাদের সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দই হচ্ছেন এ সময়কার উলিল আমর। তাই তাদের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলবৃন্দের উলিল আমর হিসাবে মর্যাদা লাভের দাবির সাথে আমি একমত। যেভাবে বলা হয়, যারা দুর্ঘটনায় মারা গেছে, যারা সন্তান জন্মদান করতে গিয়ে মারা গেছে, যারা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে মারা গেছে তারাও শহীদ। যদি তারা আদতে মুমিন-মুসলমান হয়ে থাকেন। যেভাবে যুদ্ধের মাঠের বাইরেও যে কোনো সৎ কাজের আন্তরিক ও প্রবল চেষ্টা জিহাদের সমতুল্য। যেভাবে দূরবর্তী বা বৃহত্তর অর্থে একজন মুমিনের সকল কাজই ইবাদত হিসাবে গণ্য।

তাহলে বুঝতেই পারছেন, উলিল আমর কেবল একটা জনপদে একটা দল থেকেই হবে, এমন নয়। হকপন্থী যে কেউ উলিল আমর হতে পারেন, যদি তিনি তেমন কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন যাতে আপনি স্বেচ্ছায় ফলোয়ার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। জামায়াতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবই সংশ্লিষ্ট মুসল্লীদের উলিল আমর। এভাবে স্ত্রী-সন্তান ও অধীনস্ত গৃহকর্মীদের উপর উলিল আমর হচ্ছে পরিবারের কর্তা। আবার সন্তানাদি ও গৃহকর্মীদের উপর উলিল আমর হচ্ছে স্ত্রী। এভাবে আপনি উলিল আমরের মাসলাটা সহজেই পেয়ে যাবেন। এটি কঠিন বা বিশেষ কোনো কিছু নয়। সাধারণ বুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞানের বিষয়। কাজটা পরিচিত ও পুরনো। পরিভাষাটাই শুধু কারো কারো কাছে নতুন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। 'রা-ঈ'

তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত আর উলিল আমর তথা সামষ্টিক বিষয়ে দায়িত্বশীল — দুটো একই অর্থ বহন করে। চলার সময়ে যাকে গাইড হিসাবে মানা হয় সেও উলিল আমর।

উলিল আমরের আনুগত্য আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আনুগত্য হলো শর্তহীন। আর উলিল আমরের আনুগত্য হলো শর্তসাপেক্ষ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা ভালো ও কল্যাণজনক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। গুনাহ ও সীমালংঘনমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।

সাধারণ সামাজিক ও নাগরিক জীবনে উলিল আমরের তাৎপর্য হলো— ইসলামের নীতি ও হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন যে কোনো সামষ্টিক কল্যাণের কাজে যারা দায়িত্ব পালন করছে তাদেরকে মেনে চলা। হাসবেন না প্লিজ, আমি যা বুঝেছি, রাস্তায় চলার সময়ে ট্রাফিক পুলিশই পথচারীদের উলিল আমর। কথাটা এজন্য বললাম, চারিদিকে এত ‘ইসলাম, ইসলাম’ জিগির চলছে তাতে কেউ কেউ মনে করে শুধু নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, নারীদের পর্দা, সুদ-ঘুষ বর্জন ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু করণীয়-বর্জনীয়ই হলো ইসলাম। মনে হবে যেন এগুলোই শুধু ইসলামী কাজ। চাষাবাদ করা, চাকরি করা, পড়ালেখা করা কিংবা রাস্তায় হাঁটাচলার মতো নৈমিত্তিক কাজ বুঝি ইসলামী কিছু নয়।

প্রকৃতপক্ষে, মানব কল্যাণের জন্য যা কিছু করণীয় তা সবই ইসলামী হতে পারে বা হবে, যদি তাতে ‘ইসলাম’ নামক সিল বা লোগো লাগানো নাও থাকে। যদি না তা ইসলামের কোনো সুস্পষ্ট হুকুমকে ভঙ্গ করে।

সম্ভাব্য কোনো ‘ইসলামী রাষ্ট্রের’ প্রশাসনিক কর্মচারীগণের বাইরে সেখানকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সামাজিক সংগঠনের দায়িত্বশীলবৃন্দও উলিল আমর হিসাবে গণ্য হবেন। যতক্ষণ তারা হক পথে থাকবেন ও হক কথা বলবেন। দলীয় উলিল আমরকে তাদের অনুসারীরা মান্য করবেন, যদি তা রাষ্ট্রীয় উলিল আমর হিসাবে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের বিরোধিতার শামিল না হয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বার বার বলেছেন, তোমরা যদি কোনো কিছু না জানো, তাহলে যারা জানে তাদের কাছ থেকে জেনে নাও। তো, যারা জানে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য তারাই উপযুক্ত তথা উলিল আমর। এই অর্থে আলেম সমাজও উলিল আমর, যদি তারা প্রশাসনিক কোনো দায়িত্বে নাও থাকে।

নাগরিকত্বের ধারণা

নাগরিকত্ব হলো এক ধরনের চুক্তি। কেউ কোনো চুক্তি করলে তা পালন করা

ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। তাই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বসবাস করার মানেই হলো চুক্তিতে আবদ্ধ থাকা। এক ধরনের আনুগত্যের অধীনে থাকা। এই দৃষ্টিতে একজন নাগরিক হিসাবে আপনি যাদের মেনে চলেন তিনি কোনো না কোনো ধরনের উলিল আমর বটে। ব্যস, এটুকুই। এই চুক্তির পরিধি কতটুকু, তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

শুধু এটুকু বলে রাখি, নাগরিকগণের সাথে রাষ্ট্রের অপরিহার্য এই চুক্তি-প্রথার বাহ্যিক রূপ সাংবিধানিক বিধিমালা হলেও এর অন্তর্গত মূল ভিত্তিটা হলো সামাজিক মতৈক্য বা founding social contract। সেটা এক ধরনের নীরব মতৈক্যের (tacit agreement) ব্যাপার। একেকটা জাতির দীর্ঘ সংগ্রাম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্ম এমনকি জলবায়ুগত বিষয়গুলোও এই সামাজিক মতৈক্য গড়ে উঠার ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউট করে। এই পয়েন্টে মূল আলোচনা এখানেই শেষ। এবার পরের আলোচনাতে আসেন।

'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রসঙ্গে বহুত্ববাদের ধারণা

আল্লাহর মহান সত্তাগত এককত্ব (unicity) যাকে আমরা তাওহীদ বলি, এটি ছাড়া ইসলামের সব ব্যাপারই কোনো না কোনোভাবে বহুত্ববাদী (pluralistic)। সঙ্গত কারণেই তাই সমাজ ও রাষ্ট্র ধারণার দিক থেকে কষ্টকল্পনার (utopia) পরিবর্তে ইসলামী জীবনবিধান হলো প্রয়োগধর্মী ও বাস্তববাদী তথা বহুত্ববাদী।

কয়েক বছর আগে ইসলামের দিক থেকে রাষ্ট্র ধারণার উপর নিম্নোক্ত স্কেলটি তৈরি করেছিলাম:

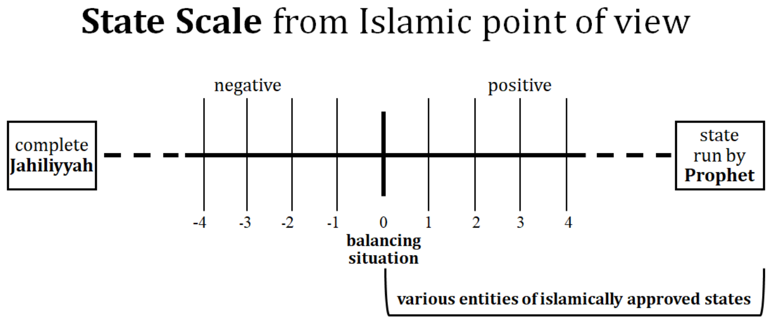

বুঝতেই পারছেন, ইসলামী রাষ্ট্র একক কোনো ব্যাপার নয়। এটি ঠিক এভাবে হলে আছে বলা যাবে, এর খানিক ব্যত্যয় হলেই তা অনৈসলামি হয়ে গেলো— ব্যাপারটা এমন নয়। ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানগুলো যে রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে অবাধে পালন করা যায়, তা-ই এক ধরনের ইসলামী রাষ্ট্র।

তো, এই 'ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান' বলতে আমরা কী বুঝবো? মক্কী যুগের ইসলামকে যদি ইসলামই মনে করি তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র ধারণার ব্যাখ্যা হবে প্রশস্ত। এই অর্থে, যে রাষ্ট্রে মুসলমানরা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতভিত্তিক ঈমানী পরিচয় নিয়ে নামায-রোযা করতে পারে, সে ধরনের রাষ্ট্রও অনৈসলামী রাষ্ট্র নয় অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র। উল্লেখ্য, মক্কী যুগে মুসলমানেরা স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারতো না। মুসলমান পরিচয় নিয়ে তারা ছিলো বিপদগ্রস্ত। তাই, মক্কী যুগের ইসলাম ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইসলাম।

মাদানী জিন্দেগীর শুরুর দিকটাকে যদি আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যূনতম মান হিসাবে বিবেচনা করি, তাহলে যে রাষ্ট্রের মুসলমানরা জুমা ও ঈদের নামায পড়তে পারে এবং যে রাষ্ট্রে মুসলমানদের নেতাই হলো রাষ্ট্রের কর্ণধার সেটি ইসলামী রাষ্ট্র। রাসূলুল্লাহর (সা.) মাদানী জিন্দেগীর শেষ পর্যায়, বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পরবর্তী অবস্থাকে যদি আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের (একমাত্র) স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে বিবেচনা করি, তাহলে সেই ধরনের রাষ্ট্র কায়েম করা কেয়ামত পর্যন্ত অসম্ভব। কারণটা পরিষ্কার। যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন একজন নবী, নবী যেহেতু আর আসবেন না, তাই সেই ধরনের রাষ্ট্রও আর কায়েম করা যাবে না। বাহ্যত অনুরূপ মনে হলেও গুণগতভাবে পরবর্তী যে কোনো রাষ্ট্র সেই আদর্শ রাষ্ট্রের তুলনায় ইনফেরিয়রই হবে।

বিষয়টা খানিকটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা ব্যাপারটাকে তাত্ত্বিকভাবে যতটা সহজ ও নিছক বাস্তবায়নের ব্যাপার বলে মনে করেন, বাস্তবে তা ততটা সাদা-কালো ধরনের নয়। এ নিয়ে আমার "ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়নে ক্রমধারার অপরিহার্যতা"[১] শিরোনামে একটা গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ আছে। তাতে বিষয়টা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

মোদ্দাকথা হলো, যে কোনো আধুনিক গণতান্ত্রিক কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর হলেও, দিনশেষে তা এক প্রকারের ইসলামী রাষ্ট্রই বটে; যদি সেখানকার মুসলমানরা মুসলিম পরিচয় (identity) তথা ঈমান-আকীদা নিয়ে নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত আদায় করে বসবাস করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে প্রচলিত ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক মনে হলেও রাষ্ট্র নিয়ে ইসলামের তরফে এটাই সঠিক ধারণা। ইসলামী রাষ্ট্র মানে এমন রাষ্ট্র যার সবকিছু পরিপূর্ণভাবে ইসলামসম্মত, যা বেসিকেলি মুসলমানদের রাষ্ট্র, মুসলমানেরা যে রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা যেখানে মুসলমানেরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক— ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে এমন সব ভুল ধারণা লক্ষ করা যায়।

---

[১] দেখুন: https://mozammelhq.com/post/1491

ইসলামী শরীয়াহ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের আগে কোনো রাষ্ট্র যদি ইসলামী হিসাবে গণ্য না হয়, তাহলে, আল্লাহ মাফ করুক, হিজরতের পর পরই মসজিদে কুবায় জুমার নামায আদায়ের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন আল্লাহর রাসূল (সা.) করেছিলেন তাকে আর ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে না। রাসূল (সা.) পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামী নয় বলার দুঃসাহস কেউ করবে না, জানি। কিন্তু top-down অ্যাপ্রোচে (বাংলা কথায়, গায়ের জোরে) যারা দ্বীন কায়েম করতে চান তারা হয়তো বলবেন— মদীনায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে 'পূর্ণাঙ্গ' ছিলো না। কেননা, তখনো শরীয়াহর বিধিবিধান সব নাযিল হয় নাই।

আমি তো এ কথাটাই বলার চেষ্টা করছি, আল্লাহ চাইলে মূসার (আ.) উপর নাযিলকৃত ten commandments-এর মতো সবকিছু একসাথে দিয়ে দিতে পারতেন। বাস্তবায়ন না হয় ধাপে ধাপে হতো। সেক্ষেত্রে রাসূল (সা.) অনৈসলামী ব্যবস্থা হতে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে পারতেন। তা তো হয় নাই। কেন আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (সা.) তা করেন নাই? যাদের মধ্যে তিনি কাজ করছিলেন তারা (আল্লাহ মাফ করুক) কি তুলনামূলকভাবে খারাপ ও অযোগ্য লোক ছিলো বলে? ব্যাপারটা তো বরং এর ঠিক উল্টা।

যাহোক, এখানে আমি এ নিয়ে বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না। শুধু এটুকু বলে রাখি, দ্বীন কায়েম একটা ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। এমন কোনো পর্যায় আমাদের সামনে নাই যাতে পৌঁছতে পারলে বলা যাবে— হ্যাঁ, দ্বীন কায়েম সুসম্পন্ন হয়েছে।

তারমানে অনৈসলামিক রাষ্ট্র বলে কি কিছু নাই? হ্যাঁ, আছে। অনেক আছে। বৈশিষ্ট্য দেখে তা চিহ্নিত করা যাবে।

বাংলাদেশ কি ইসলামী রাষ্ট্র, নাকি অনৈসলামী রাষ্ট্র?

কথাটা পিছন দিক থেকে যদি আমরা শুরু করি, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম বাংলাদেশ অনৈসলামী রাষ্ট্র। তাই "এখানে দ্বীন কায়েম করতে হবে। অর্থাৎ একে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। হোক সেটা বিপ্লবের মাধ্যমে, অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে। এবং এটাই হলো ইসলামী আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা ও অপরিহার্যতা।" এমনটা যারা মনে করেন, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, একটা অনৈসলামী রাষ্ট্র তথা দারুল হরবে এত মসজিদ-মাদ্রাসা, ঈদ-জুমা, আক্বদ-যাকাত ইত্যাদি হয় কী করে? দারুল হরবের লোকেরা এত বিপুল সংখ্যক, এমনকি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হজ্বও করে কীভাবে?

যদ্দুর জানি, ক্লাসিক্যাল ফিকাহ অনুসারে রাষ্ট্র দুই ধরনের: (১) দারুল ইসলাম বা

ইসলামী রাষ্ট্র ও (২) দারুল হরব বা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় বা যাদের সাথে যুদ্ধ চলছে এমন রাষ্ট্র, যাকে আমরা ইসলামবিরোধী বা অনৈসলামী রাষ্ট্র বলতে পারি। দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়— এমন রাষ্ট্রগুলো যে পক্ষের সাথে লিখিতভাবে বা সমঝোতার ভিত্তিতে মৈত্রীতে আবদ্ধ হবে তারা সেই পক্ষভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

এবার বলুন, বাংলাদেশ তো দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়। এ ক্ষেত্রে যদি বলেন, বাংলাদেশ দারুল ইসলামের মিত্রপক্ষ, তাহলে আমার প্রশ্ন থাকবে, বাংলাদেশকে দারুল ইসলামের পক্ষভুক্ত মনে করার কারণ কী? দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রটি আপনাদের হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্র (প্রশ্ন নং—১)? এবং সেই কথিত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের লিখিত চুক্তি বা অলিখিত সমঝোতাটা কখন, কোথায় ও কীভাবে হয়েছে (প্রশ্ন নং—২)?

জানি, এখানকার ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে স্বপ্নগ্রস্তদের কাছে এ ধরনের জরুরি কিন্তু ক্রিটিক্যাল প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নাই। বাংলাদেশকে দারুল হরব তারা বলতে পারবেন না। তার কারণ উপরেই উল্লেখ করেছি। কোনো ইসলামিস্ট ব্যক্তি বা দল এমন অডাসিটি করলে তাদের 'ইসলাম ইন বাংলাদেশ' নামক অতি প্রিয় অথরিটি-কোয়েশ্চনটা ধপাস করে ধ্বসে পড়বে। নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ বলে লেজিটিমেসি তারা হরহামেশা ক্লেইম করেন, তা আর টিকবে না।

এসব কথার মানে হলো, সমকালীন ফিকাহ বলে একটা জিনিসকে বুঝতে হবে। পড়ে যদ্দুর বুঝেছি, শায়খ কারযাভী হতে শুরু করে তারিক রমাদান পর্যন্ত সবাই এ ধরনের কথাগুলোই বার বার বলছেন। তারা বলছেন, দুনিয়ার তাবৎ রাষ্ট্র বা রাজ্যকে দারুল ইসলাম বনাম দারুল হরবে পৃথকীকরণের এই নীতি হতে সরে আসতে হবে। তো, সরে এসে কী করতে হবে, কোন ধরনের রাষ্ট্রের মান ও নাম কী হবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে ততটা মতৈক্য নাই। সেসবে আমার আগ্রহও নাই। সেসব পণ্ডিতদের গবেষণা ও এক্সপার্ট অপিনিয়ন দেয়ার বিষয়।

আমাদের বিবেচনা ও এনগেইজমেন্টের ক্ষেত্র হলো— একজন মুসলমান হিসাবে দ্বীন কায়েমের ফরজিয়াতকে আমি-আপনি কীভাবে আঞ্জাম দিবো, তাই মুখ্য বিষয় হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। এই পয়েন্টের শুরুতে যে কথাগুলো বলেছি তা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি। অর্থাৎ মুসলমান পরিচিতি নিয়ে বাস করা অসম্ভব এমন রাষ্ট্রগুলোকে অনৈসলামী রাষ্ট্র বিবেচনা করে বাদবাকি সব রাষ্ট্রকে ইসলামসম্মত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি পাস মার্ক ধরেছি শতকরা ৫০ নম্বরকে। অর্থাৎ যে রাষ্ট্র ইসলামকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে মানে না, আবার

মুসলমানদেরকে ইসলামের মৌলিক হুকুম-আহকাম পালনে বাধাও দেয় না, সেই ধরনের রাষ্ট্র হলো কানায় কানায় পাস নম্বর পাওয়া দুর্বলতম ইসলামী রাষ্ট্র। এখান হতে শুরু করে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালনের সুযোগ যতো বিস্তৃত, অবাধ ও শুদ্ধতর (perfection অর্থে) হবে ইসলামের দিক থেকে অনুমোদনযোগ্য রাষ্ট্র হিসাবে এটির পয়েন্ট বা গ্রেডও তত বাড়তে থাকবে।

অবশ্য আমার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং সম্পর্কে ক্লিয়ার না থাকলে পাঠকের কাছে আমার কথাগুলোকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। তা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামের পজিশন কী হবে, তা ঠিকমতো বুঝতে পারা। দেখুন, একটা হলো কাজের ইসলাম, অন্যটা হলো নাম ও কাজের ইসলাম। ইসলামের কিছু কাজ আছে যা নামেও থাকতে হয়, কাজেও থাকতে হয়। এগুলোকে ইবাদত বলে। যেমন, নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি। এ ধরনের গুটিকতেক বিষয় বাদে অবশিষ্ট সব সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইসলামের নীতি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়ত ইসলাম অনুসারে হলেই তা ইসলামী হয়েছে বলে মনে করতে হবে। এই ক্যাটাগরির কাজগুলোকে বলে মুয়ামালাত।

সমাজের ঊর্ধ্বতন কাঠামো বা এক্সটেনশান অব অথরিটি হিসাবে রাষ্ট্রব্যবস্থাও মুয়ামালাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই কোনো রাষ্ট্র, ইসলাম মোতাবেক হওয়ার জন্য তাতে ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ ঘোষণা থাকা অপরিহার্য নয়। সত্য কথা বলার সময়ে তা ইসলাম মোতাবেক বা আল্লাহর হুকুম অনুসারে বলা বা করা হচ্ছে— এমনটা দাবি করা বা ঘোষণা দেয়ার দরকার নাই। কথাটা সত্য বা কাজটা সঠিক হওয়া এবং ব্যক্তির নিয়তে আল্লাহর বন্দেগীর অনুভূতি থাকাই যথেষ্ট। রাষ্ট্র যেহেতু ব্যক্তি নয়, তাই রাষ্ট্রের কোনো অন্তরও নাই, আখেরাতও নাই। তাই রাষ্ট্রসত্তার ‘বন্দেগীর অনুভূতি’ থাকারও প্রসঙ্গ নাই। রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড ইসলামের সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও নীতিমালার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো, তা-ই বিবেচ্য।

মন্তব্য ও প্রতিমন্তব্য

S M Riaz: আলহামদুলিল্লাহ, উলিল আমরের ব্যাপারটা খুব সুন্দর বলেছেন। ‘কাজ’ করতে গিয়ে এই ধরনেরই একটা দৃষ্টিভঙ্গি এসেছিল।

‘শূরা’কে যতটুকু বুঝেছি, এখানে বিজ্ঞজনদের মতামত নিয়ে ইমাম যেটা সঠিক মনে করেন সেটাই সিদ্ধান্ত নেন। সেটা অনেক সময় অধিকাংশের মতামত হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। আবার সবার মতামতের বিপক্ষেও হতে পারে।

যাকাত অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আবু বকর (রা.) প্রায় সবার মতের বিপক্ষে গিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কিন্তু গণতন্ত্রে অধিকাংশের মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতামতকে একই লাইনে আনার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন করা হয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: একটা বিরাট সমস্যা হলো, যে কোনো বিষয়ে সুন্নাহর দাবি বুঝতে গিয়ে আমরা 'খাইরুল কুরুন' তথা প্রথম তিন যুগের কথা বলি। অথচ, সে সময়কার রাজনৈতিক কাঠামো ও অবস্থা এখন আর নাই।

তাছাড়া, ইসলামী শরীয়াহর দাবি হলো, মুয়ামালাতের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তৎকালীন কাঠামোর চেয়ে সেখানকার শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া।

সে হিসাবে এককেন্দ্রিক খেলাফত ব্যবস্থায় ইমাম বা খলিফার যে ক্ষমতা তা বর্তমান অবস্থায়ও প্রযোজ্য হবে না। যেহেতু সেরকম ব্যাপক ও সমন্বিত একক খেলাফত ব্যবস্থা এখন আর নাই। কখনো সেরকম কিছু হলে তখন সেটার প্রাসঙ্গিকতা থাকবে।

খেয়াল করলে দেখবেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও এক নম্বর পজিশানে যিনি থাকেন, তার বিশেষ কিছু একক ক্ষমতা থাকে। আবার রাজতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও শাসক চাইলে যে কোনো সময়ে যে কোনো কিছু করে ফেলতে পারে না। ইতিহাস এর সাক্ষী।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব-ব্যবস্থার ধারণা হলো ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার এক ধরনের ভাষ্য। ব্যক্তি প্রধান থাকলেও সমষ্টির হাতেই আসলে ক্ষমতার লাগাম, এমন ইন্টারপ্রিটেশানও কিন্তু ইসলামের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে গ্রহণযোগ্য। যখন যেখানে যে ধরন উপযোগী হয় বা কাজে লাগে।

সেই পুরনো কথাই আবার বলতে হয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারসহ মুয়ামালাতের বিষয়সমূহে ইসলাম বাহ্যিক ধরন ও পদ্ধতির চেয়ে ন্যায়, কল্যাণ, উন্নয়নের মতো মূলনীতিগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

বলাবাহুল্য, ন্যায়, কল্যাণ ও উন্নয়নের ইসলামী ধারণা তাওহীদভিত্তিক। তাই, সেগুলোর ব্যাপ্তি ও বিবেচনার পরিধি আখেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত।

জিহাদ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি

ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ: শাইখুল আজম আবরার

জিহাদ নিয়ে অনেকেই লেখালেখি করেছেন। বিভিন্ন ইসলামী ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে এ বিষয়ে প্রচুর থিসিস লেখা হয়েছে। গবেষকরাও এ নিয়ে কম লেখালেখি করেননি। অন্যদিকে, এ বিষয়ে জানা ও মানা, প্রচার ও প্রয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন ইসলামী দল ও আন্দোলন আকৃষ্টই শুধু হয়নি, নিজেদের নামের মধ্যে পর্যন্ত জিহাদ শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। যেমন, অনেক আরব ও মুসলিম দেশে 'জামায়াতুল জিহাদ' জাতীয় নামের একাধিক দল রয়েছে।

কিন্তু জিহাদের মতো ব্যাপক বিস্তৃত এই বিষয়টির ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মতো উভয় ধরনের প্রান্তিক অবস্থানের মাঝে প্রকৃত বাস্তবতা হারিয়ে গেছে। এই দুই প্রান্তিকতাকে কোরআনে 'ত্বগয়ান' ও 'ইখসার' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ- أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

২০০৯ সালে প্রকাশিত 'ফিকহুল জিহাদ' ইউসুফ আল-কারযাভীর অন্যতম মৌলিক কাজ। দেড় সহস্রাধিক পৃষ্ঠার সুবিশাল এই গ্রন্থটিতে জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলোর পর্যালোচনাপূর্বক জিহাদের ধারণাকে তিনি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই নিবন্ধটি গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণের ২৪-২৮ পৃষ্ঠার অনুবাদ।

> “আসমানকে তিনি সমুন্নত করে রেখেছেন এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তোমরা যেন এই ভারসাম্যের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করো। এবং তোমরা ন্যায্যতার সাথে পরিমাপ বা যাচাই করো, ভারসাম্য হারিয়ো না।”
>
> [সূরা রহমান: ৫-৭]

যাইহোক, জিহাদ নিয়ে আমরা মোটাদাগে তিনটি গোষ্ঠী দেখতে পাই:

১) যারা জিহাদ ধারণাটির বিলোপ চায়

এই গ্রুপটি জিহাদের বিলুপ্তি কামনা করে। তারা চায় মুসলমানদের জীবন থেকে জিহাদের ধারণা হারিয়ে যাক। তাদের ধ্যানজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিকতা, উন্নত চরিত্র ও মূল্যবোধের দীক্ষা দেয়া, যেমনটা তারা বলে থাকে। এই ব্যাপারটিকে তারা ‘নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ’ হিসেবে বিবেচনা করে একে ‘জিহাদে আকবর’ (উচ্চতর জিহাদ) দাবি করে।

অবাক করা ব্যাপার হলো, এই গ্রুপটির সাথে সেইসব সুফী ধর্মপ্রচারকের দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে, পশ্চাৎমুখী ও পতনের যুগ থেকেই জিহাদের ব্যাপারে যারা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে আসছে (অবশ্য সুন্নী ধারার যেসব সুফী ধর্মপ্রচারক জিহাদের ব্যাপারে ইতিবাচক ছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তাদের কথা আলাদা। যেমন: আলজেরিয়ার আমীর আব্দুল কাদের, লিবিয়ার উমর মুখতার এবং সেনুসী ধারা প্রমুখ)। সেক্যুলার ও পাশ্চাত্যপন্থীদের সাথেও এই গ্রুপটির দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে। এদের সাথে রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ডান-বাম নির্বিশেষে উপনিবেশবাদী শক্তির দালালেরা।

এরা সবাই উম্মাহকে নিরস্ত্র করে রাখতে চায়। যেন শত্রুর সামনে মুসলমানরা একদম খালি হাতে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। জিহাদের ধারণা এবং নতুন-পুরনো সব ধরনের জিহাদী আন্দোলনকে তারা এক চোট দেখে নেয়। জিহাদকে ‘আক্রমণাত্মক শত্রুতা’ বলেও তারা অভিযোগ করে থাকে।

উল্লেখিত এই সকল গোষ্ঠীকে নতুন-পুরনো সকল উপনিবেশবাদী শক্তি স্বাগত জানায়। এসব গোষ্ঠীকে তারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। যেন তারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং উপনিবেশবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে পারে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ভারতীয় উপমহাদেশে ‘কাদিয়ানী’ নামে এ ধরনের একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। জিহাদের ধারণাকে নির্মূল করার জন্য এদের তৎপরতার কথা সর্বজনবিদিত। এই তৎপরতার উদ্দেশ্য

ছিল উপনিবেশবাদের পথ পরিষ্কার করা। যেন মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তারা শাসন-কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে পারে।

আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কোনো কোনো আলেম ও দাঈ আধুনিক যুগের ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক, ন্যায্য-অন্যায্য সকল প্রকার জিহাদের নিন্দা করে থাকেন। অথচ খোদাদ্রোহী শাসকদের দ্বারা সংঘটিত আইনের শাসনের ব্যত্যয়, অনৈতিকতার সয়লাব এবং যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম যেন সমর্থনযোগ্য! কত মানুষের খুন ঝরানো হয়েছে, কত ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠন করা হয়েছে, কত শত 'হুরমত'[১] লঙ্ঘন করা হয়েছে, কত অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে, কত মানুষের মর্যাদাকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে, কত হাজারো মানুষকে অপহরণ করে নিয়ে গুম করে ফেলা হয়েছে— যারা বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে কিছুই জানা যায় না, কত মানুষকে জেলের ভেতর প্রকাশ্যে বা গোপনে মেরে ফেলা হয়েছে, এভাবে কত শত অন্যায় সাধিত হয়েছে তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এই সবকিছু বুঝি বৈধ ও সমর্থনযোগ্য! অন্যদিকে, নিপীড়িত কেউ এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তা হয়ে যায় অপরাধ, তারা হয়ে যায় অপরাধী, আর তাদের কাজ হয়ে যায় অবৈধ!

হ্যাঁ, এটা ঠিক, তাদের কেউ কেউ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। তবে তাদের তো অন্তত একটা কৈফিয়ত আছে। অথচ তাদের উপর যারা অত্যাচার করে, দ্বীনের বিরোধিতা করে, জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং দেশে দেশে সীমালঙ্ঘন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের তো সেই কৈফিয়তটুকুও থাকে না।

২) যারা পুরো দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছে

প্রথম গ্রুপটির একেবারে বিপরীতধর্মী আরেকটা গ্রুপ আছে। এদের বুঝ অনুযায়ী জিহাদের মানে হলো পুরো দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। একটি পক্ষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, দাওয়াতী কাজে বাধা দিয়েছে, দ্বীন পালন থেকে বিরত রেখেছে; আরেকটি পক্ষ মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে, শান্তিপূর্ণ সমঝোতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি, শত্রুতাও করেনি— এই দুই পক্ষের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করে না।

এই গ্রুপটি মনে করে, প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানেরই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য। অমুসলিমদেরকে হত্যা করার কারণ হিসেবে নিছক তাদের কুফরই

---

[১] মান-মর্যাদা, আশ্রয়, নিরাপত্তা, স্ত্রী, নারী— এসবকে একত্রে 'হুরমত' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এর শাব্দিক অর্থ হলো নিষিদ্ধতা। ইসলামে যেহেতু উল্লেখিত বিষয়গুলো অন্যায়ভাবে লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ, তাই এগুলোকে একত্রে 'হুরমত' বলা হয়। — অনুবাদক

(ইসলামকে অস্বীকার করা) নাকি যথেষ্ট!

তারা মনে করে, মুসলমানদেরকে যারা নিরাপত্তা দিয়েছে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা, যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি বা আমাদের ঘরছাড়া করেনি কিংবা আমাদের ঘরছাড়া করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে,তাদের সাথে ভালো ও ন্যায্য আচরণ করা সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত ও রাসূলের (সা.) হাদীসগুলো বা এরূপ যা কিছু আছে, সবই নাকি অস্থায়ী! এগুলোর কার্যকারিতা নাকি শেষ হয়ে গেছে! মুসহাফ তথা কোরআনের কপিগুলোতে এগুলো নাকি স্রেফ লিখিত আকারে আছে, কিন্তু কোনো তাৎপর্য নাকি আর অবশিষ্ট নেই! তাদের দাবি মতে, এ ধরনের প্রায় একশ চল্লিশ থেকে দুই'শর মতো আয়াতের কার্যকারিতা মাত্র একটি আয়াতের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে! এই আয়াতটিকে তারা 'আয়াতুস সাইফ' বা 'তরবারির আয়াত' বলে অভিহিত করে থাকে।

তবে সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, ঠিক কোনটি 'তরবারির আয়াত', সেটি তারা আজ অব্দি ঠিক করে উঠতে পারেনি।

তারা জাতিসঙ্ঘের সনদ মানে না। কারণ, তা নাকি উম্মাহকে জিহাদ থেকে নিবৃত রাখে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে এবং আঞ্চলিক বিবাদ-বিসম্বাদকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিহিত করতে তাগিদ দেয়।

এছাড়া যুদ্ধবন্দী বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিকেও তারা অস্বীকার করে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে কোনো বিধিনিষেধ বা শর্ত ছাড়াই বন্দীদেরকে হত্যা করা যায়। কিন্তু এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি তাদের অমনটা করতে বাধা দেয়।

এমনিভাবে দাস প্রথার বিলোপ সংক্রান্ত বৈশ্বিক ঐকমত্যকেও তারা প্রত্যাখ্যান করে। তাদের দৃষ্টিতে, এটি মেনে নিলে আল্লাহ কর্তৃক হালাল বিধানকে হারাম করে নেয়া হয়, যা আল্লাহর বিধানকে বাতিল করার নামান্তর!

তারা আরো মনে করে, তরবারি ও জিহাদের মাধ্যমেই দুনিয়া জুড়ে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। দাওয়াতী কাজ, যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, মানুষকে বুঝানো এবং মুসলমানদের চারিত্রিক মাধুর্যের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে, তলোয়ার কিংবা বর্শা, অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে নয় বলে যারা মনে করে — ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ থমাস আর্নল্ড The Preaching of Islam বইয়ে যেমনটা উল্লেখ করেছেন — এই গ্রুপটির মতে, তারা হলো বিপথগামী। কারণ, তারা নাকি মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। যারা এসব প্রাচ্যবিদের মতামতকে সমর্থন করে, তারা নাকি ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই

অজ্ঞ। ইসলামী জ্ঞানে এদের দৌড় নাকি খুবই সীমিত। এরা নাকি শয়তান প্রাচ্যবিদদের শিষ্য!

এ ধরনের চিন্তার বেশ খারাপ প্রভাব আছে। এই জাতীয় চিন্তাভাবনা লালনের পরিণতিতে একনিষ্ঠ নিয়তের যুবকেরা স্বজাতি ও পরিবার-পরিজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও তাদেরকে হত্যা করে। এরা তাদেরকে ঐসব কাফেরদের দলে গণ্য করে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা আবশ্যক। কারণ, তারা নাকি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে! আর যারাই এদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে, তাদেরকে তারা নির্বিচারে কাফের অপবাদ দিয়ে থাকে। এমনকি আলেমগণও এই অপবাদ থেকে রেহাই পান না। এই সশস্ত্র তৎপরতায় কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি মারা গেলেও তারা পরোয়া করে না। তাদের এইসব কাজের ফলে ইসলামের উপর 'সহিংসতার' কলঙ্ক চেপে বসে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে এমনসব ব্যক্তিকে হত্যা করে যাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কও নেই, সমস্যাও নেই। যেমন: পর্যটক, বিমানযাত্রী বা এ জাতীয় কেউ। এসব মানুষকে হত্যা, অপহরণ কিংবা পণবন্দী করার মাধ্যমে তারা সমাজে আতঙ্ক তৈরি করতে চায়। এসব তৎপরতার মাধ্যমে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে 'সহিংসতার' পাশাপাশি 'সন্ত্রাসবাদের' অভিযোগ তোলার সুযোগও করে দেয়।

৩) মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ দল

তৃতীয় গ্রুপটি হলো মধ্যপন্থী দল (উম্মাতুল ওয়াসাতু)। এদেরকে আল্লাহ তায়ালা মধ্যপন্থার পথ দেখিয়েছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন এবং শরীয়াহ ও বাস্তবতা উভয়ের তাৎপর্য উপলব্ধির দূরদর্শিতা প্রদান করেছেন। ফলে যারা চায় উম্মাহর অধিকারগুলো শক্তিহীন থাকুক, মুসহাফ বা কোরআনের কপি জিহাদমুক্ত থাকুক, উম্মাহর সীমানা পাহারাবিহীন পড়ে থাকুক এবং জান-মাল-আব্রু অরক্ষিত অবস্থায় থাকুক— এহেন প্রথম গ্রুপটির শৈথিল্য থেকে তারা মুক্ত থাকে।

একইভাবে তারা দ্বিতীয় গ্রুপের বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি থেকেও মুক্ত থাকে। দ্বিতীয় গ্রুপটি মুসলমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে চায়, দুনিয়ার সবার উপর আক্রমণ করতে চায় এবং সাদা-কালো, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সবার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা দাবি করে, এসব কাজকর্মের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং জান্নাতে যেতে পারবে। এ কারণে তারা মনে করে, তাদের সাথে চললে সরল সঠিক পথের দিশা পাওয়া যাবে এবং তাদের সামনে অত্যাচারী শাসকদের তৈরি

বাধার পাহাড় দূর হয়ে যাবে। কোনো রকম বিকৃতি ও প্রপাগান্ডা না করে স্পষ্টভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াটা এদের জন্য যেন বেজায় কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব ব্যাপার।

এটা ঠিক, অতীতকালে জিহাদের এই পদ্ধতিটি ঠিকই ছিল। কারণ, তখন কায়সার ও কিসরা কিংবা তাদের মতো অত্যাচারী শাসকেরা তাদের জাতির সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতো। তাই তাদেরকে পরাজিত ও জোরপূর্বক বিতাড়িত না করে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো অসম্ভব ছিল। এই বাস্তবতার কারণেই সাহাবী ও তৎকালীন মুসলমানরা এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের জন্য এই পন্থা অবলম্বনের আর দরকার নেই। কারণ, আধুনিক মিডিয়ার কল্যাণে আমরা ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারছি, আমাদের বক্তব্যগুলো শোনাতে পারছি। কোনো কর্তৃপক্ষ এই কাজকে থামিয়ে দিতে পারছে না।

দাওয়াতী কাজের জন্য এখন আমাদের হাতে রয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রচার ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, রেডিও স্টেশন এবং ইন্টারনেট। কারো অনুমতির অপেক্ষা না করেই এই প্রচারমাধ্যমগুলো সবার ঘরে ঢুকে পড়ে। এছাড়া রয়েছে আর্ন্তজাতিক ভাষায় লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তিকা। এইসব উপকরণ ও মাধ্যমই আমাদের যুগের জিহাদের জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর অস্ত্র। তবে এগুলোকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের দরকার একদল দক্ষ, বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী দাঈ, প্রশিক্ষক ও মিডিয়াকর্মী। তাদেরকে সময়োপযোগী পদ্ধতিতে নানা ভাষাভাষী মানুষের কাছে ইসলামের বক্তব্য তুলে ধরতে সক্ষম হতে হবে। যেন তারা মানুষকে ভালোভাবে বুঝাতে পারেন এবং তাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারেন।

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, এই গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে প্রতি দশজনে একজন, এমনকি হাজারে একজন লোকও আমাদের নেই।

ইন্টারনেটে আমাদের বৈশ্বিক ওয়েবসাইট (www.Islamonline.net) উদ্বোধনের দিন আমি বলেছিলাম, নিশ্চয় এই কার্যক্রমগুলো এখনকার সময়ের জিহাদ। যারা মুজাহিদ হতে ইচ্ছুক, যারা আত্মত্যাগ, ধনসম্পদ বা শ্রম দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদা লাভ করতে চান, তাদের জন্য এটিই হলো আজকের যুগের জিহাদ। এখনকার জন্য এটিই হলো বড় ও দীর্ঘমেয়াদী জিহাদ।

ইসলামী আইন হিসেবে হুদুদের প্রয়োগযোগ্যতা[1]

মুহাম্মদ হাশিম কামালী

মুহাম্মদ ইউনুস: প্রিয় দর্শক! ‘মব টিভি’র এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ‘লেটস টক’ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে আপনাদের সাথে আছি আমি জাহাবেরদীন মুহাম্মদ ইউনুস।

এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, মালয়েশিয়ায় ইসলামী আইনের পরিধি আরো বাড়ানোর দরকার আছে কিনা? বিদ্যমান চুক্তি আইন, দণ্ডবিধি, সড়ক পরিবহন আইন প্রভৃতি ইসলামী আইন কি যথেষ্ট নয়? এগুলো কি ইসলামী আইন নয়?

আমরা দেখি, মালয়েশিয়ার প্রতিটি নির্বাচনী প্রচারণায় হুদুদ আইনের বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনার প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। একে অনেক বেশি রাজনৈতিকীকরণ করে ফেলা হয়েছে। যার ফলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মালয়েশিয়ার নাগরিকরা সামগ্রিকভাবে বিষয়টি নিয়ে কনফিউজড। অথচ, হুদুদ আইন কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়। এটি একটি আইনী ব্যাপার। আরো স্পষ্ট করে বললে, ইসলামী আইনী ব্যাপার।

এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী স্কলার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হাশিম কামালী। ইসলামী আইন ও আইনশাস্ত্র (ফিকাহ) নিয়ে তিনি অনেকগুলো বই লিখেছেন। বর্তমানে তিনি

---

[1] ২০১১ সালের ৩ অক্টোবর ‘মালয়েশিয়ান অবজারভার’ টিভির ‘লেট’স টক’ অনুষ্ঠানে ড. হাশিম কামালী একটি সাক্ষাৎকার দেন। এটি তার অনুবাদ।

'ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড ইসলামিক স্টাডিজের' চেয়ারম্যান এবং সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগতম, প্রফেসর।

হাশিম কামালী: ধন্যবাদ।

মুহাম্মদ ইউনুস: প্রায় বছর তিনেক আগে আপনার লেখা 'Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments' বইটি এখন আমার হাতে রয়েছে। এখানে পুরো একটি চ্যাপ্টার জুড়ে আপনি হুদুদ আইনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দর্শকদের জানার জন্য আপনি কি বলবেন, হুদুদ আইন আসলে কী?

হাশিম কামালী: হুদুদ আইন হচ্ছে এমন আইন, যেগুলো কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট। বিশেষ করে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআনে সুনির্দিষ্ট বলা আছে, সেগুলো হুদুদ আইনের আওতাভুক্ত। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুন্নাহ থেকেও দৃষ্টান্ত নেয়া হয়। যদিও হুদুদের মতো বড় ধরনের শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোরআনের নির্দেশই সর্বোচ্চ।

মুহাম্মদ ইউনুস: হুদুদ আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? আমরা আসলে জানতে চাই, হুদুদ আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একে কি একটি দেশের 'ল অব দ্যা ল্যান্ড' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে?

হাশিম কামালী: যে কোনো ফৌজদারী আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। শাস্তি প্রদানের আরেকটি উদ্দেশ্য নিশ্চয় অপরাধ দমন করা। এখন বিধিবদ্ধ আইনী কাঠামোর মাধ্যমেই হুদুদ প্রয়োগ করা জরুরি কিনা তা নির্ভর করে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের উপর। ইসলামে রাষ্ট্রীয় আইন (সিয়াসাহ শরীয়াহ) প্রণয়নের ব্যাপারে শাসকের সিদ্ধান্ত বা মতামত অনুমোদিত। বিশেষ করে, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনা এবং ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করার অনুমোদন শাসককে দেয়া হয়েছে।

মুহাম্মদ ইউনুস: সিয়াসাহ শরীয়াহ নিয়ে আপনার কথাগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। কারণ আপনার মতে, অপরাধ দমনের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থা গ্রহণের স্বাধীনতা শাসক কিংবা সরকারের রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, হুদুদ আইন সমাজে, বিশেষত মুসলিম সমাজে, বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। কারণ, যে কোনো মুসলিম সমাজের উপর হুদুদ আইন বাধ্যতামূলক বলে অনেকের ধারণা। এ ব্যাপারে ...

হাশিম কামালী: হ্যাঁ, হুদুদ প্রয়োগ শরীয়াহ বাস্তবায়নের একটি শর্ত। কিন্তু হুদুদ প্রয়োগের সর্বোত্তম উপায়টা কী? হুদুদ প্রয়োগের ভিন্ন ভিন্ন উপায় আছে। একটি হলো, নিছক বাস্তবায়ন করার জন্যই হুদুদ প্রয়োগ করা। এটা হলো এ সংক্রান্ত নির্দেশনাগুলোকে আক্ষরিক অর্থে বিবেচনা করার ফল। আরেকটা পদ্ধতি হলো ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হুদুদ কার্যকর করা। এখন, সরকার কিংবা ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়টি খুঁজে বের করা। আইন, পলিসি ডকুমেন্টস কিংবা অন্য কোনো মানদণ্ডের আলোকে হুদুদ বাস্তবায়নের সর্বোত্তম উপায়টি ঠিক করে নেয়ার অনুমোদন ইসলামে রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মৌলিক শর্ত হলো অপরাধের শাস্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা। এ দুটি বিষয় নিশ্চিত করার জন্যই কোরআন সুনির্দিষ্ট কয়েকটি শাস্তির বিধান তথা হুদুদ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

মুহাম্মদ ইউনুস: তারমানে আপনার মতে, এখানে দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয় রয়েছে। একটি হচ্ছে নিছক বাস্তবায়নের জন্যই হুদুদ বাস্তবায়ন করা। অপরটি হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করা, যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে তো দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে খারিজ করে দেয়।

হাশিম কামালী: ঠিক বলেছেন। মালয়েশিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে হুদুদকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়, আমি তার সমালোচনা করি। হুদুদকে অনেক বেশি রাজনৈতিকীকরণ করে ফেলা হয়েছে, যা একটু আগে আপনিও বলেছেন। হুদুদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের কাছে তুলে ধরার পরিবর্তে এটিকে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে।

শাব্দিক অর্থের দিক থেকেই হুদুদের আওতাধীন হলো স্বল্পসংখ্যক ও সুনির্দিষ্ট কিছু শাস্তি। শরীয়াহ ও ফিকাহর আলোচনায় যথেষ্ট সাবধানতার সাথে এইসব শাস্তির প্রক্রিয়াগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে কিছু কিছু শাস্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়া। উদাহরণ হিসেবে ব্যভিচারের শাস্তির কথা বলা যায়। এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে কোরআনে ১০০ বেত্রাঘাতের কথা বলা হয়েছে। তবে এটি কার্যকরের পূর্বশর্ত হলো– এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, এমন চারজন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে হবে। কেউ যদি একেবারে মার্কেটপ্লেসের মতো উন্মুক্ত কোনো স্থানে এ ধরনের কাজ না করে থাকে, তাহলে তো চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার!

কোরআনে এ ধরনের কঠিন শর্তারোপ থেকে বুঝা যায়, হুদুদ প্রয়োগ করার জন্যই হুদুদের বিধান নয়। সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে হুদুদের কথা বলা হয়েছে বটে। তবে

আরো নমনীয় শাস্তি প্রয়োগের কথাও বলা হয়েছে। একে বলা হয় ‘তাজীর’। হুদুদ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পূর্বশর্ত যথাযথভাবে পূরণ করা না গেলে আরেক ধাপ নিচের শাস্তি তাজীর প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। আমি মনে করি, দণ্ডবিধিসহ মালয়েশিয়ায় প্রচলিত যেসব আইনের কথা একটু আগে আপনি বলেছেন, সেগুলো তাজীরের অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মদ ইউনুস: আপনার কথার সারমর্ম হলো, রাষ্ট্রীয় আইনের (সিয়াসাহ শরীয়াহ) ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের বাহ্যিক কাঠামোর চেয়ে ন্যায়বিচারের অন্তর্গত প্রেরণা প্রতিষ্ঠা করাই হলো ইসলামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে আপনি বলতে চাচ্ছেন, চুরি, প্রতারণা ও আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য যেসব দণ্ডবিধি রয়েছে, সেসব যদি ন্যায়বিচারের ইসলামী মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে, তাহলে এগুলোকে তাজীর হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যাবে?

হাশিম কামালী: হ্যাঁ। আমি মনে করি তাজীর একটি সাধারণ আইন। আপনি যেসব আইনের কথা বলেছেন, সেগুলো মালয়েশিয়ার পার্লামেন্ট ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা এগুলোকে আইনে পরিণত করেছে। ‘উলিল আমর’, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এগুলো হয়েছে। ফলে মালয়েশিয়ার আইনকানুন সিয়াসাহ শরীয়াহর আওতার মধ্যেই রয়েছে।

মুহাম্মদ ইউনুস: প্রচলিত দণ্ডবিধি বা চুক্তি আইন ইত্যাদি তো ইসলামী আইন বিশারদগণ (ফকীহ) প্রণয়ন করেননি। এগুলো ‘সিভিল সিস্টেম’ তথা পার্লামেন্টের মাধ্যমে হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, কোনো আইনকে ‘ইসলামী’ হতে হলে কি তা ফিকাহবিদদের নিকট থেকেই আসতে হবে? নাকি কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে যেসব মূলনীতি পাওয়া যায়, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াটাই যথেষ্ট?

হাশিম কামালী: প্রতিটি আইনকে আবশ্যিকভাবে টেক্সট থেকেই আসতে হবে— এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখবো, শাসক, গভর্নর, খলিফা কিংবা সুলতানগণ যেসব অর্ডিন্যান্স, পলিসি ডকুমেন্টস ও আইন প্রণয়ন করেছেন সেগুলোর পেছনে সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মতো সুনির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত যে কোনো পদক্ষেপই শরীয়াহ তথা ইসলামের উদ্দেশ্যের আওতাভুক্ত।

ইবনে কাইয়ুম (রহ.) তাঁর বিখ্যাত ‘সিয়াসাহ আস-শরীয়াহ’ গ্রন্থে তো আসলে এ কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, সকল আইনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার

প্রতিষ্ঠা, জনগণের কল্যাণ সাধন, তাদেরকে দুর্নীতি ও ক্ষতিকর কোনো কিছু থেকে দূরে রাখা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত যে কোনো উপায় কিংবা পদ্ধতিই ইসলাম ও শরীয়াহর অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মদ ইউনুস: তারমানে, হুদুদ এবং ইসলামী আইনের আইনের বাহ্যিক কাঠামোর চেয়ে এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হওয়াটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই নয় কি?

হাশিম কামালী: আপনি যদি আমাকে এমন প্রক্রিয়ায় হুদুদ প্রয়োগ করতে বলেন, যা স্পষ্টত জুলুম; তাহলে আমি তা করতে রাজী নই। বরং আমি এমন একটা পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো, যার মাধ্যমে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিশেষ করে সমাজের বাস্তবতা যদি এমন হয়, যেমন যুদ্ধাবস্থা ইত্যাদি। মহানবী (সা.) ও খেলাফতে রাশেদার যুগে যুদ্ধাবস্থায় হুদুদ প্রয়োগ স্থগিত রাখা হতো।

মুহাম্মদ ইউনুস: ভেরি ইন্টারেস্টিং!

হাশিম কামালী: হ্যাঁ। স্থগিত রাখার কারণটা বলি। যেমন, একবার এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর আসলো যে কিছু সৈন্য মদ্যপান করছে। তাদেরকে শাস্তি দেয়া উচিত হবে কি না, তা জানতে চাওয়া হলো। এই জিজ্ঞাসার যে জবাব দেয়া হয়েছিল তার সারকথা হলো, মদ্যপানের শাস্তি কার্যকরের চেয়ে শত্রুপক্ষের নিকট একজন সৈনিকের পরাজিত হওয়াটা ইসলামের জন্য বেশি ক্ষতিকর।

মুহাম্মদ ইউনুস: খুবই ইন্টারেস্টিং! তারমানে অনুশোচনা ও ক্ষমার একটি দিকও রয়েছে। কিন্তু রাজনীতিবিদরা যখন হুদুদ নিয়ে কথা বলেন, তখন তারা অনুশোচনা ও ক্ষমার দিকটি পুরোপুরি এড়িয়ে যান। ফলে সাধারণ মানুষের ধারণা, হুদুদ খুবই কঠোর ও নিষ্ঠুর একটি শাস্তি। এ ব্যাপারে কিছু বলুন, প্লিজ।

হাশিম কামালী: নিশ্চয়। কোরআনের বর্ণনার আলোকেই এটি হুদুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan' শিরোনামে আমার লেখা একটি বই ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটিতে আমি কেলান্তান প্রদেশের হুদুদ বিলের উপর একটি পর্যালোচনা করেছি। হুদুদ নিয়ে কোরআনের বর্ণনার সাথে ওই বিলটি মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

চলুন দেখা যাক অনুশোচনা প্রসঙ্গে কোরআন কী বলেছে। হুদুদ নিয়ে কোরআনে

৪/৫টি আয়াত রয়েছে। অপরাধ ও অপরাধের শাস্তির বিধান একইসাথে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, অপরাধী যদি অনুশোচনা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দেন, তিনিও মানুষের অনুশোচনা শোনেন। এটাই হলো হুদুদ নিয়ে কোরআনের আয়াতগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেখানেই খুঁজেন, এ ধরনের কথাই কোরআনে পাবেন।

এখানে আমার একটি প্রশ্ন আছে। হুদুদ সম্পর্কিত কোরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রতিফলন কোথায়? আমাদের আইনশাস্ত্রের পুরো ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখবো, হুদুদকে আমরা একটি নির্ধারিত ও বাধ্যতামূলক শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করেছি। অথচ কোরআনকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে দেখলে বুঝা যাবে, অনুশোচনা, সংশোধন ও ক্ষমার সুযোগ সেখানে আছে। কিন্তু হুদুদ আইনের ক্ষেত্রে কোরআনের এই প্রশস্ততাকে বিবেচনা করা হয়নি। প্রচলিত আইন অনুযায়ী, অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পর যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে হদ প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে বিচারকের সতর্কতাকে উপেক্ষা করা হয়। হুদুদ সম্পর্কে কোরআনে আমি যা পেয়েছে, তার সাথে এটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মুহাম্মদ ইউনুস: এসব নিয়ে আসলে সমাজে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। দেশের সিভিল আইন তথা দণ্ডবিধি পর্যালোচনা করলে আপনি দেখতে পাবেন, তাতে কোনো অপরাধের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান রাখা আছে। এর পাশাপাশি বিচারককেও নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করে শাস্তি নির্ধারণের এখতিয়ার দেয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে চুরির কথাই বলা যাক। অপরাধী অন্যায়টি প্রথমবারের মতো করে থাকলে, কিংবা অপরাধী অল্পবয়স্ক হলে বিচারক নিজস্ব বিবেচনায় রায় দিতে পারেন।

কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আপনি যেটা বলেছেন, অর্থাৎ ন্যায়বিচারের এইসব মূলনীতি ও ধারণাসমূহ কোরআনে ইতোমধ্যেই বলা আছে। কোরআনে একদিকে কঠোর শাস্তির কথা যেমন বলা হয়েছে, অন্যদিকে ক্ষমার কথাও বলা হয়েছে। তাহলে আপনার উপসংহার হলো, নিজস্ব বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী রায় নির্ধারণের সুযোগ কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দিয়েছেন। তাই তো?

হাশিম কামালী: 'হদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ সীমা। এর নিচের পর্যায়কে 'তাজীর' বলা হয়। হদ প্রয়োগের সবগুলো পূর্বশর্ত যদি যথাযথভাবে পূরণ করা যায়, সন্দেহাতীতভাবে যদি অপরাধ প্রমাণ করা যায়, তাহলে তা প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হদ প্রয়োগের পূর্বশর্তগুলো পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন।

তখন হদ প্রয়োগ না করে তাজীর প্রয়োগ করতে হয়। শাস্তির যে বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে, এ কথাটিই আমরা জোর দিয়ে বলে আসছি। সেক্ষেত্রে হদ হচ্ছে সর্বোচ্চ শাস্তি। আর শাস্তির অন্যান্য পর্যায়গুলোর মধ্যে নমনীয়তা রয়েছে।

মুহাম্মদ ইউনুস: মোটকথা হলো, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং...

হাশিম কামালী: সেটাই। তাজীরের ক্ষেত্রে বিচারকদের নিজস্ব বিবেচনা কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। অপরাধীর সার্বিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে বিচারক তেমন ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন, যার মাধ্যমে অপরাধীকে অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

মুহাম্মদ ইউনুস: হুদুদ নিয়ে আরেকটা অস্পষ্টতা রয়েছে। আপনি সম্ভবত এটি দূর করতে পারবেন। কোরআন পড়ে আমি যা বুঝেছি, চারটি সুনির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রেই শুধু হুদুদের বিধান রয়েছে। ‘Freedom, Justice and Equality in Islam’ এবং ‘Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments’ শীর্ষক দুটি বইয়ে আপনিও তা বলেছেন। কিন্তু ফিকহী আলোচনায় ফিকাহবিদরা কোরআনে বর্ণিত এই চারটি অপরাধের বাইরেও অন্যান্য অপরাধকে হুদুদের আওতায় নিয়ে আসছেন। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, আমি এটি খেয়াল করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কেন?

হাশিম কামালী: হ্যাঁ, সত্যিই এমনটি ঘটছে। অথচ কোরআনে যে চারটি নির্দিষ্ট অপরাধের কথা বলা হয়েছে, এরমধ্যে একটি অপরাধের ক্ষেত্রে আবার সন্দেহ রয়েছে যে তা আসলেই হদ প্রয়োগের আওতায় পড়ে কি না। সেই অপরাধটি হচ্ছে মদপান। কোরআনে মদপানকে অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে বটে। তবে নির্দিষ্ট কোনো শাস্তির কথা বলা হয়নি।

মুহাম্মদ ইউনুস: সেই চারটি অপরাধ কী কী?

হাশিম কামালী: সেগুলো হচ্ছে চুরি, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ এবং মদপান। মদপানের ব্যাপারে কোরআনে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদার লোকেরা! মদ, জুয়া, বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়কারী শর হচ্ছে

ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা বর্জন করো, আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।”

[সূরা মায়েদা: ৯০]

মদ, জুয়া ইত্যাদিকে ঘৃণিত কাজ অভিহিত করে এগুলো থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো শাস্তির কথা এখানে বলা হয়নি। কেউ যদি হুদুদের বিধান ভালো করে বুঝে থাকে তাহলে সহজেই সে ধরতে পারবে, মদপানের অপরাধ হুদুদের আওতাধীন নয়। যদিও ফিকাহবিদরা একে হুদুদের আওতাভুক্ত করেছেন। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়, উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) শাসনামলে মদপানের জন্য চল্লিশটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়েছিল। যা পরবর্তীতেও...। একে রাষ্ট্রীয় আইন (সিয়াসাহ শরীয়াহ) বলা যায়। কিন্তু এটি হুদুদ নয়। এটি তাজীরের পর্যায়ে পড়ে।

মুহাম্মদ ইউনুস: আচ্ছা, ধর্মত্যাগের ব্যাপারে কী বলবেন? এটি কি হুদুদের আওতাভুক্ত?

হাশিম কামালী: না। এটি হুদুদের আওতাভুক্ত নয়। ইদানীং ধর্মত্যাগ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হচ্ছে। কিন্তু কোরআনে আপনি দেখবেন, ধর্মত্যাগের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ২০/২১টি আয়াত রয়েছে। যারা ইসলাম বা ঈমান ত্যাগ করেছে, সেইসব অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে কোরআন নিরবচ্ছিন্নভাবে বলে গেছে। কিন্তু কোরআনের কোথাও নির্দিষ্ট কোনো শাস্তির কথা বলা হয়নি।

মুহাম্মদ ইউনুস: কিন্তু এ ব্যাপারে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হলো— ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!

হাশিম কামালী: এ ব্যাপারে একটা হাদীস আছে, যেখানে সিম্পলি বলা হয়েছে, من بدل دينه فاقتلوه (কেউ যদি তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করা উচিত)। আমি হাদীসটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি। হাদীসটিতে সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। যেমন, ‘কেউ যদি তার ধর্ম পরিবর্তন করে’ হাদীসের এই বর্ণনা আমলে নিলে বলতে হয়, একজন ইহুদী যদি হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহলে তাকেও হত্যা করা উচিত! অথচ এ ধরনের উদ্দেশ্য যে হাদীসটির ছিল না, তা সহজেই বোধগম্য। তাছাড়া এটি ‘মুতাওয়াতির’ হাদীস নয়। এটি একটি ‘আহাদ’ হাদীস। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের শর্ত পূরণের জন্য এ ধরনের হাদীস যথেষ্ট নয়।

মুহাম্মদ ইউনুস: তাছাড়া কোরআনেও তো ধর্মত্যাগীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই...।

হাশিম কামালী: হ্যাঁ, কোরআনেও তা বলা নেই। আসলে উল্লেখিত হাদীসটির ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। আমি খুব সংক্ষেপে তা বলছি। মহানবীর (সা.) জীবনকালের শেষ ৯/১০ বছরে ছোট-বড় মিলিয়ে ২৬/২৭টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সময়টা তখন যুদ্ধের ডামাঢোলের মধ্যেই ছিল। কোনো নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়ার সুযোগ তখন ছিল না। এমতাবস্থায় দেখা গেলো, মদীনার কিছু লোক ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। ফলে এই ধরনের লোকদেরকে মহানবী (সা.) নিষিদ্ধ করলেন। কারণ, এটা ছিল সুস্পষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

মুহাম্মদ ইউনুস: হ্যাঁ, এটা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাহলে আপনার কথার সারমর্ম হলো— নিছক ধর্মত্যাগের কারণে মৃত্যুদণ্ডের কোনো বিধান কোরআনে নেই। তবে হাদীসে এটিকে তখনকার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া হয়েছিল।

যাই হোক, আরেকটি শাস্তি নিয়ে লোকদের মাঝে বিভ্রান্তি লক্ষ করা যায়। সেটি হলো যিনা তথা ব্যভিচারের শাস্তি। কোনো বিবাহিত নারী বা পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে বলে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকেই একে খুব নিষ্ঠুর বলে সমালোচনা করেন। কোরআনে কি এই শাস্তির ব্যাপারে কিছু বলা আছে?

হাশিম কামালী: কোরআনে একটি শাস্তির কথাই বলা আছে। সেটা হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। পাথর নিক্ষেপে হত্যা তথা রজমের বিধানটি হাদীসে পাওয়া যায়। মহানবীর (সা.) সময়ে সেটা কার্যকর ছিল। তবে এটা নিয়ে আরো কথা আছে। সূরা নূরে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই সূরাটি নাযিল হয়েছে একদম শেষ পর্যায়ে, মহানবীর (সা.) ওফাতের ২/১ বছর আগে।

এই সূরা নাযিলের আগে যিনার অপরাধের জন্য মহানবী (সা.) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিধান প্রয়োগ করেছেন। পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধানটি তাওরাতে বর্ণিত। আর তাওরাত ও বাইবেলের বর্ণনাকে আল্লাহর বিধান হিসেবে কোরআন স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই কোরআনে এই অপরাধের শাস্তির বিধান আসার আগ পর্যন্ত তাওরাতকে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করা মহানবীর (সা.) জন্য অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু সূরা নূর নাযিলের পর কোরআনের বিধান হিসেবে ১০০ বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইউনুস: তাহলে পাথর নিক্ষেপের পরিবর্তে ১০০ বেত্রাঘাতই হলো নির্ধারিত শাস্তি?

হাশিম কামালী: হ্যাঁ, তবে মহানবীর (সা.) মৃত্যুর পর খলিফাগণও ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজম প্রয়োগ করেছেন কিনা, তা নিয়ে অবশ্য বির্তক রয়েছে। যদিও সহীহ বুখারীতে প্রাসঙ্গিক একটি হাদীস রয়েছে। একবার সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফকে (রা.) একজন তাবেয়ী জিজ্ঞেস করলেন, মায়েজ (রা.) এবং গামেদী গোত্রের ওই মহিলার (রা.) ঘটনা কি সূরা নূর নাযিলের আগে ছিল, নাকি পরে ছিল? উল্লেখ্য, তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। সাহাবী জবাব দিলেন, আমি জানি না। আমি নিশ্চিত নই।

সুতরাং, এখন এ ধরনের বিচারের ক্ষেত্রে পূর্বের বিধানের পরিবর্তে কোরআনে বর্ণিত ১০০ বেত্রাঘাতের শাস্তিই প্রযোজ্য হবে। আমি মনে করি, কোনো বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে আমাদেরকে কোরআনের দিকেই ফিরে যেতে হবে। যেহেতু এটি সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে মহানবীর (সা.) একটি হাদীসও রয়েছে। তিনি বলেছেন, ادرئوا الحدود بالشبهات (ন্যূনতম সংশয় থাকলেও হুদুদ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকো)।

উল্লেখিত মায়েজের (রা.) ঘটনার ক্ষেত্রে যেটা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে সেটা হলো, ঘটনাটি সূরা নুর নাযিলের আগে নাকি পরে। আরেকটি বিষয় হলো ইজতিহাদ অবলম্বন না করে নিছক আক্ষরিক অর্থে হুদুদ প্রয়োগ করলে একটা সংশয় থেকেই যায়। অথচ কোরআন ও সুন্নাহর দাবি হলো, সমাজ ও সময়ের বাস্তবতার সাথে শরীয়াহ আইনকে সমন্বয় করা। যদিও এই ব্যাপারটি এখন করা হচ্ছে না। কেলান্তান প্রদেশের প্রস্তাবিত হুদুদ আইনের কথাই ধরা যাক। সেখানে ছয়টি শাস্তিকে হুদুদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আমার মতে, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ধর্মত্যাগ এবং মদপান— এই শাস্তিগুলো হুদুদের আওতায় পড়ে না।

মুহাম্মদ ইউনুস: তারমানে এই হুদুদ বিলটি নিয়ে আরো আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে?

হাশিম কামালী: আমি বলবো, কোনো ধরনের ইজতিহাদ না করে নিছক ফিকাহর বইপত্র ঘেঁটে এই বিলটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ জন্য আমি বলে থাকি, হুদুদ প্রয়োগের যে নানান ধরন ও প্রেক্ষাপট রয়েছে, তার উপর আমাদের নজর ফেরাতে হবে। আমরা সত্যিকার অর্থে ইসলামের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন করতে চাইলে মহানবীর (সা.) সেই নীতি অনুসরণ করতে হবে, যেখানে শাস্তি প্রয়োগের বেলায় ন্যূনতম বিকল্প গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। অথচ এখন সর্বোচ্চ বিকল্পটাই গ্রহণ করা হচ্ছে!

মুহাম্মদ ইউনুস: আমাদের সময় খুব সংক্ষিপ্ত। তারপরও আপনাকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই। হুদুদ আইন কি ঈমানের অঙ্গ? এটি কি আকীদার অংশ? এই অর্থে যে একজন মুসলিম হিসেবে আমাকে এটি প্রতিষ্ঠা করতেই হবে?

হাশিম কামালী: না, তা নয়। ইসলামের মূলভিত্তি হলো এর পাঁচটি স্তম্ভ (আরকান)। আমরা সবাই সেগুলো জানি। তাছাড়া একটি শাস্তির বিষয় কখনো আকীদার অংশ হতে পারে না। হুদুদ ইসলামের কোনো রুকন নয়। এটি ঈমানের অঙ্গও নয়।

তারচেয়েও বড় কথা হলো একটি হাদীসে বলা হয়েছে, কোনো মুসলমানকে যদি শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেয়ার উপায় থাকে, তাহলে প্রথমে সেই উপায়টি খুঁজে বের করো।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস খেয়াল করলে আপনি দেখতে পাবেন, হুদুদ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে মহানবী (সা.) ও সাহাবীদের নিকট কেউ আসলে তিনি বার বার প্রশ্ন করে জানতে চাইতেন, ঘটনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পুরোপুরি নিশ্চিত কি না। এমন একটি ঘটনার বর্ণনাও হাদীসে পাওয়া যায়। আমার বইয়ে ঘটনাটি উল্লেখ করেছি। একবার এক ব্যক্তি মহানবীর (সা.) কাছে এসে বললো– আমাকে শাস্তি দিন, কারণ আমি যিনা করেছি। এ ঘটনার জন্য আমার তীব্র অনুশোচনা হচ্ছে। তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। মহানবীর (সা.) পেছনে দাঁড়িয়ে সবাই নামায আদায় করলেন। নামাযের পর লোকটি মহানবীকে (সা.) আবার বললো– আমি শাস্তি পেতে চাই। জবাবে মহানবী (সা.) বললেন– তুমি কি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়োনি? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে এটাই ছিল মহানবীর (সা.) কর্মনীতি। তিনি সবসময় ৩/৪ বার জিজ্ঞেস করতেন– তুমি কি ঘটনার ব্যাপারে নিশ্চিত? তোমার বোধহয় কোনো ভুল হচ্ছে। তুমি হয়তো...। এভাবে ন্যূনতম কোনো সংশয় থাকলেও তিনি হুদুদ প্রয়োগ না করার চেষ্টা করতেন।

মুহাম্মদ ইউনুস: খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয়। এটি নিয়ে আমাদের আরো আলোচনার অবকাশ রয়েছে। যাই হোক, হুদুদ নিয়ে চলমান বিতর্কে আমাদের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে সংক্ষেপে যদি আপনার অভিমত জানাতেন।

হাশিম কামালী: ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো হুদুদকে রাজনৈতিকীকরণ না করা। হুদুদকে বুঝতে হলে প্রথমে কোরআনের মর্মার্থকে সামগ্রিক অর্থে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। তারপরেই বুঝা যাবে, হুদুদ প্রকৃতপক্ষে

অপরিবর্তনযোগ্য কোনো ব্যাপার নয়। বরং অনুশোচনা ও সংশোধন ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে হুদুদের প্রচলিত ধারণার মধ্যে সংস্কার আনার সুযোগ রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে হুদুদের তাৎপর্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হলো, কোরআনের নির্দেশনা মোতাবেকই যে হুদুদ প্রয়োগ করতে হবে, এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। এর পাশাপাশি হুদুদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন পূরণ করা যায়, সে জন্যই আমাদেরকে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ন্যায়বিচার কিংবা অপরাধ দমন নয়, নিছক হুদুদের জন্যই হুদুদ প্রয়োগ করতে হবে, যেন এটি আকীদার অংশ— এ ধরনের মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। কোনো ধরনের শাস্তি বা যন্ত্রণা প্রদানকে ইসলাম কখনোই ঈমানের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেনি।

ইসলাম মানুষের জন্য রহমত, দয়া, ক্ষমা, এমনকি এগুলোর চেয়েও বেশি কিছু। আমাদের সমাজ কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে আলেমগণ হুদুদকে যেভাবে বুঝে থাকেন, সে ধরনের শাস্তি আরোপ করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়।

মৃত্যুদণ্ডই কি মুরতাদের একমাত্র শাস্তি?

তারিক রমাদান

অনুবাদ: আইয়ুব আলী

মুসলমানরা সচরাচর এমন কিছু ইস্যুর মুখোমুখি হয়ে থাকে, যেগুলো নিয়ে কথা বলতে তারা প্রস্তুত নয় কিংবা বিব্রতবোধ করে। উদাহরণ হিসেবে ধর্মত্যাগের বিধান তথা 'হুকমুর রিদ্দা'র কথা বলা যায়। 'কোনো মুসলমান ধর্মত্যাগ করতে পারে না'— এমনটা বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে অধিকাংশ আলেমই এর পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তাদের মতামতের পক্ষে দলীল হচ্ছে একটি হাদীস— 'যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করবে তাকে হত্যা করো।' আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি (মুসলিম) সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে যায়, তাকে হত্যা করা বৈধ।' এই হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে কিছু আলেম বলে থাকেন, 'এটা পরিষ্কার যে আপনি ধর্মত্যাগ করতে পারেন না।'

আমি এ বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন। তারপরও মনে করি, এই মতামত সঠিক নয়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার সুফিয়ান আস-সাওরীও এই মতামতকে সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

২০০৯ সালে প্রদত্ত 'The Scope and Limits of Reforming Islam' শীর্ষক একটি বক্তৃতা অনুষ্ঠানে একজনের প্রশ্নের উত্তরে ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অধ্যাপক তারিক রমাদান যে মতামত প্রদান করেছিলেন, এটি তার অনুবাদ।

প্রথমত, ধর্মত্যাগের কারণে রাসূল (সা.) কখনোই কাউকে হত্যা করেননি।

দ্বিতীয়ত, ব্যাপারটি যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শত্রুপক্ষের কেউ কেউ মুসলিম শিবিরের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতো। তারপর নিজেদের শিবিরে ফিরে যেতো। তারা ছিলো মূলত বিশ্বাসঘাতক। তাদের এই তৎপরতার সাথে প্রচলিত ধর্মত্যাগের কোনো সম্পর্ক নেই।

মহানবীকে (সা.) নিয়ে আমি একটি বই লিখেছি। সেটি লেখতে গিয়ে আমি রাসূলের (সা.) জীবদ্দশায় ধর্মত্যাগ সংক্রান্ত তিনটি ঘটনা খুঁজে পেয়েছি। এগুলো থেকে আমরা দেখতে পাই, নিছক ধর্মত্যাগের কারণে তিনি কাউকে হত্যা করেননি।

প্রায় বিশ বছর ধরে আমি এসব কথা বলে আসছি। এ কারণে কেউ কেউ, বিশেষ করে মরিশাসের মুফতি আমার ব্যাপারে বলেছেন, 'তারিক রমাদান একজন কাফের, মুরতাদ।' তখন ইসলামের ট্র্যাডিশন থেকে উদাহরণ দিয়ে আমি বললাম, 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? আমি তো নিজ থেকে কিছু বলিনি। অষ্টম শতাব্দীর আলেমগণ যা বলে গেছেন, আমি সেগুলোই বলছি মাত্র। আমি তো দলীল দিয়েছি। আমাকে বলুন, ধর্মত্যাগের কারণে রাসূল (সা.) কাউকে হত্যা করেছিলেন কিনা। আমাকে দেখান। আমি দেখতে চাই।' এখন পর্যন্ত আমি এর জবাব পাইনি।

মিশরের গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আলী জুমা সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্টের সহযোগী প্রকাশনা নিউজউইককে 'ধর্মবিশ্বাস' (faith) সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'কেউ সজ্ঞানে ধর্মত্যাগ করলে তাকে হত্যা করতে হবে— এমনটা আপনি বলতে পারেন না। এটা একান্তই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি এমন কাউকে হত্যা করতে পারেন না।' এই বক্তব্য প্রকাশের দুইদিন পর মিশরের দারুল ইফতা কাউন্সিল তাদের নিকট একটা বিবৃতি পাঠায়। এতে বলা হয়, 'তার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।' তারপরের ঘটনা বেশ মজার। এর পরদিন শায়খ জুমা একটি বিবৃতি পাঠান, যাতে বলেন, 'না (ভুল ব্যাখ্যা করা হয়নি), আমি নিজেই এই বক্তব্য দিয়েছি।'

আমি মনে করি, এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে আলেমদের এগিয়ে আসা উচিত। ইসলামী ট্র্যাডিশনের অধিকাংশ আলেম ধর্মত্যাগীদেরকে হত্যা করার কথা বলেছেন, এটা সত্য। কিন্তু সেই অষ্টম শতাব্দীর একজন আলেমও এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। যদিও এ ধরনের আলেমদের

সংখ্যা কম ছিলো; কিন্তু আমাদের অবস্থান হওয়া উচিত ইসলামের প্রামাণ্য উৎস ও দলীলের ভিত্তিতে।

আমি নিজে ঠিক এটাই করার চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো—স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্যক্তিকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। কেউ ইসলাম ত্যাগ করলে অবশ্যই আমি খুশি হবো না। কিন্তু দিনশেষে এটা ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার। বরং আমার নিজেকেই প্রশ্ন করা উচিত, 'তাদেরকে আমরা কী ধরনের শিক্ষা দিয়েছি!' মুসলমানদের এটা পরিষ্কার করে বলা উচিত। কিন্তু তারা তা করছে না। তারা খ্রিস্টানদের ইসলাম গ্রহণের স্বাধীনতা থাকা উচিত বলে মনে করে। অথচ নিজেদের জন্য প্রযোজ্য অনুরূপ বিষয়ে তারা নিশ্চুপ। এটি এক ধরনের স্ববিরোধিতা।

ভবিষ্যতে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া। এতে আশঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই...। এটি যদি হক হয়, তাহলে এতে অসুবিধারও কিছু নেই। উসূল বা মূলনীতি নিয়ে স্ববিরোধিতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার, যা আজকাল হচ্ছে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মত্যাগ কি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ?

জামাল বাদাবী

অনুবাদ: মাসউদুল আলম

১. ভূমিকা

রিদ্দা একটি আরবী পরিভাষা, যার শাব্দিক অর্থ দল বা ধর্ম ত্যাগ করা, অথবা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া।[১] কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম যদি ইসলামের প্রতি বিশ্বাস থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়, তাহলে সেটি বুঝাতে ইসলামী আইনশাস্ত্রে এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। রিদ্দার শাস্তির ব্যাপারে গত প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে ফকীহদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা গেছে। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে, মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের সংহতি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হওয়ার কারণে রিদ্দা একটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোরআন ও হাদীসের আলোকে উক্ত অভিমতসমূহের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা। প্রবন্ধটির শুরুতে গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। তারপর ইসলামী শরীয়াহর প্রাথমিক উৎসদ্বয় তথা কোরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের সংশ্লিষ্ট দলীল-প্রমাণসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। মহানবীর (সা.) ইন্তেকালের পর তাঁর সাহাবীগণ এ বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোও সংক্ষেপে বলা

---

[১] বায়ালবাকী, রুহী, আল-মাওরিদ: অ্যা মডার্ন অ্যারাবিক-ইংলিশ ডিকশনারি, দারুল ইলম লিল-মালায়ীন, বৈরুত, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৫৮২।

হয়েছে। পরিশেষে এ কথা বলে উপসংহার টানা হয়েছে যে নিছক ইসলাম পরিত্যাগই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ— এমন দাবির পক্ষে চূড়ান্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২. গবেষণার পদ্ধতি

ধর্মত্যাগ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয় বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সুস্পষ্ট ও কার্যকর একটি মেথডলজি ঠিক করা বেশ জটিল কাজ। উপরন্তু, ধর্মত্যাগ বা রিদ্দার বিষয়ে মতবিরোধের পরিধি বেশ বিস্তৃত। আইনী যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ইসলামী আইনশাস্ত্র কয়েক শত বছরের চর্চার মাধ্যমে নিজস্ব মেথডলজি গড়ে তুলেছে। অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই শাস্ত্রটি 'উসূলে ফিকাহ'[২] বা ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি হিসেবে পরিচিত। গভীর আলোচনায় না গিয়ে উসূলে ফিকাহর শুধু উল্লেখযোগ্য ও মৌলিক কিছু সাধারণ নিয়ম তুলে ধরা হলো:

ক) মুসলমানদের কোনো তৎপরতাই প্রকৃত ইসলামের সমমান সম্পন্ন নয়। এমনকি তা ইসলামের নামে বা আল্লাহর নামেও যদি করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত ইসলামকে শুদ্ধতা নিরূপণের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

খ) প্রকৃত ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষার এক নম্বর ভিত্তি হলো ইসলামের সর্বপ্রধান উৎস আল-কোরআন। কোরআনের পরেই দ্বিতীয় উৎস হিসেবে রয়েছে হাদীস, 'সুন্নাহ'[৩] পরিভাষা দিয়েও যাকে বুঝানো হয়। ইসলামী শিক্ষার মর্ম অনুধাবন ও বাস্তবায়নের দিক থেকে মহানবীর (সা.) কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়।[৪] হাদীসকে রেফারেন্স হিসেবে নেয়ার ক্ষেত্রে এর বিশুদ্ধতাকে যথাযথ সতকর্তার সাথে বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক।

---

[২] এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: কামালী, মোহাম্মদ হাশিম, প্রিন্সিপালস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, ইসলামিক টেক্সটস সোসাইটি, ক্যামব্রিজ, ১৯৯১।

[৩] হাদীস ও সুন্নাহর মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে বলে কোনো কোনো আলেমের অভিমত থাকলেও অধিকাংশই এ দুটি পরিভাষাকে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন: আল-সালেহ, সুবহি, উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহ (আরবী), দারুল ইলম লিল-মালায়ীন, বৈরুত, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ৩, ১১।

[৪] আইন বিষয়ক সুন্নাহ (আস-সুন্নাহ আত-তাশরিয়্যাহ) ও আইন নিরপেক্ষ সুন্নাহর পার্থক্য জানতে দেখুন: কামালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫৭। আরো দেখুন: আল-সালেহ, সুবহি, মাবাহিত ফি উলুমুল কোরআন, দারুল ইলম লিল-মালায়ীন, বৈরুত, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. ৩৪-৩৫।

ইসলামী শিক্ষার উৎসগুলোর এই ক্রমসোপান বিবেচনায় রেখে আমরা আমাদের প্রথম ক্রিটিক্যাল প্রশ্নটির জবাব খোঁজা শুরু করতে পারি। প্রশ্নটি হলো— ধর্মত্যাগীর সর্বোচ্চ শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে কোরআনে কোনো দলীল আছে কি?

৩. কোরআনের দলীল-প্রমাণ যাচাই

ধর্মত্যাগীকে দুনিয়াবী শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত কোনো আয়াত কোরআনে নেই। ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে কোরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোতে কেবল পরকালে আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিচের আয়াত দুটি দেখুন:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

> "তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[৫]
>
> [সূরা বাকারা ২:২১৭]

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

> "যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে কাফের হয়ে গেছে, তারপর পুনরায় মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়ে গেছে এবং দিন দিন কুফুরীর পরিমাণ বাড়িয়েই চলেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না, সঠিক পথও দেখাবেন না।"
>
> [সূরা নিসা ৪:১৩৭]

উপরের আয়াত থেকে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, কোরআন যদি ধর্মত্যাগের জন্য

---

[৫] লেখক কোরআনের ইংরেজি অনুবাদ নিয়েছেন মূলত মুহাম্মদ আসাদের 'দ্যা ম্যাসেজ অব দ্যা কোরআন', দারুল আন্দালুস, জিব্রাল্টার, ১৯৮৪ সংস্করণ থেকে। বোধগম্যতার স্বার্থে তিনি সামান্য কিছু পরিমার্জনও করেছেন। আমরা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা মুজিবুর রহমান ও হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ কৃত বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করেছি। লেখকের মতো আমরাও অনুবাদের ভাব ঠিক রেখে বোধগম্যতার স্বার্থে ভাষাগত কিছু পরিমার্জন করেছি। — অনুবাদক

মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশনা দিতো, তাহলে প্রথমবার ধর্মত্যাগের পরেই ধর্মত্যাগীকে হত্যা করা হতো। ফলে "তারপর পুনরায় মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়ে গেছে এবং দিন দিন কুফুরীর পরিমাণ বাড়িয়েই চলেছে"— এ ধরনের কোনো সুযোগই কেউ পেতো না। আরো উল্লেখ্য, উপরে বর্ণিত আয়াতে বার বার ধর্মত্যাগের যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, এমনটি কেউ করলেও মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য নৈতিক বা আইনগতভাবে বৈধ কোনো নিদের্শনা বা নির্দেশ দেয়া হয়নি।[৬]

ধর্মত্যাগের জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ব্যাপারে কোরআনের এই নীরবতা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আরো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে বিবেক, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতার পক্ষে কোরআনে অসংখ্য দলীল রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ

"আর বলে দাও, সত্য এসেছে তোমাদের রবের নিকট হতে, কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।"
[সূরা কাহাফ ১৮:২৯]

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।"
[সূরা বাকারা ২:২৫৬]

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ - لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

"কাজেই তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও, তুমি একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও।"
[সূরা গাশিয়াহ ৮৮:২১-২২]

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

[৬] ধর্মত্যাগ সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতের জন্য দেখুন: সূরা ইমরান: ৩:৬২, ৮৬, ৯০; সূরা মায়েদা: ৫: ৫৪; সূরা তওবা: ৯: ৭৩-৭৪; সূরা নাহল: ১৬:১০৬ এবং সূরা মুহাম্মদ: ৪৭:২৫।

> "যদি এরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি বলো— আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছি; তারপর কিতাবধারী ও মূর্খদেরকে (মুশরিক) জিজ্ঞেস করো— তোমরা কি সবাই আত্মসমর্পণ করছো? যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে তো তারা সঠিক পথ পেয়েই গেলো; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল (আমার কথা) পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ বান্দাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন।"
>
> [সূরা আলে ইমরান ৩:২০]

এগুলোসহ কোরআনের আরো অনেকে আয়াত রয়েছে, যেগুলো মানুষের স্বাধীন সত্তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি নিজস্ব খেয়াল-খুশি মতো আইন ভঙ্গ বা অপরাধ না করে। এই আয়াতগুলো 'ইসলাম' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, স্বাধীন ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত থেকে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মাধ্যমে এবং তাঁর রহমত ও পথনির্দেশ লাভের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা, অন্তরের প্রশান্তি লাভ করা এবং আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিকূল তথা মানুষ, প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করা।

যদি কাউকে জোর করে মুসলিম বানানো হয়, কিংবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমান হিসাবে থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে এই শান্তি লাভ করা রীতিমতো অসম্ভব।

হ্যাঁ, কাউকে জোর করে মুসলমান বানানো হয়নি, তবে কেউ স্বেচ্ছায় একবার ইসলাম গ্রহণ করে ফেললে তা পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ— এ ধরনের কথা বলাটাও অসঙ্গত। বিশ্বাসের স্বাধীনতা সংক্রান্ত কোরআনের অসংখ্য আয়াতের সাথে এ ধরনের যুক্তি কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, বিশ্বাস হলো হৃদয়ের গভীর থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা বা কোনো কিছুর উপর আস্থা স্থাপন করার স্বতস্ফূর্ত এক অনুভব। যদি নিছক ব্যক্তিগতভাবে ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদানের কথা বলা হয়, তাহলে এটি হবে ধর্মের 'বলপূর্বক' নিয়মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক নিয়ম। এটি বিবেকের স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত লঙ্ঘন, যা কোরআনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তাছাড়া, এ ধরনের শাস্তির ভয় অনেককে মুনাফেকীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এর ফলে এ ধরনের লোকেরা নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যই শুধু নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেবে। চূড়ান্ত বিচারে— ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তো বটেই— সমাজের জন্য ধর্মদ্রোহিতার চেয়ে মুনাফেকী আরো বেশি বিপজ্জনক সমস্যা।

মুসলিম পরিচয়দানকারী মুনাফেক দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি।

আরেকটি অদ্ভূত যুক্তি দেয়া হয় যে "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই" [সূরা বাকারা ২:২৫৬] শীর্ষক আয়াতটি নাকি রহিত করা হয়েছিলো। অথচ আমরা জানি, অন্য আরো অনেক আয়াতের মতো এই আয়াতটিও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকার মূলনীতিকে নিশ্চিত করে। তাই কট্টরপন্থীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এই আয়াতটির 'রহিতকরণের' মাধ্যমে এ ধরনের অন্য সকল আয়াতও রহিত হয়ে গেছে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো, যে কোনো ধরনের নাসখের (নাসখ অর্থ বাতিল, আরো সঠিকভাবে বললে স্থলাভিষিক্তকরণ) দাবিকে অতি অবশ্যই সতর্কতার সাথে খতিয়ে দেখা উচিত। সম্পূর্ণ কোরআন নিশ্চিতভাবেই অথেন্টিক এবং অবিকৃতভাবে সুসংরক্ষিত (ক্বাতঈ ছুবুত)। তাই যে কোনো নাসখের দাবিকে অতি অবশ্যই সুনিশ্চিত হতে হবে। নিছক মতামত বা আন্দাজ-অনুমাননির্ভর হলে হবে না। ইবনে হাজার আসকালানীর একটি কথা ইমাম সুয়ূতী উদ্ধৃত করেছেন,

"নাসখের ক্ষেত্রে কোরআনের কোনো ব্যাখ্যাকারের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি যারা বিশুদ্ধ বর্ণনা ও সুস্পষ্ট দলীল ছাড়া ইজতিহাদ করেছেন তাও গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু, মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় কোনো বিধান বাতিল করে এর পরিবর্তে অন্য আরেকটি বিধান চালু করার সাথে নাসখের বিষয়টি সম্পর্কিত। তাই, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাদীস ও ইতিহাসই কেবল গ্রহণযোগ্য। এছাড়া কারো মতামত বা ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়।"[৭]

কোরআনের কয়েক ডজন আয়াত রহিত করা হয়েছিলো বলে কয়েকজন স্কলার দাবি করলেও অধিকাংশ স্কলার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। উসূলে কোরআনের বিখ্যাত স্কলার জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহিত আয়াতের সংখ্যা ১৯-এ কমিয়ে এনেছেন। অন্যদিকে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী এবং সুবহি আল-সালেহের মতো স্কলারগণ রহিতকৃত আয়াতের সংখ্যা আরো কমিয়েছেন।[৮] সুয়ূতী, শাহ

---

[৭] আল-সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন, আল-ইতক্বান ফিল উলুমুল কোরআন, আল-হালাবী, কায়রো, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৭৮, খণ্ড ২, পৃ, ৩২।

[৮] দেখুন: আল-সালেহ, সুবহি, মাবাহিছু ফি উলুমিল কোরআন, দারুল ইলমি লিল-মালায়ীন, বৈরুত, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. ২৭২-২৭৪।

ওয়ালিউল্লাহ, বা আল-সালেহ কর্তৃক উল্লেখিত এসব রহিত আয়াতের তালিকার কোনোটিতেই ধর্মে জবরদস্তি না থাকা সম্পর্কিত আয়াতটি নেই।

ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি প্রাথমিক মূলনীতি হলো কোরআনের কোনো আয়াত বাতিল হতে পারে শুধু কোরআনেরই অন্য কোনো আয়াত দ্বারা, কিংবা রাসূলের (সা.) শিক্ষার আলোকে সরাসরি, অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট কোনো সুন্নাহ অনুযায়ী।

এটা একদম সুস্পষ্ট যে এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত দলীল নেই। নিছক ধর্মত্যাগ করার কারণেই কাউকে শাস্তি দেয়া উচিত— এমন দাবির পক্ষে অন্তত কোরআনে মোটেও কোনো দলীল নেই।[৯] ধর্মত্যাগ যে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ নয়— কোরআনে দলীল না থাকার ব্যাপারটিই এই অনুমানকে বৈধতা প্রদান করে।

পরবর্তী ক্রিটিক্যাল প্রশ্নটি হলো এ ব্যাপারে হাদীসে সুস্পষ্ট কোনো দলীল আছে কিনা। এই ইস্যুটি এখন আলোচনা করা হবে।

৪. হাদীসের দলীল-প্রমাণ যাচাই

মহানবীর (সা.) কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে, কোরআনের পরেই ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হলো বিশুদ্ধ হাদীস। তাই আলোচ্য বিষয়ে জরুরি প্রশ্নগুলো হলো:

ক. মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় ধর্মত্যাগের কোনো বর্ণনা কি পাওয়া যায়?

খ. এ ধরনের কোনো বর্ণনা থেকে থাকলে সেগুলোর বিশুদ্ধতার মাত্রা কতটুকু?

গ. যদি কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলে মহানবী (সা.) কি সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন?

ঘ. মহানবী (সা.) এ ধরনের ঘটনা কীভাবে সামলেছেন? এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য বা পদক্ষেপ কী ছিলো?

---

[৯] কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি প্রদানের কথা কোরআনে (সূরা তওবা: ৯:৭৪) বলা হয়েছে। তবে কোরআন-হাদীসের পাঠ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত উভয় দিক থেকেই আয়াতটির উদ্দেশ্য মুনাফিকরা, ধর্মত্যাগীরা নয়। ঈমানের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মুনাফিকরা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করে যেতো। তাই তাদেরকে ‘ধর্মত্যাগী’ বলা হতো না। এক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হলো, মুনাফিকদের ঈমান গ্রহণের দাবি মেনে নেয়া এবং ইহজগত ও পরজগতে তাদের শাস্তির বিষয়টি একান্তভাবে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া।

ঙ. মহানবী (সা.) কর্তৃক গৃহীত সেইসব ব্যবস্থা গ্রহণকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে? এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত কিছু নিয়মকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। এরমধ্যে একটি নিয়ম হলো— কোনো হাদীস যদি সত্যিকার অর্থে কোরআনের সাথে কিংবা আরো বিশুদ্ধ কোনো হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত হবে না।

এই প্রশ্নগুলোর এক ধরনের সমন্বিত জবাব নিচে দেয়া হলো।

তওবা করতে অস্বীকারকারী কয়েকজন ধর্মত্যাগীকে আল্লাহর রাসূল (সা.) হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এই সবগুলো বর্ণনাকেই হাদীস বিশারদগণ দুর্বল (অবিশুদ্ধ) বলে মনে করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিখ্যাত হাদীস বিশারদ মুহাম্মদ আল-শাওকানী [মৃত্যু: ১২৫৫ হিজরী] এই হাদীসগুলোর ইসনাদের (হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক পরম্পরা) সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ কারণে এই হাদীসগুলো, বিশেষত মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির মতো গুরুতর বিষয়ে নির্ভরযোগ্য নয়।[১০] এই হাদীসগুলোর কোনোটিই পূর্ববর্তীদের কর্তৃক বর্ণিত হয়নি এবং বুখারী ও মুসলিমের মতো তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসের উৎসগুলো থেকে এ সমস্ত হাদীসের অবস্থান বেশ দূরে।

তবে ধর্মত্যাগের ঘটনা সংক্রান্ত একটি হাদীস সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীসের গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে আরো এক ধাপ বেশি নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী ইসনাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এটি ধর্মত্যাগ সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। ধর্মত্যাগীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষের লোকেরাও বরাবর এই হাদীসটির উদ্ধৃতি দেয়। নিচে এর অনুবাদ ও এ সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

প্রথম হাদীস:

> জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, এক বেদুইন ইসলামের জন্য আল্লাহর রাসূলের (সা.) প্রতি অনুগত থাকার বাইয়াত গ্রহণ করলো (অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করলো)। তারপর সে জ্বরে আক্রান্ত হলে রাসূলকে (সা.) বললো, "আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন।" কিন্তু রাসূল (সা.) সম্মত হলেন না। বেদুইনটি আবার তাঁর কাছে এসে বললো, "আমার

---

[১০] আল-শাওকানী, মুহাম্মদ বিন আলী, নাইলুল আওতার, দারুল জীল, বৈরুত, ১৯৭৩, খণ্ড-৮, পৃ. ২-৩।

> বাইয়াত বাতিল করে দিন।" কিন্তু রাসূল (সা.) সম্মত হলেন না। তারপর বেদুইনটি মদীনা ত্যাগ করলো। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, "মদীনা হলো এক জোড়া হাপরের মতো। এটি তার দূষিত উপাদানগুলো বের করে দেয় এবং কল্যাণগুলোকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়।"[১১]

কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন— মদীনা পরিত্যাগ নয়, বরং বাইয়াত থেকে মুক্ত হওয়াই সম্ভবত লোকটির ইচ্ছা ছিলো। এই যুক্তির পক্ষে কোনো টেক্সটচুয়্যাল সাপোর্ট বা অন্য কোনো দলীল নেই। এই হাদীসটির শব্দচয়ন থেকে স্পষ্টত বুঝা যায়, স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণটাই ছিলো তার বাইয়াত। সুতরাং, বাইয়াত থেকে মুক্ত করে দেয়া সংক্রান্ত অনুরোধের মানে হলো, সে ধর্মত্যাগ করতে চায়। এই ঘটনা মদীনায় সংঘটিত হয়েছিলো। মুসলমানরা তখন মদীনায় একটি স্বাধীন ইসলামী 'রাষ্ট্রে' বসবাস করতো, যেখানে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিলো মহানবীর (সা.) হাতে। যদি সত্যিই ধর্মত্যাগের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান 'নাযিল' হতো, তাহলে মহানবীই (সা.) সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি হতেন। বাস্তবতা হলো, সেই বেদুইনের বিরুদ্ধে তিনি কোনো ধরনের শাস্তির ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালের ফিকাহবিদরা একমত হয়েছেন যে সেই 'ধর্মত্যাগীকে' গ্রেফতার করার জন্য তিনি কাউকে পাঠাননি, তাকে আটক করেননি, সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বা পুনর্বিবেচনা করার জন্য তাকে অনুরোধও করেননি।

অন্যদিকে, এই হাদীসটি বা এ ধরনের অন্য হাদীসগুলোর 'রহিত' হয়ে যাওয়ার দাবির ব্যাপারেও সত্যিকারের কোনো ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদীসগুলো হচ্ছে এ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তিকে প্রত্যাখ্যান ও বিবেকের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ইসলামের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতটি দেখা যেতে পারে।

উপরে বর্ণিত ঘটনাটি রাসূল (সা.) কর্তৃক গৃহীত 'হুদাইবিয়ার সন্ধির' একটি শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শর্তটি ছিলো, যদি মদীনায় হিজরতকারী কোনো মুসলমান ধর্মত্যাগ করে পূর্বের পৌত্তলিকতায় ফিরে যেতে চায়, তাহলে তার মক্কায় ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) বাধা দিতে পারবেন না। এটা সত্য যে মক্কা বিজয়

---

[১১] সহীহ বুখারী (মুহাম্মদ মুহসীন খান অনূদিত), মাকতাবাতুল রিয়াদ আল-হাদীসাহ, রিয়াদ, ১৯৮২, খণ্ড ৯, হাদীস নং ৩১৬, পৃ. ২৪১। একই ধরনের আরো হাদীস অন্যান্য বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যেমন: হাদীস নং ৩১৮, পৃ. ২৪২; হাদীস নং ৩২৩, পৃ. ২৪৬।

ও বিজয়ী বেশে মহানবীর (সা.) মক্কায় প্রবেশের আগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। যা হোক, কেউ কেউ আশা করেছিলো, মহানবী (সা.) এই শর্তটি প্রত্যাখ্যান করবেন, যাতে এ ধরনের সম্ভাব্য ধর্মত্যাগীকে শাস্তি প্রদান করা যায়। কিন্তু তা হয়নি।

একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় মনে রাখা দরকার, মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের আলেমদের কেউ কেউ নিজেদের মতামতের ন্যায্যতা তৈরি করতে মুসলিম সমাজের বাহ্যত জরুরি সুরক্ষার দোহাই দেন এবং মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক বিভেদ ও মুসলমানদের ঈমান পরিত্যাগ ঠেকানোর যুক্তি দেন। অথচ এ ধরনের জাস্টিফিকেশন রাসূলের (সা.) যুগে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক ছিলো। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় হুদায়বিয়ার সন্ধিতে সেই শর্তটি মেনে নিয়েছিলেন এমন এক সময়, যখন মুসলিমরা আরো বেশি অরক্ষিত ছিলো এবং এই চুক্তির পরও তুলনামূলকভাবে বেশি অনিরাপদ ছিলো।

উপর্যুক্ত হাদীসটি এবং এ ধরনের অন্য বর্ণনাটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে অন্যান্য সহীহ হাদীস বিবেচনা করার সময় এগুলোকেও সমভাবে বিবেচনা করতে হবে।

দ্বিতীয় হাদীস:

> আব্দুল্লাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঘোষণা দিয়েছে— আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত এই মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা যাবে না: খুনের ঘটনায় কিসাস, বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাভিচার এবং সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম থেকে ফিরে গেছে (মুরতাদ) এবং মুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করেছে।"[১২]

এই হাদীসটি প্রায়শ হাদীস ব্যাখ্যার নির্দিষ্ট পদ্ধতির বাইরে গিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) এখানে তিনটি অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তির বিষয়ে কথা বলেছেন। এর মধ্যে তৃতীয়টি হলো মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং মুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করা সংক্রান্ত। যদি নিছক ধর্মত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ না করে শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও কাউকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা

---

[১২] আল-আসকালানী, ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী বি শরহান সহীহুল বুখারী (আরবী), এম. আব্দুল বাকী এবং এম. আল-খতীব কর্তৃক সম্পাদিত, দারুল রাইয়্যান লিততুরাস, কায়রো, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৭, খণ্ড ১২, বাবে দিয়াত, হাদীস নং ৬৮৭৮, পৃ. ২০৯, লেখক কর্তৃক অনূদিত।

বৈধ হতো, তাহলে মহানবী (সা.) কেন উপরে উল্লেখিত প্রথম হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তিটিকে নির্বিঘ্নে চলে যেতে দিলেন? আসলে তখন মুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করা বলতে বুঝানো হতো, ধর্মত্যাগের সাথে সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রুদের সাথে যোগদান করা।

যেহেতু ইসলাম একই সাথে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সত্তা, তাই ধর্মত্যাগ মাত্রই বিশ্বাসঘাতকতা— এই যুক্তিটি কয়েকটি দিক থেকে প্রশ্নসাপেক্ষ।

প্রথমত, কোরআনের নির্দেশ হলো, অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের লোকজন মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করলে তাদের সাথে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও সদয় আচরণ করতে হবে [সূরা মুমতাহিনা ৬০:৮]। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা বা চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। কেউ মুরতাদ হয়ে যেতে চাইলে মুসলমানদের দৃষ্টিতে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। তবে সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো— এ ধরনের ধর্মত্যাগ রাষ্ট্রবিরোধী অন্যান্য অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কি না?

তারচেয়েও মৌলিক প্রশ্ন হলো, ব্যক্তিগতভাবে ধর্মত্যাগ মাত্রই শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ কি না (আরবীতে যাকে 'জারীমাহ' বলা হয়)?

(১) এটি যদি অপরাধ হয়েই থাকে, তাহলে তা একান্তই আল্লাহর বিরুদ্ধে কৃত একটি অপরাধ (আর আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে)।

(২) কিংবা এটি এমন এক অপরাধ— যেটি এই দুনিয়াতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য হিসেবে বিবেচিত, যার জন্য বিশেষ কোনো পরিস্থিতি বা শর্ত পূরণের প্রয়োজন নেই।

ধর্মত্যাগ অন্যান্য শাস্তিযোগ্য অপরাধের মতো কিনা, তা বলা বেশ দুরূহ ব্যাপার। ধর্মত্যাগের কারণে মুসলিম সমাজ বা ইসলামী রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতিকে গৌণ করে দেখা এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য নয়। ধর্মত্যাগের পরিণতিতে মুসলিম সমাজে সাধারণ মানুষের মনোবলের উপর সম্ভাব্য প্রভাবকে উপেক্ষা করাও এর উদ্দেশ্য নয়। ড. ইউসুফ কারযাভী 'ইসলাম অনলাইনে' লিখিত এক নিবন্ধে এই সমস্যা ও ক্ষতিগুলো সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন।[১৩] বিশেষত যখন মুসলমানরা মনে

[১৩] http://islamonline.net/English/contemporary/2006/04/article01c.shtml – ১৪ এপ্রিল, ২০০৬ তারিখে আপডেটকৃত।

করছে যে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এমনকি ধর্মীয়ভাবে পশ্চিমা আক্রমণ চলছে, তখন তাঁর এই বক্তব্য আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই একই মুসলিম সমাজের মধ্যে এমন কিছু মুসলমান রয়েছে, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরও নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে। ড. কারযাভী এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে 'বুদ্ধিবৃত্তিক মুরতাদী কাজ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৪] অথচ, তুলনামূলকভাবে বেশি ভয়ংকর, ধ্বংসাত্মক ও প্রপাগান্ডামূলক এই 'মুরতাদী কর্মকাণ্ড' শাস্তির আওতার বাইরে থেকে যায়।

উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় হাদীসটির অন্য একটি ভাষ্যে আরো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত এই প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে আমাদেরকে সহায়তা করবে।

> উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "কোনো মুসলমান যদি ঘোষণা দেয় যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা লাভের অধিকার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তাহলে তার রক্ত ঝরানো যাবে না। তবে তিনটি ব্যতিক্রম বাদে: কোনো বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাকে পাথর মারতে হবে; কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তাকে হয় হত্যা করতে হবে বা শূলে চড়াতে হবে, আর নয়তো দেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে; এবং কোনো ব্যক্তির হত্যাকারীকে বদলা হিসেবে হত্যা করতে হবে।"[১৫]

এই হাদীসটির ব্যাপারে নিচে কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো:

(১) ব্যভিচার এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে পরিকল্পিত হত্যা– এই দুটি ক্যাটাগরিতে উপরে উল্লেখিত বুখারীর হাদীসটির সাথে এই হাদীসটির অনেক মিল রয়েছে। তবে বুখারীর হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় ক্যাটাগরির ব্যাপারে এই হাদীসে কোনো মুসলমান কর্তৃক 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা'র বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কোনো মুসলমানের পক্ষে ধর্মদ্রোহী হওয়াটা অকল্পনীয় হলেও হাদীসে তেমনটিই বলা হয়েছে।

---

[১৪] প্রাগুক্ত

[১৫] আল-আজদী, আবু দাউদ সুলাইমান (মৃত্যু: ২৭৫ হিজরী), সুনান আবু দাউদ (আরবী সংস্করণ), সম্পাদনা: এম. এম. আব্দুল হামীদ, মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, তারিখ নেই, খণ্ড ৪, হাদীস নং ৪৩৫৩, পৃ. ১২৬, লেখক কর্তৃক অনূদিত।

(২) আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটির অভিব্যক্তি এবং কোরআনে বর্ণিত অভিব্যক্তি হুবহু এক। কোরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে; এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমানজনক ব্যাপার, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।"
>
> [সূরা মায়েদা ৫:৩৩]

এই আয়াত এবং আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি নিছক ধর্মত্যাগের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং 'হিরাবা' তথা হত্যা ও সশস্ত্র ডাকাতির মতো সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং জনজীবনে ত্রাস সৃষ্টিকারী অপরাধের সাথে সম্পর্কিত। এ ধরনের অপরাধের মাত্রা নির্ণয় করে অপরাধীকে কী ধরনের শাস্তি দেয়া হবে, তা নির্ভর করে আদালতের উপর। বুখারীতে বর্ণিত এই তৃতীয় ক্যাটাগরি তথা ধর্মত্যাগের বিষয়টি মূলত অন্যান্য অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেগুলোর কোনো কোনোটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ রকম যুক্তিসঙ্গত একটি সম্ভাবনার কথা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বিবেচনা করেছিলেন।[১৬]

তৃতীয় হাদীস:

> ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ধর্ম ত্যাগ করে, তাকে হত্যা করো।"[১৭]

ধর্মত্যাগকে যারা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে মনে করে, তারা এই হাদীসটি সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করে। এই বিষয়ে যদি এই একটা হাদীসই থাকতো, তাহলে

---

[১৬] ইসলাম অনলাইন, পূর্বোক্ত।

[১৭] সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, খণ্ড ৯, হাদীস নং ৫৭, পৃ. ৪৫।

তাদের যুক্তিটি হয়তো অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু হাদীসটি ব্যাখ্যার পদ্ধতি প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে, বিশেষত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যদি বিবেচনায় নেয়া হয়:

১) কোরআনের বিভিন্ন স্থানে ধর্মত্যাগের প্রসঙ্গ রয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও দুনিয়াবী শাস্তির কথা বলা নেই।

২) বিবেকের স্বাধীনতা এবং বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা কোরআনে বার বার দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে।

৩) পূর্বে আলোচিত বুখারীর হাদীসটিতে দেখা গেছে, তৎকালীন মদীনায় এক ব্যক্তি যখন ধর্মত্যাগ করলো এবং এর ধারাবাহিকতায় মদীনা ত্যাগ করলো, তখন তার ব্যাপারে স্বয়ং মহানবী (সা.) শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

৪) মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় ধর্মত্যাগের জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন মর্মে কোনো সহীহ হাদীস নেই।

৫) এ ব্যাপারে ড. আল-আওয়া মতামত দিয়েছেন— "তাকে হত্যা করো" বলতে অপরিহার্যভাবে বাধ্যতামূলক আদেশ বুঝায় না।[১৮] বাস্তবিক অর্থে, ইসলামী আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতি অনুযায়ী অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়াটি বাধ্যতামূলক নির্দেশ অর্থেও হতে পারে (যেমন: নামায, রোযা ও যাকাত); আবার কোনো ঐচ্ছিক কাজকেও বুঝাতে পারে (যেমন: তাহাজ্জুতের নামায); কিংবা কোনো কাজের অনুমোদন অর্থেও বুঝানো হতে পারে। এভাবে অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়ার আরো অন্যান্য অর্থও হতে পারে। এ ধরনের বক্তব্যের ব্যাপারে অধিকতর দলীল-প্রমাণের সমর্থন থাকা বা না থাকার উপর এর প্রাসঙ্গিক অর্থ নির্ভর করে। উপরে আলোচিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, এক্ষেত্রে রাসূলের (সা.) নির্দেশ মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদন অর্থে ছিলো বলে মনে হয়। তাও যখন ধর্মত্যাগের সাথে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অন্যান্য অপরাধ যুক্ত থাকে তখন। যেমন: মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

৬) ড. কারযাভী এই হাদীসটির সম্ভাব্য আরেকটি অর্থের কথা বলেছেন: "... 'যে ব্যক্তি তার ধর্ম ত্যাগ করে, তাকে হত্যা করো' মহানবীর (সা.) এ কথাটিকে উমর (রা.) যেভাবে বুঝেছেন, সেটি এর সম্ভাব্য একটি অর্থ হতে পারে। তা হলো, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে এটি ছিলো একটি নির্বাহী সিদ্ধান্ত

[১৮] ইসলাম অনলাইন, পূর্বোক্ত।

সম্পর্কিত ব্যাপার, যা সিয়াসতে শরীয়তের আওতাভুক্ত। এটি কোনো ফতোয়া ছিলো না। কিংবা, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এমন কোনো সিদ্ধান্তও ছিলো না, যা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহ মানতে বাধ্য থাকবে।"[১৯] এ থেকে বুঝা যায়, ধর্মত্যাগের জন্য যদি কোনো শাস্তি থেকেও থাকে (যেহেতু স্বয়ং মহানবী (সা.) মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়া এক ধর্মত্যাগীকে কোনো শাস্তি প্রদান করেননি), তাহলে তা বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত শাস্তি তথা 'হদ' নয়। ড. আল-আওয়া এই মতামতের পক্ষে অন্যান্য প্রামাণিক তথ্য আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।[২০]

চতুর্থ হাদীস:

ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে কেউ কেউ মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত একটি হাদীসের একাধিক ভাষ্যকে তুলে ধরেন। উকল ও উরাইনা গোত্র থেকে একদল লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগ করে। তারপর একজন রাখালকে (অন্য বর্ণনা মতে কয়েকজন রাখালকে) নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে এবং তাদের দেহ বিকৃত করে ফেলে। মহানবীর (সা.) নির্দেশে তাদেরকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়। প্রশ্ন হলো, তাদেরকে কী ধর্মত্যাগের জন্য হত্যা করা হয়েছিলো, নাকি নিরীহ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করার দায়ে? দ্বিতীয় কারণেই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো, এটা নিশ্চিতভাবেই জানা যায়।[২১]

৫. সাহাবী ও তাবেয়ীদের কর্ম ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণ যাচাই

মহানবীর (সা.) মুখ নিঃসৃত বাণীর সরাসরি বর্ণনা, কিংবা মহানবীর (সা.) শিক্ষার আলোকে সাহাবীদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনাগুলো হাদীস গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আমরা জানি, সাহাবীদের ঐক্যমত্যকে (ইজমা) শরীয়তে উৎস হিসাবে গণ্য করা হবে কিনা, তা নিয়ে কিছু মতবিরোধ রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা এটিকে একটি বৈধ উৎস মনে করতে পারি। বিশেষ করে, অন্যান্য দলীল-প্রমাণ যদি একে সমর্থন করে। সর্বোপরি, আমাদের মনে রাখতে হবে— ইসলামী শরীয়তে রাসূলের (সা.) কথা ও কাজই হচ্ছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কেননা, ঈমানের বিষয়গুলো কী হবে,

---

[১৯] ইসলাম অনলাইন/আরবী পেজ, লেখক কর্তৃক অনূদিত।

[২০] প্রাগুক্ত

[২১] সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, খণ্ড ৮, হাদীস নং ৭৯৪, ৯৭৫, ৭৯৬, ৭৯৭, পৃ. ৫১৯-৫২২।

তা আমরা জানতে পারি মহানবীর (সা.) উপর নাযিলকৃত ওহীর মাধ্যমে।

আলী (রা.), মুয়াজ (রা.) ও আবু মুসা (রা.) ধর্মত্যাগীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন বলে কয়েকটি হাদীস থেকে জানা যায়। যেমন একটি হাদীসে মুয়াজকে (রা.) উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন— "এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিচার।" যা হোক, এসব ঘটনার উদাহরণ থেকে মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ,

১) বিশুদ্ধ হাদীসগুলো থেকে জানা যায়, রাসূল (সা.) নিজে এই শাস্তি নির্ধারণ করেননি। তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

২) শাস্তি সংক্রান্ত অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

৩) মুয়াজের (রা.) মতো সাহাবী যখন বলেন, "এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিচার", তখন তিনি এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর যে ব্যাখ্যা উপরে দেয়া হয়েছে, সেভাবেও বুঝিয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করা সম্ভব।

৪) ড. আল-আওয়া এবং ড. কারযাভীর মত হলো, মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত এই বর্ণনাগুলো বাধ্যতামূলক আজ্ঞা অর্থে ছিলো না। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তখন ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাহী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। স্থান-কাল বিবেচনায় বর্তমানেও ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। ফতোয়া কোনো 'ধর্মীয় সিদ্ধান্ত' নয়, যা 'যে কোনো স্থান, কাল ও পরিস্থিতিতে সদাসর্বদা উম্মাহ মানতে বাধ্য থাকবে'।[২২]

উল্লেখ্য, একবার একজন ধর্মত্যাগীকে হত্যা করার ঘটনা জানতে পেরে উমরের (রা.) মতো নেতৃস্থানীয় সাহাবী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কাছে যখন জানতে চাওয়া হলো, এমতাবস্থায় তিনি কী করতেন? তখন তাঁর প্রস্তাব ছিলো, ধর্মত্যাগীকে বন্দী করে রাখা উচিত এবং তাকে নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুযোগ দেয়া উচিত। উল্লেখ্য, তিনি কোনো সময়সীমার কথা উল্লেখ করেননি। উমরের (রা.) এই মতামত বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ডের ধারণাকে বাতিল করে দেয়।

তাবেয়ীদের মধ্য থেকেও দুজনকে পাওয়া যায়, যারা একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তাঁরা হলেন ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) এবং সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)।

---

[২২] ইসলাম অনলাইন, পূর্বোক্ত।

কোনো কোনো স্কলার যুক্তি দিয়েছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মত্যাগের কারণ ছিলো নিরাপত্তার অভাব ও যুদ্ধ পরিস্থিতি। যেমন জামাল আল-বান্নার অভিমত হলো: "রাসূলের (সা.) যুগে ধর্মত্যাগের বিয়ষটি ছিলো ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। তাই, রাসূলের (সা.) উপর ঈমান আনার মানে ছিলো তাঁকে সমর্থন করা এবং ধর্মত্যাগী হয়ে যাওয়ার মানে ছিলো তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং পৌত্তলিকদের সাথে যোগ দেয়া।"[২৩] তারপর তিনি একটি উদাহরণ দেন। এটি হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আস-সারহের ঘটনা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরে ইসলাম ত্যাগ করেন এবং মক্কায় গিয়ে কোরাইশদেরকে মহানবীর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করেন। এ বিষয়ে একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন শায়খ আব্দুল মাজিদ সুবহ।[২৪]

৬. উপসংহার:

এ বিষয়ে উপর্যুক্ত আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়:

১। কোরআন ও সুন্নাহর সংশ্লিষ্ট দলীলসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায়— ধর্মত্যাগ মাত্রই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য শাস্তি, এমন দাবির পক্ষে তেমন কোনো শক্ত ভিত্তি নেই।

২। রাসূলের (সা.) নবুয়তী জিন্দেগীর প্রথম দিকে ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদানের যেসব ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, সেগুলো নিছক ধর্মত্যাগের জন্য ছিলো না। বরং সংশ্লিষ্ট মুরতাদরা ধর্মত্যাগের পাশাপাশি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অন্যান্য অপরাধও করেছিলো।

৩। প্রাথমিক যুগে চতুর্মুখী আক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে উদীয়মান মুসলিম সমাজের জন্য ধর্মত্যাগ ছিলো একটি বড় ধরনের হুমকি। তাই এ ব্যাপারে তখন নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি দেখালে মুসলিম সমাজের উত্থানই ঝুঁকিতে পড়ে যেতো। ধর্মত্যাগকে একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচনার করার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে ঐক্যমত্য হওয়ার পেছনে এটি সম্ভবত একটি কারণ। যদিও রিদ্দার উপযুক্ত শাস্তির ব্যাপারে নানা ধরনের মত রয়েছে।

৪। স্থান-কাল-পাত্র ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে ফতোয়ারও

---

[২৩] ইসলাম অনলাইন/আরবী পেজ। জামাল আল-বান্না কর্তৃক লিখিত একটি নিবন্ধ, লেখক কর্তৃক অনূদিত।

[২৪] ইসলাম অনলাইন, পূর্বোক্ত।

পরিবর্তন ঘটে। তাই ইসলামী আইনশাস্ত্রের প্রাথমিক সীমারেখার মধ্যে থেকে এই বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা জরুরি। তবে নিছক অন্যদের চাপের কারণে এটি করা উচিত নয়। অন্যদেরকে খুশি করতে, কিংবা 'মডারেট' বা 'ওপেন মাইন্ডেড' উপাধি পাওয়ার জন্য শরীয়তের প্রশ্নাতীত, অপরিবর্তনীয় এবং স্থায়ী বিষয়গুলো পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারো নেই। অন্যদিকে, পরিবর্তনীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইতোপূর্বে প্রদত্ত ফিকহী মতামত ও ব্যাখ্যাগুলোকে স্থায়ী হিসাবে বিবেচনা করারও অবকাশ নেই।

৫। এ ধরনের যে কোনো প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ইসলামী আইনশাস্ত্রের কিছু মূলনীতি সহায়ক হতে পারে। যেমন–

ক. "মায়ালাতুল আফয়াল" তথা একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা গ্রহণ করার পরিণতিকে বিবেচনা করা। এমনকি অনুমোদিত বা পছন্দনীয় কোনো বিষয় পালন করতে গেলে যদি ইসলামের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইসলাম ও এর সুনাম রক্ষা করার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। অথচ তাঁকে যখন পরামর্শ দেয়া হলো— মদীনায় বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে থাকায় আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সলুলকে হত্যা করা উচিত, মহানবী (সা.) তখন জবাব দিলেন— তিনি আশংকা করছেন যে লোকেরা বলাবলি করবে, "মুহাম্মদ তার সাথীদেরকে হত্যা করছে।"

খ. প্রতিটি নির্দিষ্ট কাজের ভালো-মন্দ (আলাদাভাবে) বিচার করা। অবশ্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ালে কোনো ভালো কাজও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অতীতের তুলনায় আমাদের সমসাময়িক বিশ্বের পার্থক্য অনেক বেশি। তাই, বর্তমানে এই নীতিমালা প্রয়োগ করতে গেলে কিছু প্রশ্ন চলে আসে। যেমন:

ক. ইসলামী আইনশাস্ত্রে প্রচলিত একটি সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে ধরলে কি মুসলমানদের এবং ইসলামের সুনাম বেড়ে যাবে? কিংবা তাদের উপর অন্যায়ভাবে আরোপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডিত হয়ে যাবে?

খ. মহানবী (সা.) ও প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ তাদের সময়কালে পরিবর্তনযোগ্য বিষয়গুলোকে (গাইরে সাবিত) যেভাবে বিবেচনা করেছেন, বর্তমানকালের আলেমদেরও কি সেভাবে বিবেচনা করা উচিত নয়?

গ. ড. কারযাভী ও অন্যদের মতামত যাই হোক না কেন, ধর্মত্যাগের বিষয়ে উত্থাপিত কোনো অভিযোগকে সমাধা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, ধর্মত্যাগের আইনগত পরিণতির সাথে অনেক দিক থেকে ইসলামের পারিবারিক আইনের সম্পর্ক রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে অবশ্যই বেনিফিট অব ডাউট দিতে হবে। এবং শুধুমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ ও বিশেষজ্ঞগণই এ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারে। কেননা, কোনো অবস্থায়ই আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি কাউকে দেয়া হয়নি।

এই নিবন্ধে যদি সঠিক কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা একান্তই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং আমাদের আলেমগণের নিকট থেকে কিছু শিখতে পারার ফল। তাঁদের প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, যদিও আমি তাঁদের একজন নই। আর ভুল কিছু থেকে থাকলে এর দায় একান্তই আমার এবং এ জন্য আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। এই নিবন্ধে বলা এ বিষয়ে আমার প্রাথমিক চিন্তাভাবনাগুলোর সাথে কেউ দ্বিমত করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আলোচনায় কোনো অসুবিধা দেখি না। একইসাথে আল্লাহ তায়ালার নিকট বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে সম্পূর্ণ সত্য উপলব্ধি এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন।

['Is Apostasy a Capital Crime in Islam?' শিরোনামে ড. জামাল বাদাবীর একটি নিবন্ধ প্রথমে 'ইসলাম অনলাইন' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর কিছুটা পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'দ্যা ফিকহ কাউন্সিল অব নর্থ আমেরিকা'র ওয়েবসাইটে। এই নিবন্ধটি তার অনূদিত সংস্করণ।]

সমকালীন বাংলাদেশে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির কারণ

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নিয়ে সবারই যথেষ্ট উদ্বেগ লক্ষ করছি। এর প্রেক্ষিতে 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র' (সিএসসিএস) "মৃত্যুদণ্ডই কি মুরতাদের একমাত্র শাস্তি?" শিরোনামে ড. তারিক রমাদানের একটা বক্তৃতার সংশ্লিষ্ট অংশ ট্রান্সক্রিপ্ট করে অনুবাদ প্রকাশ করেছে। "ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মত্যাগ কি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ?" শিরোনামে ড. জামাল বাদাবীর একটি নিবন্ধের অনুবাদও সিএসসিএস প্রকাশ করেছে। এর আগে সিএসসিএস তাঁর "অন্যান্য কমিউনিটির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক" শীর্ষক একটি খুতবার অনুবাদ ছাপিয়েছে।

এইসব লেখালেখি পড়ে কেউ কি কোনো শিক্ষা নেয়? চেঞ্জ হয়? আমার মনে হয় না। বরং লোকদেরকে কথায় কথায় কাফের বলায় অভ্যস্ত তথা তাকফিরি মুভমেন্টকে যারা ভুল মনে করে, তারা এসব লেখা হতে নিজ নিজ লিবারেল অবস্থানের পক্ষে যুক্তি ও তথ্য খুঁজে পায়।

এর বিপরীত অবস্থানে আছে স্বঘোষিত জিহাদী গ্রুপ। তারা একই কোরআন-হাদীস হতে সম্পূর্ণ বিপরীত উদাহরণ ও দলীল খুঁজে পায়। যেমন করে ইচ্ছার স্বাধীনতার পক্ষে জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায় পরস্পর ১৮০ ডিগ্রি উল্টা দলীল কোরআন ও হাদীস হতে উদ্ধৃত করে। তাহলে, নাউযুবিল্লাহ, কোরআন কি পরস্পরবিরোধী আয়াতের সমষ্টি মাত্র? কিছু বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক-পাগল ছাড়া এমন দাবি কেউ করে না।

তাহলে, দৃশ্যমান মতবিরোধের সমাধান কি? উত্তরটা খুবই সহজ, কাণ্ডজ্ঞান তথা আক্কলে সলীম।

যারা কথায় কথায় দলীল খুঁজেন তারা প্রায়শই ভুলে যান যে দলীল জ্ঞান দেয় না, সহায়তা করে মাত্র। দলীল হলো নক্কল। এ দৃষ্টিতে কোরআন, হাদীস, সীরাত, ফিকাহ সবই নক্কল তথা রেফারেন্স। জ্ঞানের মূল উৎস হতে সঠিক জ্ঞান লাভ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এসব নক্কল-এর জ্ঞান গাইড করে। জ্ঞানের মূল উৎসটি হলো আক্কল, যাকে আমরা কমনসেন্স বলি। এটি প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দিয়ে দিয়েছেন। আদমের (আ.) সন্তান হিসাবে আমরা তা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে লাভ করেছি।

এই যুক্তি-বুদ্ধি তথা কাণ্ডজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতিরেকে কোরআন-হাদীস বুঝার চেষ্টা করলে নিজ নিজ যে কেনো প্রকারের ভুল চিন্তা ও অপকর্মের পক্ষে কোরআন-হাদীসের দলীল বের করা সম্ভব (!)। কোরআন-হাদীস বুঝার সময়, বিশেষ করে এতদুভয়ের কোনো সূত্র উল্লেখ করার সময় আমরা এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন হই না। ফলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি। মক্কী যুগ, মাদানী যুগের কথা আমরা ভাসাভাসাভাবে শুনেছি বটে। কিন্তু এর তাৎপর্য বুঝি না। মানি তো না-ই। এক পক্ষ সবকিছুকে নিছক দাওয়াতী দৃষ্টিতে দেখেন। আরেক পক্ষ সবকিছুকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের মধ্যে প্রশাসনিক ও সামরিক দিক অনস্বীকার্যভাবে ইনক্লুডেড।

আমরা, বর্তমান বাংলাদেশ, কি মক্কী যুগে নাকি মাদানী যুগে? কোরআন-হাদীসের মুয়ামালাতগত যে কোনো কিছু নিয়ে ডিল করতে গেলে এই প্রশ্নের সুরাহা করাটা অতীব জরুরি। দুঃখজনক হলো, যারা ইসলাম নিয়ে কাজ করেন তাদের কোনো পক্ষই এই প্রশ্ন প্রপারলি এড্রেস করে না। আমার ধারণায়, তারা এই মৌলিক প্রশ্নের গুরুত্বই বুঝে না। যারা ইসলামী আন্দোলনের অনুসারী হওয়ার দাবি করেন, তাদের রেটরিকে যা-ই থাকুক না কেন, বাস্তব কর্মকাণ্ডে তারাও এই পর্যায় বা ধারাক্রমকে মানেন না, সেটি স্পষ্ট।

যাহোক, সূরা নিসার ১৩৭ নং আয়াতটি যারা বুঝেছেন তাদের মুরতাদের শাস্তি বিষয়ে কোনো বেসিক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকার কথা নয়। কোরআনের এই মুহকাম আয়াতের আলোকেই বাদবাকী সবকিছুকে বুঝতে হবে। যতটুকু আমি বুঝি। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

> "যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন।"

চরমপন্থী হওয়া সহজ। মধ্যপন্থী হওয়া কঠিন। ইসলামে কোনো প্রকারের এক্সট্রিমিজম নাই। একমাত্র এক্সট্রিমলি ব্যালেন্স করা ব্যতীত। ড. ইউসুফ কারযাভীর ভাষায় 'ওয়াসাতিয়্যা' বা মধ্যপন্থা। এটি কোরআনেরই ভাষা। আমরা নির্মূলকরণ চাই না, মধ্যপন্থা চাই। মিলে-মিশে থাকতে চাই। দ্বিমতের মধ্যে ঐক্য তথা ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফ চাই। এসব নতুন কথা নয়। যদিও কিছু মৌলিক কথা বার বার বলতে হয়। সদা স্মরণে রাখতে হয়। সমাজ হলো বৈচিত্রের জায়গা, সবাইকে এক করে ফেলার জায়গা নয়। আমাদের ঐক্য বিশ্বাসে, কর্মে নয়। এই বিশ্বাসেরও বিভিন্ন মাত্রা ও স্তর আছে। বিভিন্ন ধরনের উপলব্ধি আছে। আসলে উপলব্ধি মাত্রই বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশ্বাসের স্বাধীনতা সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত, আমি-আপনিসহ প্রত্যেকের বেঁচে থাকার উপায়। জোর করে বিশ্বাস করানো যায় না। বিশ্বাস গড়ে উঠে। যুক্তির মোকাবিলায় তলোয়ার, চাপাতি, বোমা বা গুলি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এটি বুঝতে হবে।

বিশেষ নিবন্ধ

চাই বিশ্বাস চর্চার অধিকার, চাই বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা

হোসাইন কবির

মানুষ আদতে বিশ্বাসী; বিশ্বাসী হতে পারে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে, বিশ্বাসী হতে পারে যুক্তি-দর্শন-বিজ্ঞান কিংবা প্রাকৃতিক কোনো বিষয়ে। আবার প্রচলিত ধর্মে যদি কেউ আস্থাশীল না হয়ে সমাজের অপরাপর মত-পথকে সম্মান করে নিজের বিশ্বাসে পথ চলে, তাও তো তার বিশ্বাস। আর তাই সমাজ ও রাষ্ট্রে আজ বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতাই জরুরি বিষয়।

বাংলাদেশেও আসলে আজ দরকার 'বিশ্বাস' চর্চার স্বাধীনতা, আর তাতে মানুষ প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারেন, নাও হতে পারেন কিংবা যে কোনো যুক্তি-দর্শন-বিজ্ঞান অথবা প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু/তন্ত্রে-মন্ত্রেও আস্থাশীল হতে পারেন। সবাই তো একই রূপে ধর্ম চর্চা কিংবা বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাসেরও রয়েছে রূপভেদ, একই ধর্ম চর্চা করেও কিংবা যুক্তি-দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চা করেও মানুষ কতভাবে কতরূপে তা ধারণ করেন এবং চর্চা করেন।

আমরা যা চর্চা বা বিশ্বাস করি তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার লক্ষ্যে অন্যের উপর জবরদস্তি করি কিংবা গায়ের জোর খাটাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে এ কর্মটি যে মন্দ তাও অনেক সময় উপলব্ধি করি না; চাপিয়ে দেয়ার, জবরদস্তি করার এ মানসিকতার পরিবর্তে অপরের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াটা আজ জরুরি বিষয়। আমাদের নিজের ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কৃতি যেমন মানব সভ্যতারই অংশ এবং সম্পদ; সমাজের অপরাপর মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কৃতিও মানব সভ্যতার

ঐতিহ্যেরই অংশ এবং সম্পদ— এটা আমাদের মানতে হবে। কিন্তু যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করেন তারা ধর্মকে প্রয়োজন সাপেক্ষে কখনো রক্ষাবর্ম, কখনো জবরদস্তির হাতিয়ার বানিয়ে থাকেন। তাই সমস্যার মূলে দায়ী ক্রিয়াশীল সমাজ-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক শক্তি— ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক মনোভাব। রাষ্ট্রে বসবাসরত মানুষ আইনের চোখে সমান বলে বিবেচিত হবে, বিশেষ কোনো গোত্র কিংবা সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত আথবা বৈষম্যের আচরণও রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়।

ধর্মবিশ্বাস-ভাবনা-সংস্কৃতি মানব সভ্যতারই অংশ, আমাদের মনে রাখা উচিত, তাই বলে দুনিয়ার সব মানুষ তো এক ধর্মের চর্চা করে না, একরূপ বিশ্বাসে পথও চলে না। আমাদের সম্মিলিত মানব সভ্যতা বহু-মত-পথ ও বৈচিত্রময় বিশ্বাস-ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়ে আগামীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা সকলেই তার অনুঘটক। তাই পরমতসহিষ্ণুতা পরমতের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ আমাদের করতেই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সংখ্যার বিবেচনায় তাবৎ দুনিয়ার প্রায় ২৩ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী, বাকি ৭৭ শতাংশ মানুষ তো অপরাপর ধর্মের এবং বিশ্বাসের। আবার আক্ষরিক অর্থে এ ২৩ শতাংশের মত/পথও এক নয়। নানা তরিকায়, গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীতে মুসলিম সম্প্রদায় বিভক্ত। তারপরও এ দুনিয়াটা তো শুধুমাত্র ২৩ শতাংশের নয়, বাকি ৭৭ শতাংশ মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মতামতের হিস্যার কথা বিবেচনায় তো থাকতে হবে! সমাজে রাষ্ট্রে ধর্মের নামে, ধর্মের গায়ে কালিমা লেপন করে কিছু মানুষকে খুন করলেই বিজয়ের পতাকা উড্ডিন হবে— এমনটি ভাববার কোনো কারণ নেই। বরং এ কর্ম তাবৎ দুনিয়ায় বসবাসরত স্বধর্মের মানুষজনকে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে, নিরাপরাধ স্বধর্মের মানুষজনকে বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

'মানুষ তো মানুষই'। কিন্তু আজকাল দেশে দেশে ধর্ম-পরিচয়ের তবকটি বড্ড বেশি মুখ্য হয়ে উঠছে। মানুষকে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার মানদণ্ডে মূলত মানুষ হিসেবে নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল হিন্দু, কেবল মুসলিম, কেবল খৃষ্টান, কেবল ইহুদি ইত্যাদি পোশাকি আলখেল্লার পরিচয়ে উপস্থাপন করা হয়। এটি কোনোভাবে মানুষের জন্য, মানুষ পরিচয়ের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়। সম্মানজনকও নয়।

বৈশ্বিক আর দৈশিক রাজনীতির নানা কূটচালে— হাতিয়ার হিসেবে ধর্মের অপব্যবহার, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভাজন, অবিশ্বাস, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা

আর সন্ত্রাস-জঙ্গি-তৎপরতায় দেশে দেশে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ও জনপদ আজ বিপন্ন। তবু আমাদের প্রত্যয়ী হতে হবে, আশাবাদী হতে হবে। কারণ, এ পৃথিবী মানুষের। এ পৃথিবী প্রজ্ঞাবান মানুষের। আমাদের। সমাজে ও রাষ্ট্রে দ্বেষ-বিদ্বেষ উৎপন্নকারী সাম্প্রদায়িকদের নয়।

আজকের এ আত্মপ্রত্যয়হীন বিপন্ন সময়ে বাঙালির গর্ব বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাসের অমোঘ সত্যবাণী বারবার উচ্চারিত হোক:

> "শুন হে মানুষ ভাই,
> সবার উপর মানুষ সত্য
> তাহার উপর নাই।"

লেখক পরিচিতি

আ. ক. ম. আব্দুল কাদের

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান। ইসলামী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে সুপরিচিত। বিবিধ ইসলামী বিষয়ে মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থ মিলিয়ে ডজনখানেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ। নানামুখী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট-এর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ বোর্ডের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করেছেন।

আসিফ সিবগাত ভূঞা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে বিবিএ সম্পন্ন করেছেন। আইবিএতে পড়ার সময় ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জানার আগ্রহ তৈরি হয়। ২০০৯ সালে তিনি কাতারে গিয়ে কাতার ইউনিভার্সিটি থেকে এক বছর মেয়াদী আরবী ভাষার একটি কোর্স সম্পন্ন করেন। তারপর মিশকাহ ইউনিভার্সিটি নামক একটি অনলাইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে ব্যাচেলর কোর্স পড়েছেন। সাপ্তাহিক সেমিনারভিত্তিক ‘তাকওয়া স্কুল’ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। ‘সহজ কুরআন’ নামে একটি সিরিজ বই লিখছেন, এ পর্যন্ত যার তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

আহমদ বিন সাদ হামদান আল-গামিদী

আল-গামিদী (১৯৪৮ ২০১৩) ছিলেন মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক। ইসলামী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ২৫টি বইয়ের রচয়িতা। জীবিতকালে তিনি বাংলাদেশে আরবী ভাষা শিক্ষার একটি কোর্স তত্ত্বাবধান করতেন।

ইউসুফ আল-কারযাভী

সাম্প্রতিক কালের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত। ইসলামী জ্ঞানে গভীরতা এবং সমসাময়িক বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক মতামত প্রদানের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। মিশরীয় এই আলেম পড়াশোনা করেছেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রজীবনেই শিক্ষকদের নিকট হতে আল্লামা খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন এবং মানবাধিকারের সপক্ষে তিনি সোচ্চার। এ পর্যন্ত শতাধিক বই লিখেছেন। বর্তমানে কাতারে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।

জামাল বাদাবী

মিশরীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয় ইসলামী স্কলার। কানাডার সেইন্ট মেরি ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক। লেখক, অ্যাক্টিভিস্ট ও বক্তা হিসেবেও সুপরিচিত। ইসলামের সামাজিক দিক নিয়ে তাঁর অনেক কাজ রয়েছে।

তারিক রমাদান

একজন সুইস শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও চিন্তক। টাইম ম্যাগাজিনের ২০০৪ সালের জরিপ অনুযায়ী একুশ শতকের বিশ্বসেরা ১০০ জন বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির কনটেম্পোরারি ইসলামিক স্টাডিজ এবং ধর্মতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। পাশাপাশি কাতারের দোহায় অবস্থিত 'রিসার্চ সেন্টার অফ ইসলামিক লেজিসলেশন অ্যান্ড এথিক্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। চিন্তা-গবেষণা বা ইজতিহাদের মাধ্যমে মুসলিম জীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। ত্রিশের অধিক বই লিখেছেন। পৃথিবীর অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছেন।

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক। পাশাপাশি সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস ফর বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম শহরের মেহেদিবাগ সিডিএ জামে মসজিদের খতিব।

মো. জাকির হোসেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। একই অনুষদের ডিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া নেপালের কাঠমান্ডু স্কুল অব ল-এর ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে শিক্ষকতা করছেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন জাতীয় সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত কলাম লেখেন।

মোঃ আব্দুল মান্নান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন। বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে পিএইচডি করেছেন ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

মোহাম্মদ অলী উল্যাহ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। ইসলামী শরীয়াহ ও ফিকাহ নিয়ে একাধিক বইয়ের রচয়িতা।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র' এবং 'মুক্তবুদ্ধি চর্চা কেন্দ্র'-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। নিজেকে জীবনবাদী সমাজকর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সাধারণ মানুষের কাছে দর্শনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কাজ করছেন। 'ফিলোসফি: প্রাথমিক ধারণা'সহ একাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট: mozammelhq.com

মোহাম্মদ হাশিম কামালী

আফগান বংশোদ্ভূত ড. কামালী ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়ার আইন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। বর্তমানে মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড ইসলামিক স্টাডিজের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইসলামী আইনের উপর জীবিতদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় তাঁর লেখাই সবচেয়ে বেশি পড়া হয়।

হোসাইন কবির

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক। কবি, প্রাবন্ধিক ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত।